

অভীক সরকার

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

প্রফেসর চিন্তাহরণ মুখার্জি কোনও প্রথাগত গোয়েন্দা নন। তিনি আসলে একজন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের প্রফেসর। সি আই ডি'র এডিজি, যিনি ওঁর ভাগ্নেও বটে, তাঁর অনুরোধে আরক্ষা বাহিনীকে কিছু জটিল কেসে সামান্য সাহায্য করে থাকেন, এই মাত্র। আর এই সব কর্মকাণ্ডে তাঁর সহকর্মী হল নবীন পুলিশ অফিসার মনুজেন্দ্র বর্মণ। প্রফেসর সাহেবের ভাষায় ব্রাইট ইয়ং চ্যাপ।

প্রফেসর মুখার্জি বন্দুক চালাতে পারেন না, অপরাধীদের পেছনে ধাওয়া করতে পারেন না, সিগারেটের ছাই বা জুতোর

ছাপ দেখে কারো ইতিহাস ভূগোল গড়গড় করে বলে দিতে পারেন না।

তিনি শুধু একটি জিনিসই পারেন। বিভিন্ন সূত্র, তথ্য, বক্তব্য ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

তাঁর পড়াশোনা অগাধ, মস্তিষ্কটি ক্ষুরধার, যুক্তিজাল অভ্রান্ত। তবে এই খাদ্যরসিক এবং সুরাপ্রেমী মানুষটির সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর রসবোধ।

এ হেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং রসিক প্রফেসর সাহেবের পাঁচটি রুদ্ধশ্বাস রহস্য উপন্যাস এবার পাঠকের হাতে।

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

অভীক সরকার

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস



পত্রভারতী

www.patrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২৪

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

PANCHTI RAHASYA UPANYAS
Collection of 5 Thriller Novels *by* Avik Sarkar
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.
1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009

Sales Office : PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

Price Rs. 340.00

ISBN 978-93-95635-72-1

সহধর্মিণী সঙ্ঘমিত্রা সরকারকে,
যাঁর গোয়েন্দা গল্প পড়ার উৎসাহ আমাকে
এই কাহিনিগুলি লিখতে প্ররোচিত করেছে।

লেখকের কথা

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর রমরমা বাজারে আর একটি নতুন গোয়েন্দা চরিত্রের আমদানি কতটা প্রয়োজনীয় সেই দোলাচল আমার চিরকালই ছিল। প্রফেসর মুখার্জি হয়ত ফিলিপ কোটলার কনসাল্ট করে বলতেন, "বুঝলে অভীক, এ ভারী cluttered মার্কেট। একে এন্ট্রি বেরিয়ার খুব হাই, আর কম্পিটিশন তো কহতব্য নয়। তুমি বরং অন্য লাইন দেখো।"

কিন্তু প্রফেসর মুখার্জি বললেই যে শুনতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। তাছাড়া প্রাণাধিকা গৃহিণী গোয়েন্দা কাহিনীর পোকা। তিনি বহুদিন ধরে গঞ্জনা দিচ্ছিলেন, একটি গোয়েন্দা সিরিজ লেখার জন্য। অতএব মাভৈঃ বলে এই মহতী কার্যে ব্রতী হওয়া গেল।

এই সিরিজে প্রথম উপন্যাস লিখি 'বরেন মজুমদার হত্যা রহস্য,' প্রকাশিত হয়েছিল ১৪২৯ সালের মায়াকানন বার্ষিকীতে। এটি একটি গোয়েন্দাকাহিনী, যাঁর প্রধান চরিত্র হচ্ছেন চিন্তাহরণ মুখার্জি নামের এক মার্কেটিং-এর প্রফেসর। যাঁর আয়ুধ হচ্ছে ঈর্ষণীয় পড়ার অভ্যেস আর অসামান্য যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা। চারিত্রিক দুর্বলতা বলতে খাদ্য এবং পানীয়ের ওপর দুর্নিবার আকর্ষণ। আর এই সবকিছুর সঙ্গী তাঁর দারুণ উইট।

গোয়েন্দা কাহিনীর নিয়ম হচ্ছে, একবার শুরু করলে সিরিজ আর থামানো যায় না। ফলে তার পর এই একই চরিত্রকে নিয়ে দুটি গল্প লিখি কিশোর ভারতীর দুটি সংখ্যার জন্য, নাম যথাক্রমে 'মাছ ধরলেন চিন্তাহরণ,' এবং 'একটি নিখুঁত আত্মহত্যা।' বাকি দুটি উপন্যাস এই ১৪৩১ দুটি পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটি কিশোর ভারতী পূজাবার্ষিকীতে, নাম অপহরণের আড়ালে। দ্বিতীয়টির নাম 'নরেন মিত্তিরের পারফিউম'।

'মাছ ধরলেন চিন্তাহরণ' এবং 'একটি নিখুঁত আত্মহত্যা', এই দুটি গল্পই আড়েবহরে বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। কিশোর পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা ছাড়ার ফলে তার মধ্যে মিশেছে প্রাপ্তবয়স্ক এলিমেন্টের জটিল কিছু উপাদান। তাতে গল্পগুলির ধারা অনেক বেশী উপলবন্ধুর এবং বহুমুখী হয়েছে। নামও পরিবর্তিত হয়েছে গল্পগুলির। 'মাছ ধরলেন চিন্তাহরণ'-এর নতুন নামকরণ হয়েছে 'ফাগুন

হাওয়ায় হাওয়ায়,' আর 'একটি নিখুঁত আত্মহত্যা'র নাম বদলে হয়েছে 'আত্মহত্যার অন্দরমহল।'

কিছু কিছু চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক ভারি আনন্দ পান। লেখার পর আরেকবার পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে এই চরিত্রটির মধ্যে তিনিও বেশ খানিকটা লুকিয়ে আছেন। তাঁর নিজের কিছু অভ্যাস, কথা বলার ভঙ্গি, নিজস্ব বিশ্বাস নিজের অজান্তেই চরিত্রটির মধ্যে ছাপ ফেলে গেছে। প্রফেসর চিন্তাহরণ মুখার্জির চরিত্রটিও তেমনই।

সব মিলিয়ে বলতে পারি প্রফেসর মুখার্জির আরও কাহিনী আসবে। আশা করি পাঠকদের কিছু টানটান গোয়েন্দা কাহিনী উপহার দিতে পারব। 'পাঁচটি রহস্য উপন্যাস' দিয়েই সেই যাত্রা শুরু হল।

পত্রভারতীর 'পাঁচটি রহস্য উপন্যাস' সিরিজের যে কটি বই আছে, তাঁদের লেখকরা বাংলা সাহিত্য জগতের মহীরুহ। আশা করি সেই মহাদ্রুমমণ্ডলীর ছায়ায় বসে কিছু শিখতে পারব, নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারব।

পাঠকদের পাঠপ্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রইলাম। অলমিতি।

অভীক সরকার

১৫ই কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
দীপান্বিতা কালীপূজা
দমদম, কলকাতা



ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় ১১

নরেন মিত্তিরের পারফিউম ৪৫

আত্মহত্যার অন্দরমহল ১০১

অপহরণের আড়ালে ১৩৫

বরেন মজুমদার হত্যা রহস্য ১৭৩

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

মহাদেবী

পটমঞ্জরী

পেতবপ্পু

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ



ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়

মনুজেন্দ্র ড্রয়িং রুমে ঢুকেই দেখল প্রফেসর চিন্তাহরণ মুখার্জি কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হালফ্যাশানের বক্সার। একটা কালোমতো মুশকো লোক দু-হাত দিয়ে প্রবল শক্তিতে তাঁর কোমরটি দলাইমলাই করতে ব্যস্ত। আর প্রতিটি দলাই এবং মলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর মুখার্জির মুখ থেকে কিছু কাতরোক্তি ভেসে আসছে।

মনুজেন্দ্র দেখে থমকে গেল। তারপর সন্তর্পণে একটা সোফায় বসে বলল, 'এ কী স্যার? আপনি এরকম স্যান্ডো পালোয়ান সেজে মাসাজ নিচ্ছেন কেন?'

ততক্ষণে মুশকো লোকটা উঠে পড়েছে। প্রফেসর মুখার্জি ধীরে ধীরে উঠে বসে একটা জামা চড়ালেন গায়ে। তারপর লোকটার হাতে দুটো পাঁচশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করে বললেন, 'ইয়ার্কি নয় ভায়া, কেস গুরুচরণ। বেশ কয়েকদিন ধরেই লোয়ার ব্যাক পেনে ভুগছি। সেদিন বাড়াবাড়ি হতে মোড়ের হরিপদ ডাক্তারের গেলাম, বুঝলে। তা হতচ্ছাড়া ডাক্তার বলে নাকি ওজন বেড়ে কোমরের ওপর চাপ পড়ছে, তাই এই হাল। একগাদা ওষুধ তো দিয়েইছে, তার সঙ্গে এই ফিজিওথেরাপির অত্যাচার। তারই একটা চোট গেল আর কী।'

মুখার্জিবৌদি দু-গ্লাস লেবুর শরবত নিয়ে এসে মুখঝামটা দিয়ে বললেন, 'ডাক্তারের আর দোষ কী। নোলা তো কমছে না। দিনরাত খাই খাই করলে ওজন বাড়বে না তো কী শুনি।'

প্রফেসর মুখার্জি গিন্নির গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে রইলেন। তারপর মনুজেন্দ্রর দিকে ফিরে বললেন, 'তারপর বেরাদর, কী খবর বলো। এমনি পথ ভুলে এসে পড়লে, নাকি মনোজ কোনও একটা কাজের বোঝা মাথায় চাপিয়ে পাঠিয়েছে?'

মনোজ চাকলাদার, এডিজি অফ সি আই ডি, হচ্ছেন প্রফেসর চিন্তাহরণ মুখার্জির দূরসম্পর্কের ভাগনে। প্রফেসর মুখার্জি এককালে সেলসে চাকরি করতেন। তারপর সাইকোলজি না সোশ্যাল সায়েন্স কীসে পি এইচ ডি ডিগ্রি বাগিয়ে কলেজ স্ট্রিটের একটা এম বি এ কলেজে মার্কেটিং-এর প্রফেসর হয়ে বসেছেন। পড়ান একটি অতি চিত্তাকর্ষক বিষয়, কনজিউমার বিহেভিয়ার।

এছাড়াও ভদ্রলোকের বহু বিচিত্র বিষয়ে উৎসাহ, সে অ্যাস্ট্রোনমি থেকে ইংরেজি সাহিত্য হোক বা লোকশিল্প থেকে পপুলার সায়েন্স। ছেলেমেয়ে নেই, লেকটাউনের বাড়ির দোতলার প্রায় পুরোটাই বইয়ে ঠাসা। সারাদিন ছাত্র পড়ানো আর বইপড়া নিয়েই আছেন। আর এই বিপুল জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর পর্যবেক্ষণ

ক্ষমতা। তাই পুলিশের বড়কর্তা ভাগেমশাইটি কেস গুরুচরণ হলেই মামাবাবুর শরণাপন্ন হন। মামাবাবুও দু-একটা জটিল কেস সলভ করে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বেশ কিছু গুণমুগ্ধ ভক্তও জুটিয়েছেন। মনুজেন্দ্র তাদের মধ্যে একজন। মনোজ চাকলাদারের ভাষায় ব্রাইট অ্যান্ড ব্রিলিয়ান্ট।

মনুজেন্দ্র লেবুর শরবতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'কাজের সূত্রেই এসেছি স্যার। একটা অদ্ভুত কেসে ফেঁসে গেছি। অ্যাপারেন্টলি একদম ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। অথচ কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বটে? তা একটু খুলে বলো তো বাপু।'

মনুজেন্দ্রর কথায় যা জানা গেল তা এই।

চৌধুরী এন্টারপ্রাইজেস এর অধিকর্তা অয়ন রায়চৌধুরী। বয়েস পঞ্চান্নর কাছাকাছি। সুনামের সঙ্গে একটি বহুজাতিক জামাকাপড়ের কোম্পানির উচ্চপদে ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে চাকরি ছেড়ে নিজের একটি ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা খোলেন। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। উদ্যোগী পুরুষ, তাই লক্ষ্মী করায়ত্ত হতে দেরি হয়নি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। স্ত্রী একটি গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল। একমাত্র ছেলে বিদেশে এম বি এ পড়ছে।

এহেন করিৎকর্মা মানুষটির অ্যাকাউন্ট থেকে সদ্য পঞ্চাশ লাখ টাকা কেউ বা কারা উঠিয়ে নিয়েছে। আর সেই নিয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট একেবারে তোলপাড়!

ভুরু কুঁচকে গেল প্রফেসর মুখার্জির, 'উঠিয়ে নিয়েছে মানে? ক্যাশে নিশ্চয়ই তোলেনি। সই জাল করার কেস? চেক ভাঙিয়েছে?'

'না, অনলাইন ট্রান্সফার।'

'ও, আই সি। মানে জামতাড়া কেস, ফিশিং। তা বাপু এসব তো তোমাদের সাইবার সেলের কাজ। সেখানে মস্ত মস্ত মহারথীরা বসে আছেন আধুনিক টেকনোলজি নিয়ে। আমি সেসবের কিছুই বুঝি না। এখানে আমাকে টানছ কেন?'

মাথা-টাথা চুলকে মনুজেন্দ্র জানাল যে টানার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ কেসটা ঠিক টিপিকাল সাইবার ফ্রডের কেস নয়।

সচরাচর এই ধরনের কেস প্রথমেই সাইবার সেলের কাছে যায় না। যায় ফিনানশিয়াল অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং ফ্রড সেল-এর কাছে। মানি লন্ডারিং বা ফ্রড ধরার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে মানি ট্রেইল ট্রেস করা, মানে টাকাটা কোথায় গেছে সেটা খুঁজে বার করা। তারপর সেই তদন্তের মোডাস অপারেন্ডি বার করার জন্য সাইবার সেলের শরণাপন্ন হতে হয়। যেমন অপরাধটা কীভাবে হল, কখন হল, কী কী উপায় অবলম্বন করা হল, ইত্যাদি।

অয়ন রায়চৌধুরী প্রভাবশালী লোক। আর পঞ্চাশ লাখ টাকাটাও কম টাকা নয়। ফলে প্রথম ফোনটাই যায় সিপি সাহেবের কাছে। সিপি সাহেবও তড়িঘড়ি একটা স্পেশ্যাল কমিটি গঠন করে ব্যাঙ্কিং ফ্রড সেল আর সি আই ডিকে যৌথভাবে এই কাজের ভার দিয়ে দিলেন। আর অবধারিত ভাবে তার দায়িত্ব এসে পড়ল

মনোজ চাকলাদারের ওপর।

'বুঝলুম। তা অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই তোমরা মানি ট্রেইল ধরে অপরাধীকে শনাক্ত করে ফেলেছ? মানে কার অ্যাকাউন্টে টাকাটা গেছে সেটা বার করা তো দু-মিনিটের কাজ। আর তারপর অ্যাকাউন্টের মালিককে ক্যাচ কট-কট করতে কতক্ষণ?'

মনুজেন্দ্র মুখটা ব্যাজার করে বলল, 'সে আর বলতে স্যার। বার করতে সত্যিই দু-মিনিট লেগেছে। কিন্তু সেসব দেখে কাকে ধরলাম জানেন?'

'কাকে?'

'জনৈক মহম্মদ আজিজুল হাসানকে। বাড়ি জয়নগর, অকুপেশন রিকশা চালানো। প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনায় স্থানীয় জয়নগর কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। সে অ্যাকাউন্ট তার কোনও কাজেই লাগেনি। পাসবুকটুক কবে কোথায় হারিয়েছে নিজেরও মনে নেই। তারই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয় পঞ্চাশ লাখ টাকা।'

উঠে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ইন্টারেস্টিং। তারপর?'

'তারপর আর কী। টাকাটা অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ একজন ক্যাশে তুলে পগারপার।'

'আর ইউ কিডিং মি মনু? অমন একটা পাতি রিকশাওয়ালার অ্যাকাউন্টে হঠাৎ করে পঞ্চাশ লাখ টাকা ঢুকল আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সাহেব সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন না? পুলিশকে ইনফর্ম করলেন না? তার ওপর জনৈক বেগানা আদমি আসল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সই করা চেক নিয়ে এসে এতগুলো টাকা ক্যাশে তুলতে চাইল, আর ম্যানেজার সাহেবও সোনামুখ করে পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্যাশে দিয়ে দিলেন? কিচ্ছুটি প্রশ্ন করলেন না? জয়নগরের মতো প্রত্যন্ত এলাকার একটা কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে সেই মুহূর্তেই অত টাকা মজুত ছিল? ইয়ার্কি হচ্ছে? এত কাঁচা প্লট তো আজকাল বাংলা সিরিয়ালেও পাওয়া যায় না ভাই।'

'ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও সেইদিন থেকে লা পাতা।' পাথরের মতো মুখ করে বলল মনুজেন্দ্র।

খানিক হাঁ করে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর ব্যাজার মুখ করে বললেন, 'আই সি। তার মানে ম্যানেজার সাহেবও এর মধ্যে জড়িত। তা তেনার ঠিকুজি কুলুজি জানা গেছে কিছু?'

'নাম অশোক সাহা। জয়েন করেন মাস ছয়েক আগে। বয়েস ছত্রিশ। অবিবাহিত। জয়নগরে একা একটা বাড়িভাড়া করে থাকতেন। মিশুকে না হলে কী হবে, সজ্জন এবং মৃদুভাষী বলে পরিচিত। পাবলিকলি কমই বেরোতেন। প্রতি সপ্তাহান্তে কলকাতায় নিজের বাড়ি যেতেন, সোমবার ফিরে ডিউটি জয়েন করতেন। ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি আর ম্যানেজার বাদে গোনাগুনতি ঠিক চারজন কাজ করেন। তাঁরা বলছেন মানুষটা এমনিতে লোক ভালো ছিলেন। কম কথা বলতেন, নিজের কাজটুকু নিয়ে থাকতেন। তিনি যে এমন কাজ করতে পারেন কেউ ভাবতেও পারেনি।'

'আর ক্যাশিয়ার? যিনি টাকা গুণে দেন? তিনিও কিছু বলেননি? নিশ্চয়ই

আগের দিন অত লাখ টাকা ব্যাঙ্কের ভল্টে আনা হয়েছিল। সে নিয়ে ক্যাশিয়ার প্রশ্ন তোলেননি?'

হতাশ দেখাল মনুজেন্দ্রকে, 'ক্যাশিয়ার কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে গেছিলেন। ম্যানেজার সাহেব নিজেই ক্যাশিয়ারের কাজ সামলাচ্ছিলেন।'

'বাহ বাহ। বেশ আটঘাট বেঁধে কাজ বলতে হবে। তা লোকটার পাস্ট হিস্ট্রি পেয়েছ কিছু?'

'ব্যাঙ্কে জয়েন করার সময় একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন বটে। সেটা দমদম নাগেরবাজারের দিকে কোথায় একটা। সেখানে গিয়ে জানা গেল উনি কোনওকালেই ছিলেন না। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক গ্র্যাজুয়েশন সব সার্টিফিকেট ফলস।'

'ব্যাঙ্কে জব পেতে গেলে তো গাদাগুচ্ছের এক্সাম দিতে হয় শুনেছি। সেখান থেকে ট্রেস করার ট্রাই করোনি।'

'সে সব এক্সাম সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে হয় স্যার। কোঅপারেটিভ হল নন সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক। সেখানে চাকরি করতে অত এক্সাম টেস্টামের প্রয়োজন হয় না। এমনি গ্র্যাজুয়েশন হলেই চলে। ইনি সাধারণভাবে অ্যাপ্লাই করে জবটা পেয়েছিলেন।'

'অসাধারণ! তা ভদ্রলোকের ছবি-টবি?'

'না স্যার। যেখানে ভাড়া নিয়ে ছিল সেখান থেকে সব নিয়ে হাওয়া। ট্রেস করা যায় এমন কিচ্ছুটি ফেলে যায়নি। চেহারার একটা বর্ণনা পেয়েছি বটে। কিন্তু তার সাহায্যে আর্টিস্টকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। খুবই সাদামাটা চেহারা। বিশেষত্ব বলতে ফ্রেঞ্চকাট আর মোটা ফ্রেমের চশমা। সে ফ্রেঞ্চকাট কেটে ফেলতে আর চোখে কন্টাক্ট লেন্স লাগাতে আর কতক্ষণ।'

'কিচ্ছুটি ফেলে রেখে যায়নি?'

'দুটো মুড়ো ঝাঁটা আর একটা বাথরুমের ভাঙা মগ ছাড়া আর কিচ্ছুটি না। খুব বেশি কিছু ছিলও না অবশ্য, যা ছিল দেড়খানা বড় ট্রলিব্যাগে এঁটে যায়। স্টেশনমাস্টার বলেছেন লোকটাকে দেখেছেন তিনটে বড় ট্রলিব্যাগ নিয়ে ট্রেনে উঠতে।'

'তাহলে তো হিসেব মিলেই গেল। বাকি দেড়খানা ট্রলিতে যে ক্যাশ টাকা ছিল সেটা বলার জন্য বোধহয় কোনও পুরস্কার নেই। তা মহামান্য ভদ্রলোকটি কোন ট্রেনে উঠেছিলেন সেটাও নিশ্চয়ই বলেছেন।'

'ভোর ছ'টার লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল।'

'তাহলে তো ঝামেলা মিটেই গেল। জয়নগর থেকে শিয়ালদা আসার পথে যে ক'টা স্টেশন পড়ে সে সবক'টায় সব রিকশাওয়ালা টোটোওয়ালা ইত্যাদিদের থেকে খোঁজ নাও, সাহাবাবু কোথায় নেমেছেন। এসব তো তোমাদের কাছে জলভাত।'

'জলভাত আপাতত পচাই হয়ে গেছে স্যার। সাহামশাই সোজা শিয়ালদাতেই নেমেছিলেন। মজিলপুরের এক মাছ ব্যবসায়ীও সেদিন ওই লোকালেই কলকাতা যাচ্ছিলেন। তিনিই আইডেন্টিফাই করেন। তাছাড়াও লোকটাকে চেনার মতো অনেকেই ছিল সেই ট্রেনে।

সাহাবাবু শিয়ালদা নামেন। তারপর এক কুলির মাথায় ট্রলি তিনটে চাপিয়ে

হাওয়া হয়ে যান। আমরা সেই কুলিকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি বটে। তাঁর কথামতো কুন্ডুমশাইকে নিতে একটা প্রাইভেট গাড়ি এসেছিল। তাতে ট্রলি তিনটে চাপিয়ে সাহামশাই লা-পাত্তা হয়েছেন, তার আর খোঁজ নেই। সেই গাড়িরও কোনও খোঁজ নাই, লুটের মালেরও কোনও ট্রেস নাই।'

প্রফেসর মুখার্জি কথাগুলো শুনে বেজায় চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। মনে হলো তিনি যেন ইহজগতে নেই। ইতিমধ্যে মনুজেন্দ্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে। এই কদিনে স্যারের সামনে সিগারেট খাওয়ার পারমিশন পেয়েছে সে।

একটু পর জেগে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'রিসেন্টলি কি এই ধরনের ফ্রড, বা যাকে বলে, ফিশিং সেসব একটু বেড়ে গেছে মনু? তোমাদের ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট কী বলছে?'

'দেখুন স্যার, আগেই বলেছি এসব কেস সরাসরি আমাদের কাছে আসে না। তবে ব্যাঙ্কিং ফ্রড সেলে আমার বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। তারা বলছে বটে যে মাস পাঁচ-ছয়েক হল এই ধরনের কেস হুট করে অনেকটা বেড়ে গেছে। সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টও নড়েচড়ে বসেছে।'

'বুঝেছি। তা মানি ট্রেইল যখন ফেল করে গেছে, তখন না হয় অপরাধের সোর্সে যাওয়া যাক। অয়নবাবু কী বলছেন? কোনও ফোন কল, সাসপিশিয়াস লিঙ্ক, বা ইমেইল, কোনও কিছু?'

'নাহ্। কিচ্ছুটি না।'

'অয়নবাবুর ফোনটা দেখা হয়েছিল ঠিক করে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা ফিশিং ম্যালওয়্যারের হদিস পাওয়া গেছে। কিন্তু সেটা কী করে ফোনে এল বোঝা যাচ্ছে না। আপনি এক কাজ করুন না স্যার! একবার গাত্রোত্থান করে অকুস্থলে চলুন। সামনাসামনি কথা হয়ে যাবে না হয়।'

'প্রস্তাব মন্দ নয়। তা অয়নবাবুর অফিস কোথায়?'

'সেক্টর ফাইভ। কলেজ মোড়। হার্ডলি বিশ মিনিট লাগবে।'

'গুড। সল্টলেক হয়ে যাব তো?'

'সার্টেনলি।'

'বাহ্, বাহ্। সিটি সেন্টারের সামনে একটা ভালো লেবানিজ রেস্তোরাঁ খুলেছে বুঝলে। যা শোয়ারমা বানায় না, পুরো শিল্প।'

* * *

অয়ন রায়চৌধুরীর বিশাল বড় চেম্বার। মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে বসেছিলেন গম্ভীর সৌম্যদর্শন মানুষটি। উঠে হ্যান্ডশেক করে দুজনকে বসতে বললেন।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় চলে এলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'টাকাটা কী করে উধাও হল একটু ডিটেইলসে বলবেন প্লিস? মানে কোনও সন্দেহজনক কল, বা ই-মেইল বা লিঙ্ক, কোনওকিছু এসেছিল

আপনার কাছে?'

মাথা নাড়লেন অয়নবাবু, 'না প্রফেসর মুখার্জি। আমি খুব সাবধানী এসব ব্যাপারে। আমার দুটো ফোন আছে, একটা সামাজিক কাজকর্মের জন্য, আর একটা ব্যাঙ্কিং-এর কাজের জন্য। সেকেন্ডটার নাম্বার খুব বেশি লোক জানে না, আমার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ব্যাঙ্কার এরকম দু-একজন বাদে। সেই ফোনে হোয়্যাটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, কিচ্ছু নেই। যে মেইল অ্যাকাউন্ট আছে সেটাও আমার পাবলিক মেইল অ্যাকাউন্টের থেকে আলাদা, ব্যাঙ্কিং ট্রানজাকশন ছাড়া ওতে আর অন্য কোনও মেইল আসে না। বাকি সমস্ত কাজকর্মের জন্য অন্য ফোন, অন্য মেইল আইডি আছে।

দিন দশেক আগে আমার ওই ব্যাঙ্কিং-এর ফোনটা বিগড়ে যায়। সেইদিনই নতুন ফোন কিনি। পুরোনো ফোনটা ফ্যাক্টরি রিসেট করি। নতুন ফোনে সমস্ত ব্যাঙ্কিং অ্যাপ ইনস্টল করি। রাতে ফোনটায় ডু নট ডিস্টার্ব মোড অন করে চার্জে বসিয়ে ঘুমোতে যাই।

পরদিন একটা কাজে কিছু টাকা ট্রান্সফার করার দরকার হয়েছিল। দুপুর নাগাদ সেটা করতে গিয়ে দেখি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে অজানা কার একটা অ্যাকাউন্টে তিন খেপে সাড়ে আট লাখ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলোর অ্যাপ খুলে চেক করি। দেখি সব মিলিয়ে আমার সাতটা অ্যাকাউন্ট থেকে মোট একুশটা ট্রানজাকশনের মাধ্যমে কেউ বা কারা পঞ্চাশ লাখ টাকা উঠিয়ে নিয়েছে।'

প্রফেসর মুখার্জি মনুজেন্দ্রর দিকে চাইলেন। মনুজেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত। টাকাটা যে একটা অ্যাকাউন্ট নয়, সাতটা অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছে সেটা প্রফেসর মুখার্জিকে আগে বলা উচিত ছিল।

প্রফেসর মুখার্জি জিগ্যেস করলেন, 'ওটিপি'-র নোটিফিকেশন আসেনি? তখনই তো আপনার জানার কথা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নামী ইন্ডাসট্রিয়ালিস্ট অয়ন রায়চৌধুরী, 'বললাম যে, ডু নট ডিস্টার্ব অন করে শুয়েছিলাম। কোনও নোটিফিকেশন আসার শব্দ শুনতে পাইনি। সকালে উঠে দেখেছিলাম একটা ওটিপি এসেছিল বটে, কিন্তু কীসের ওটিপি তখন সেসব বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু টাকা কাটলে তো ডেবিট কনফার্মেশনের মেসেজ আসার কথা।'

'সেটাই তো আশ্চর্যের কথা প্রফেসর মুখার্জি। এস এম এস, মেইল, কোথাও কোনও নোটিফিকেশন নেই।'

'কিন্তু অ্যাকাউন্ট থেকে এক রাতে এত টাকা তোলা হল, ব্যাঙ্ক সন্দেহ করল না? ওদের তো সিস্টেম আছে সাসপিশাস অ্যাক্টিভিটি ডিটেকট করার।'

'ওই যে বললাম, টাকাটা একটা অ্যাকাউন্ট থেকে নয়, সাতটা অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছে। খুব সম্ভবত সেটাই তার কারণ। পঞ্চাশ লাখ টাকা তোলা হয়েছে সব মিলিয়ে একুশটা ট্রানজাকশনের থ্রু'তে। মানে পার ট্রানজাকশন অন

অ্যান অ্যাভারেজ আড়াই লাখ টাকার একটু কম। আমার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায়ই এরকম ট্রানজাকশন হয়। তাই বোধহয় ওদের সিস্টেম সন্দেহ করেনি।'

'হুঁ। তার মানে যারা এই কম্মটি করেছে তারা আপনার ব্যাঙ্কিং হিস্ট্রি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাছাড়া আপনার ওই ফোনে একটা ম্যালওয়্যার পাওয়া গেছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা কী করে এল কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'একটা কথা বলুন তো রায়চৌধুরী সাহেব, আপনার অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস আপনি ছাড়া আর কে কে জানে?'

'বাড়িতে গিন্নি জানেন। এছাড়া জানেন আমার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আমার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইসর, আমার সেক্রেটারি আর আমাদের কোম্পানির চিফ ফিনানশিয়াল অফিসার। এই কজন ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়।'

'এঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়?'

স্পষ্টতই বিব্রত দেখাল রায়চৌধুরী সাহেবকে, 'দেখুন প্রফেসর মুখার্জি, এঁরা আমার সঙ্গে কাজ করছেন বহুদিন। এঁদের মধ্যে সি এফ ও আমার বন্ধুস্থানীয়। ফিনানশিয়াল অ্যাডভাইসর আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আমার কর্মচারী নন। এঁদের যদি পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হয় তাহলে সেটা আমার পক্ষে খুব অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আরে না না, পুলিশি জেরা নয়। কেসটার সব দিক দেখে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে যেটুকু সাহায্য লাগে আর কী। আর তাছাড়া আমি তো আর পুলিশ নই।'

হেসে ফেললেন অয়নবাবু, 'আপনি যে সেলসে ছিলেন সে আপনার কথা শুনেই বোঝা যায়। সে যাই হোক, আমি ওঁদের বলে দিচ্ছি। তবে দুটো অনুরোধ, এমন কোনও প্রশ্ন করবেন না যাতে ওঁরা বিব্রত বা ক্ষুব্ধ হন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হইচই হোক সেটা আমি চাই না। আর আমার কোম্পানির ব্যাপারে বাকি যা বলার আমার সেক্রেটারিই বলে দেবে।'

প্রফেসর মুখার্জি আর মনুজেন্দ্র উঠে পড়লেন। অনেক কাজ বাকি।

চৌধুরী এন্টারপ্রাইজেস এর বর্তমান কর্মীসংখ্যা ষাটের আশেপাশে। সেক্টর ফাইভে অফিস। সেখানে জনা বিশেক লোক বসে। বাকিরা কাজ করে হাওড়ার রাণীহাটির ফ্যাক্টরিতে। স্থায়ী কর্মী ছাড়াও অন্তত জনা চল্লিশ লোক ঠিকে কর্মী হিসেবে কাজ করে চৌধুরী এন্টারপ্রাইজে।

এসব খবর দিচ্ছিলেন পলাশবাবু, অয়ন রায়চৌধুরীর সেক্রেটারি। করিতকর্মা লোক। বয়েস তিরিশের আশেপাশে। রায়চৌধুরী সাহেবের আগের সেক্রেটারি শালিনী ম্যাডাম মাস ছয়েক আগে চাকরি ছেড়ে দেন। তারপর ইনি বহাল হয়েছেন।

পলাশবাবুর বাড়ি সোনারপুরে। আগে থাকতেন গড়িয়ায়, ভাড়া বাড়িতে। মাস আটেক হল সোনারপুরে নিজেদের বাড়ি করে উঠে এসেছেন। বাড়িতে থাকেন বাবা আর মা। বাবা কলকাতায় জুটমিলে কাজ করতেন, মা গৃহবধূ। স্কুলের পড়াশোনা

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে, কলেজ দিনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ। বি কম অনার্স। তারপর দু-চারটে ছোটখাটো কোম্পানিতে কাজ করে জয়েন করেন একটি ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে, অ্যাডমিন অফিসার হিসেবে। তারপর এখানে, রায়চৌধুরী সাহেবের সেক্রেটারি হিসেবে। এখনও বিয়ে করেননি, বাড়ি থেকে মেয়ে দেখা চলছে।

'এখানে মাইনেপত্তর কীরকম? মানে বিয়েশাদি করলে তো খরচা বাড়ে, তাই জিগ্যেস করা। অন্যভাবে নেবেন না ভাই।'

'না, না, অন্যভাবে নেব কেন? মাইনে ওই কেটেকুটে হাজার পঞ্চাশ হাতে পাই। মোটামুটি চলে যায়। বাবা-মাকে বলেছি চাকরি করা মেয়ে দেখতে, যাতে বিয়ের পর খুব অসুবিধা না হয়।'

'ভাই, বোন কেউ?'

একটু অস্বস্তি খেলে যায় পলাশবাবুর মুখে। একবার বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতের ঘড়ির ব্যান্ড ঠিক করলেন। তারপর বললেন, 'এক দাদা ছিল। আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই বলে আর উল্লেখ করিনি।'

ব্যাপারটা বিশদে জানা গেল। পলাশবাবুর এক দাদা ছিল, ওঁর থেকে চার বছরের বড়। পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলেন। কমার্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করেন, তারপর দিল্লি চলে যান এম. কম-এর জন্য। তারপর ওখান থেকেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করে কোন এক মস্ত বড় ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে বিদেশ চলে যান। ব্যস, তারপর আর খোঁজ নেই।

'খোঁজ নেই মানে?'

মাথা নিচু করলেন পলাশ, 'আস্তে আস্তে দাদার চিঠি আসা কমে গেল। বাবা বা আমি পাড়ার মোড়ের ফোন বুথ থেকে মাঝে মাঝে এস টি ডি করতাম দাদার সঙ্গে কথা বলার জন্য। বুঝতে পারতাম দাদা বিরক্ত হতো। কথা বলতে চাইত না, তাড়াতাড়ি ফোন কেটে দিত।

শেষে একদিন একটা লম্বা চিঠি দিয়ে জানাল যে ও গ্রিন কার্ড পেয়ে গেছে। ওদেশেই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আমরাও যেন খুব দরকার না হলে যোগাযোগ না করি।'

'এসব কবে হল?'

'বছর বারো আগে দাদা দিল্লি চলে যায়, গত চার বছর ধরে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

তিনজনে একটু চুপ করে রইলেন। নীরবতা ভাঙলেন প্রফেসর মুখার্জিই। 'আপনি তো স্যারের সেক্রেটারি। কী কী দেখেন?'

'স্যারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, মিটিং, ট্রাভেল ডিটেইলস, ডেলি রিপোর্ট সবই দেখতে হয়। অফিশিয়াল ছাড়াও স্যারের কিছু পার্সোনাল কাজও দেখতে হয়।'

'পার্সোনাল কাজের মধ্যে কি টাকাপয়সার ট্রানজাকশন পড়ে?'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন পলাশ, 'পড়ে না বলাটা মিথ্যে বলা হবে। হ্যাঁ, ওঁর বেশ কিছু ফিনানশিয়াল ট্রানজাকশন আমাকে দেখতে হয়। যেমন ধরুন ক্লাবের

বিল পেমেন্ট, ক্রেডিট কার্ডের বিল পেমেন্ট, এই সব।'

'তার মানে ওঁর অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস সবই নিশ্চয়ই আপনি জানেন?'

'জানি তো বটেই। কিন্তু তার মানে যদি আপনি ইন্ডিকেট করেন যে এটা আমার কাজ...'

'আরে, না, না মিস্টার রাহা। আমরা মোটেও সেসব মিন করছি না। তাছাড়া কাজটা অত সহজও নয়। যাক। এবার একটু আপমাদের চিফ ফিনানশিয়াল অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন প্লিস?'

* * *

মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালা স্বভাবে অয়ন রায়চৌধুরীর ঠিক উলটো। হাসিখুশি দিলদার মানুষ। যত্ন করে বসালেন, চা অফার করলেন। তারপর বললেন, 'বলুন প্রফেসর সাব, কী হেল্প করতে পারি আপনাদের।'

কথায় কথায় জানা গেল নিজের কোম্পানি খোলার আগে অয়ন রায়চৌধুরী যেখানে চাকরি করতেন, মোহনদাস সেই কোম্পানিরই অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। দুজনের বেশ গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাই রায়চৌধুরী সাহেব নতুন কোম্পানিতে সি এফ ও-র পোস্ট অফার করলে না করতে পারেননি।

'নিজে মাড়োয়ারি হয়েই বলছি প্রফেসর সাব, ব্যবসাবুদ্ধিতে অয়ন বড় বড় মাড়োয়ারি বা গুজরাটি বিজনেসম্যানের কান কাটতে পারে।'

মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালার তিন মেয়ে, তার মধ্যে দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে। একজন অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, আরেকজন দিল্লিতে। জামাইরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় এবং ছোট মেয়েটি ডিভোর্সি, অর্থাৎ কুলকলঙ্ক। তার মাথায় সমাজসেবার ভূত ঢুকেছে। সে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়ায়। মোহনদাসের গিন্নির একটা বুটিক আছে। দেবাদেবী দুজনেই ঝাড়া হাত-পা। অবসর বয়সের জন্য টাকা জমাচ্ছেন আর দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

টাকা উধাওয়ের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে পড়লেন ঝুনঝুনওয়ালা সাহেব। 'ভেরি আনফরচুনেট ইনসিডেন্স। অয়ন এমনিতে খুব সাবধানী মানুষ। টাকাপয়সার দিকে কড়া নজর। আর আজকাল যা হচ্ছে, তাতে তো ও আরও সতর্ক আর সাবধানী হয়ে পড়েছে। সেই ওর অ্যাকাউন্ট থেকে জালিয়াতরা এত টাকা তুলে নেবে হতে পারে না।'

'বন্ধু হিসেবে এবং সি এফ ও হিসেবে ওঁর অ্যাকাউন্ট নাম্বার নিশ্চয়ই আপনার জানা?'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মোহনদাস, 'এমনিতে জানার কথা নয়। কারণ আমি কোম্পানির ফিনানশিয়াল অফিসার, ওর নয়। আর বন্ধুত্বের কথাই যখন উঠল তখন বলি, আপনার বন্ধুর অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস আপনি জানেন কী? জানেন না। তাই আমারও জানার কথা নয়। তবে আমি জানি, কিন্তু সেটা অন্য কারণে। সেটা

আপনাকে বলা যাবে না। ওটা আপনি অয়নের কাছ থেকেই শুনে নেবেন না হয়। আমার অন্য একটা মিটিং আছে, আমাকে একটু বেরোতে হবে। প্লিস এক্সকিউজ মি।'

এর পর কথা এগোনোর মানে হয় না। দুজনেই উঠে পড়লেন।

* * *

দুজনে লাঞ্চটা সারলেন সেক্টর ফাইভেই, অয়ন রায়চৌধুরীর অফিসের ঠিক উল্টোদিকের একটি পথ রেস্তোরাঁতে। ব্যস্ত রাস্তা, মনুজেন্দ্রর ভাষায় 'কিলো কিলো লোক' কিলবিল করছে। তার মধ্যেই লাঞ্চ টাইমে পিলপিল করে লোক ঢুকছে আশেপাশের বিভিন্ন অস্থায়ী ঝুপড়িতে, এখানকার ভাষায় যার নাম ঝুপস।

খিচুড়ি আর বেগুনভাজা খেতে খেতে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'তোমার ব্যাঙ্কিং ফ্রড সেল আর সাইবার সেলের বন্ধুরা কী বলছে মনু? হঠাৎ করে সাইবার ফ্রড এত বেড়ে গেছে কেন?'

'ক্রাইম কেন বাড়ে, সে আমি কী করে বলব! আপনারা সাইকোলজি, কনজিউমার বিহেভিয়ার এসব ভারী ভারী সাবজেক্ট পড়ান, আপনিই বেটার বলতে পারবেন। তবে তারা একটা অদ্ভুত কথা বলছে।'

'কী?'

'আপনি তো জানেন, দেশের সাইবার ক্রাইমের প্রায় সত্তর থেকে আশি পার্সেন্টি ঘটে জামতাড়া থেকে। কিন্তু রিসেন্ট যেসব সাইবার ফ্রড হচ্ছে সেসব টেলিকলিং এর থ্রুতে হচ্ছে না। কোনও ফ্রড কল, সাসপিশাস লিঙ্ক, ওটিপি শেয়ারিং এসব ছাড়াই লোকজনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে।'

কথা বলতে বলতেই প্রফেসর মুখার্জি লক্ষ্য করলেন উল্টোদিকে অয়ন রায়চৌধুরীর অফিস থেকে কিংশুক বেরিয়ে এলেন। অফিসের নীচেই একটি জেরক্স কাম মোবাইল রিচার্জের দোকান, নামটি ভারী সুন্দর, মনসপর্ণা। কিংশুক সেই অফিসে কিছু কাগজ দিলেন। তারপর তার জেরক্স নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

সেই দেখে প্রফেসর মুখার্জিরও যেন কিছু একটা মনে পড়ে গেল। তিনি খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে বললেন, 'আমারও কয়েকটা জেরক্স লাগবে, বুঝলে। করিয়ে নিই।'

প্রফেসর মুখার্জি রাস্তা ক্রস করে জেরক্সের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর ওয়ালেট থেকে নিজের আধার আর প্যান কার্ড বার করে বললেন, 'দাদা, পাঁচটা করে আধার কার্ড আর প্যান কার্ডের জেরক্স লাগবে। কত পড়বে?'

জেরক্স সেন্টারের মালিক মুখ তুলে চাইলেন। বয়েস প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই। গায়ের রঙ কালো, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। গালে হালকা চাপদাড়ি। বললেন, 'আধারের দু-সাইড কি পেজের দু-দিকে হবে নাকি একদিকে?'

'এক পিঠে।'

'তাহলে পনেরো টাকা দিন।'

লোকটা ডান হাত বাড়িয়ে আধার কার্ড আর প্যান কার্ড নিল। মনুজেন্দ্র লক্ষ্য করল লোকটার ডান কব্জির নীচে, ঘড়ির ব্যান্ডের কাছাকাছি একটা লম্বা কাটা দাগ আছে।

জেরক্স মেশিনের গম্ভীর আওয়াজের সঙ্গেই দোকানটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন প্রফেসর মুখার্জি। মোবাইল রিচার্জ লেখা আছে বটে, তবে তার সঙ্গে ইয়ারফোন, চার্জার, ব্যাক কভার, পাওয়ার ব্যাঙ্ক, স্ক্রিন গার্ড সবই পাওয়া যায়।

জেরক্স নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর মুখার্জি। একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। ভুরু কুঁচকে আপন মনেই বললেন, 'ইন্টারেস্টিং।'

'কীসের কী ইন্টারেস্টিং?'

'বাদ দাও, ও তেমন কিছু নয়। তা আর কিছু জানতে পারলে?'

'আরও একটা অদ্ভুত জিনিস। ভিক্টিমদের বেশিরভাগেরই অফিস বা বাসস্থান এই সেক্টর ফাইভ বা তার আশেপাশে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কেস তো বেশ কিউরিঅসার হয়ে দাঁড়াচ্ছে মনু। এর মানে কী?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সচরাচর এইসব জামতারা গ্যাং কোনও নির্দিষ্ট জিওগ্রাফিক এরিয়া টার্গেট করে না। তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে ভিক্টিমদের ফোন নাম্বার জোগাড় করে কল করে আর বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে, কথার জালে জড়িয়ে কার্ড নাম্বার, সিভিভি নাম্বার, ওটিপি এসব জেনে নিয়ে অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে। এখানে এরা শুধু একটা এরিয়াকে কেন টার্গেট করছে বলা মুশকিল।'

'যাদের যাদের অ্যাকাউন্ট থেকে এইভাবে ফ্রড করে টাকা তোলা হয়েছে তাদের নাম ধাম ডিটেইলস পাওয়া যাবে?'

'যাবে না কেন? দিব্যি যাবে। কালই পেয়ে যাবেন। তবে টাকাটা ঠিক কীভাবে তোলা হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা অন্ধকারে। সাইবার জালিয়াতির বিভিন্ন উপায় আছে। টেকনিক্যাল লোক ছাড়া ডিটেইলসে বলা মুশকিল।'

'তা তেমন জান পহেচান টেকনিক্যাল লোকের সঙ্গে কথা বলাও না একবার। যিনি সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ।'

মনুজেন্দ্র ফোনটা বার করে কাকে যেন কল করল। তারপর বলল, 'চলুন, আপনাকে একদম পয়লা নম্বরের একজন এক্সপার্টের সঙ্গে কথা বলাই। ইনিই অয়ন রায়চৌধুরীর ফোন নিয়ে ছানবিন করেছিলেন। তবে আজ নয়, কাল।'

* * *

সৌরভ মিত্রর সঙ্গে দেখা হল পরের দিন। সৌরভ মিত্র হলেন ভারত সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স ও ইনফর্মেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার। প্রফেসর মুখার্জি প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার শুনে বয়স্ক কাউকে আশা করেছিলেন। আলাপ

হয়ে দেখলেন ভদ্রলোক যথেষ্ট ইয়াং, বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের বেশি বয়েস হবে না।

কথাটা শুনে হেসে ফেললেন মিত্রমশাই। 'আরে পদের নাম শুনে কেউকেটা ভেবে ফেলবেন না আবার। আমি সি-ড্যাকের সায়েন্টিস্ট। পোস্টের নামটাই ওরকম রাশভারী, ওজনে খুবই হাল্কা।'

ওঁরা বসেছিলেন সল্টলেক সিটি সেন্টারের কাছাকাছি একটা ওপেন এয়ার বারে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, বাতাসে বেশ একটা খুশি খুশি শীতের ভাব। আজ শনিবার, সিটি সেন্টার সুবেশা যুবক যুবতীদের ভিড়ে ভর্তি। কেউ কেনাকাটা করতে এসেছে, কেউ সিনেমা দেখতে, কেউ বা শুধুই ঘুরতে। জায়গাটা বেশ লাগে প্রফেসর মুখার্জির।

মিত্রমশাই রসিক লোক। কথায় কথায় জানা গেল বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সাইবার সিকিউরিটির পাঠ দিয়ে থাকেন। এই নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালিখিও করেন অল্পস্বল্প।

অয়ন রায়চৌধুরীর ঘটনাটা খুলে বললেন প্রফেসর মুখার্জি। সৌরভবাবু পুরো ঘটনাটা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'কেসটা একটু অদ্ভুত। সাইবার জালিয়াতির যে কটা প্রচলিত মেথড আছে, এখানে তার সঙ্গে একটাও খাপ খাচ্ছে না। তাহলে টাকাটা গেল কী করে?'

'আপনি সাইবার জালিয়াতির স্টেপগুলো একটু বুঝিয়ে বলবেন প্লিস?'

মিত্তির মশাই একটা বিয়ার খাচ্ছিলেন। তিনি একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন।

'সাইবার জালিয়াতির অগুনতি পদ্ধতি আছে। সব লিস্ট ধরে ধরে বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে। তবে প্রধান উপায় হচ্ছে তিনটে।

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে ক্ল্যাসিকাল ফিশিং। ধরুন, কোনও মোবাইল অপারেটরের একটা নাম্বার সিরিজ ৯৮৩০ দিয়ে শুরু হয়। তাহলে ওই সিরিজের যাবতীয় মোবাইল নাম্বার ৯৮৩০-০০০০০০ থেকে ৯৮৩০-৯৯৯৯৯৯-এর মধ্যেই পড়বে। জামতাড়ার 'সাইবারওয়ালো'রা কোনও ডেটাবেস বা লিস্টের বদলে এই ধরনের সিরিজের প্রথম থেকে শেষ অবধি সবকটা নাম্বারকে পর্যায়ক্রমে টার্গেট করে যায়। এর পরের ধাপটা পুরোটাই গল্পদাদুর আসর। কার্ড ব্লক হওয়ার ভয় দেখানোই হোক বা আপ-গ্রেডেশনের টোপ, ইনসুরেন্স পলিসির ক্লেইম সার্ভিস হোক বা মোবাইল ওয়ালেটের কে.ওয়াই. সি. আপডেট, নামজাদা রেস্তোরাঁর বিশাল ছাড় হোক বা কোভিড অতিমারীর তত্ত্বতালাশ,—যেনতেন প্রকারে কার্ডের নাম্বার, আর সিভিভি নাম্বার হাতাতে পারলেই কেল্লা ফতেহ্।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে 'ই-সিম' বা 'এম্বেডেড-সিম'। ফোনে আলাদাভাবে সিমকার্ড ঢোকানোর বদলে একটু দামি হ্যান্ডসেট, স্মার্টওয়াচ, বা ড্রোনের মতো ডিভাইসগুলোর মাদারবোর্ডেই এই সিম এমবেডেড বা সোল্ডার করা থাকে। এখানেই নতুন খেলার মাঠ! আগে হাজাররকম টোপ দেখিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বর হাতে পাওয়ার পর নকল বা জাল আইডি দেখিয়ে মূল সিমটাকে বন্ধ করিয়ে

ডুপ্লিকেট সিম ইস্যু করিয়ে তাকে অ্যাক্টিভেট করানোর জন্য দু-তিনদিন অপেক্ষা করতে হতো। তারপর শুরু হতো ডুপ্লিকেট সিমের দৌলতে ব্যাঙ্কিং বা উই.পি.আই. অ্যাকাউন্টগুলোর ক্লোনিং বা বেআইনি লেনদেন। এখন অনেক সহজে, অনেক কম সময়েই 'ই-সিম' চালু করিয়ে নেওয়া যায়। তার পরের ঘটনা বোঝাই যাচ্ছে।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে থ্রু রিমোট-অ্যাক্সেস টুল। মেসেজ বা হোয়্যাটসঅ্যাপে টাইনি ইউআরএল বা বিট ডট এলওয়াই-জাতীয় ইউআরএল শর্টেনিং সার্ভিস ব্যবহার করে ডাউনলোড লিংক পাঠাও। ক্লিক করলেই ডাউনলোড/ ইনস্টল হয়ে যায়। তারপর রিমোট-অ্যাক্সেস টুল ব্যবহার করে ফোনের কনট্রোল নিয়ে নিলেই ব্যস, কাজ হাসিল।

'কিন্তু অয়নবাবুর ফোন চেক করে যা বুঝলাম, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এই তিনটের একটাও হয়নি। অয়নবাবু তাঁর ফোন একদম ক্লিন রেখেছিলেন। আমরাও সেটাই সাজেস্ট করি। ব্যাঙ্কিং-এর জন্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা সিম, সম্ভব হলে আলাদা ফোন ব্যবহার করতে বলি। অয়নবাবুর ওই আলাদা ফোনে কোনও ফোন আসেনি, কোনও ওটিপি শেয়ারিং, বিভিন্ন স্ক্রিন শেয়ারিং অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়নি। কোনও বিট ডট এলওয়াই বা টাইনি ইউআরএল কোড আসেনি। অথচ একটা ডেঞ্জারাস ম্যালওয়্যারের হদিস পাওয়া গেছে যার থ্রু দিয়ে ফোনটাকে রিমোটলি অ্যাক্সেস করা যায়। কিন্তু সেটা ফোনে কী করে এলো, বোঝা যাচ্ছে না, স্ট্রেঞ্জ!'

'তাহলে কী করা যায় বলুন তো? কীভাবে এগোনো যেতে পারে?

'আমার অভিজ্ঞতা বলছে এখানে কোনওভাবে অপরাধীর হাতে দুটো জিনিস এসে গেছিল, এক ওই ফোনে কোনও ম্যালওয়্যার ইনস্টল করার ব্যবস্থা। দুই, অয়নবাবুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস হস্তগত করা। এছাড়া আর কোনও উপায় থাকতে পারে না।'

সৌরভ মিত্রকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে দুজনে উঠে পড়লেন। এখনও দুজনের সঙ্গে দেখা করা বাকি।

* * *

অয়ন রায়চৌধুরীর ফিনানশিয়াল অ্যাডভাইসর হচ্ছেন মিস রূপা সামন্ত। বয়েস চল্লিশ ছোঁয়নি এখনও। বেশ চটকদার চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। কথাবার্তাও তেমনই ধারালো। আগে কাজ করতেন একটা ব্যাঙ্কে। বসের সঙ্গে রাগারাগি করে চাকরি ছেড়ে নিজের ফিনানশিয়াল কনসাল্টিং-এর ব্যবসা শুরু করেন। অয়ন রায়চৌধুরীর অ্যাকাউন্টও ওই ব্যাঙ্কেই ছিল। তিনিও এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তাই মিস সামন্তর হাতে নিজের পোর্টফোলিও তুলে দেওয়ার আগে দ্বিতীয়বার ভাবেননি।

'মিস্টার রায়চৌধুরীর পার্সোনাল অ্যাসেট যে শুধু ব্যবসা করে বেড়েছে তা

নয়, তার পিছনের এই রূপা সামন্তর হাতযশ কম নয় স্যার।'

কথাটা বেশ অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন মিস সামন্ত। তবে অহঙ্কার উনি করতেই পারেন। এত অল্প ক'দিনের মধ্যে সল্টলেকে নিজের ফিনানশিয়াল কনসাল্টিং-এর অফিস খুলে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করা কম কথা নয়।

রূপা ম্যাডামের বর সরকারি চাকরি করেন, সেক্টর ফাইভেই অফিস। একটি ছেলে আছে আট বছর বয়েস, ক্লাস টু-তে পড়ে। নিউটাউনে থ্রি বিএইচ কে ফ্ল্যাট, দ্যাবাদেবীর সুখের সংসার।

সাইবার বাটপাড়ির কথাটা উঠতেই মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল রূপা সামন্ত'র। হ্যাঁ, শুনেছেন বই কি, সেই দিনই শুনেছেন। অয়নবাবু নিজেই কল করে জানিয়েছেন। তবে তিনি এর জন্য যে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন সেইটে জানা ছিল না ওঁর।

'আরে, না, না, আমি গোয়েন্দা নই। পুলিশের অনুরোধে একটু হেল্প করছি মাত্র।' হেঁ-হেঁ করে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আসলে বড় মানুষ তো। বুঝতেই পারছেন, সব দিক খতিয়ে দেখে...'

'তা এই তদন্তে আমি কী হেল্প করতে পারি বলুন?'

প্রফেসর মুখার্জি পুরো কথাটা খুলে বললেন। এমনকী সৌরভ মিত্রমশাই এর সঙ্গে আলোচনার পর্বটাও। শেষে বললেন, 'আসলে যাঁরা যাঁরা ওঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস জানেন...'

রূপা সামন্ত অল্প হেসে বললেন, 'শুধু ওঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস কেন, ওঁর সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট থেকে শুরু করে মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর হালহকিকত, সব আমি জানি। ওঁর ডি ম্যাট অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার কেনাবেচাও আমিই করে থাকি। ওঁর প্রতিটি আর্থিক লেনদেন আমার নখদর্পণে থাকে। আপনি যদি ভাবেন সেই সুযোগে আমি ওঁর অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছি তাহলে ভুল ভাবছেন স্যার। সেই সুযোগের অপব্যবহার করতে হলে অনেক আগেই করতে পারতাম, পঞ্চাশ লাখ কেন, পঞ্চাশ কোটি হাপিস করে হাওয়া হয়ে যেতে পারতাম। আপনারা ধরতে পারতেন?'

প্রফেসর মুখার্জি হেসে বললেন, 'আপনার কী মনে হয় মিস সামন্ত, এটা আমাদের মাথায় কি আসেনি? আমরা সেই জন্য আপনাকে জিগ্যেস করিনি ম্যাডাম। আমরা জানতে চাইছি কীভাবে ওঁর তিন-তিনটে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস, মানে ব্যাঙ্ক, ব্রাঞ্চ, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, আই এফ সি কোড, এসব কী করে অপরাধীদের কাছে লিক হয়ে গেল। আপনার কাছ থেকে কী কোনওভাবে এটা লিক হওয়া সম্ভব?'

'আজ্ঞে না। এসব বিষয়ে আমি অত্যন্ত সাবধানী। ক্লায়েন্টদের সমস্ত ট্রানজাকশনস আমি নিজেই হ্যাণ্ডল করি। আমার অফিসে যে চারজন এমপ্লয়ি আছে তাদেরও এই ব্যাপারে সতর্ক করা আছে। আর তারাও যথেষ্ট অভিজ্ঞ আর চৌখস লোক। তারা ভালভাবেই জানে যে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক হলে আমি তাদের জেলে দেব। ফলে ওই দিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

একই কথা শোনালেন অয়ন রায়চৌধুরীর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মনোহর শ্রীবাস্তবও। তিনি বহুদিন ধরে অয়ন রায়চৌধুরীর ট্যাক্স ফাইলিং করেন। তাঁর কাছে অয়নবাবুর সব ডিটেইলসই থাকে। কিন্তু তিনি বা তাঁর অফিসের কেউ প্রফেশনাল এথিক্সের বাইরে গিয়ে এই কাজ করার কথা ভাবতেই পারে না।

* * *

প্রফেসর মুখার্জি পরের দিন ভবানী ভবনে সিআইডি-র অফিসে পৌঁছে দেখলেন মনুজেন্দ্র গালে হাতে দিয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবছে। হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই।

প্রফেসর মুখার্জি গলা খাঁকরে বললেন, 'এ কী, একজন ইয়ং ব্রাইট আরক্ষাজীবী এরকম ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে কেন? গড়ের মাঠে ইউ এফ ও নেমেছে, নাকি নিউ আলিপুরে জ্যাক দ্য রিপার নবকলেবরে আবির্ভূত হয়েছেন?'

মনুজেন্দ্র ব্যাজার মুখে বলল, 'ইয়ার্কি নয় স্যার। ওপর থেকে হেভি প্রেশার। এদিকে আমার অবস্থা সেই নারায়ণ সান্যাল বর্ণিত হর্নস অফ আ ডায়নামোর মতো, এদিকে ব্যাটারিও ডাউন, ওদিকে ডায়নামোও স্টার্ট নিচ্ছে না। না এদিকে সেই পলাশবাবুর কোনও খবর, না ওদিকে অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস কীভাবে ফাঁস হল তার হদিশ। অথৈ জলে পড়ে আছি মাইরি।'

'তা তোমাকে যে নাট্যাঙ্কের বিভিন্ন কুশীলবদের সব খোঁজখবর নিতে বললাম, তার কী হল?'

খবরটা সবিস্তারে জানাল মনুজেন্দ্র। স্থানীয় থানা থেকে সব খবরই বিশদে নিয়েছে সে।

পলাশবাবুর বাবা-মা অতি নিরীহ লোক। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে অতি সজ্জন এবং পরোপকারী বলে পরিচিত। দুজনেই প্রাচীন যুগের লোক, ফিচার ফোন, মানে ওঁদের ভাষায় 'টেপা' ফোন ব্যবহার করেন। তবে বড় ছেলেকে নিয়ে রাহা দম্পতি কিছুই বলতে চাননি।

'কী বললে? রাহা দম্পতি?'

'হ্যাঁ, ওনাদের উপাধি রাহা।'

পলাশ রাহার পারিবারিক রিপোর্টের কপি হাত বাড়িয়ে নিলেন প্রফেসর মুখার্জি। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, 'পলাশবাবুর দাদাটির নাম জানতে পারলে?'

'কিংশুক রাহা।'

'আর কোনও আত্মীয়স্বজন?'

'তেমন কেউ না। তবে প্রতি উইকেন্ডে পলাশবাবুর এক মাসতুতো ভাই দেখা করতে আসেন। শুক্রবার আসেন, সোমবার সকালে নিজের বাড়ি চলে যান।'

'তাঁর ব্যাপারে খোঁজ খবর লাগিয়েছ?'

'নাহ। কেন, পাত্তা লাগাতে হবে? সে আমার লোককে বলে দিচ্ছি। শ্যাডো

করবে হপ্তা দুয়েক।'

'ওকে। নেক্সট?'

'মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালা এমনিতে ভালো লোক। আগের কোম্পানিগুলোতে খোঁজ নিয়েছি, ট্র্যাক রেকর্ড ভালোই। দুই জামাইয়ের একজন দিল্লিতে এন আই এ'তে কাজ করে, ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে। আরেকজন অস্ট্রেলিয়াতে একটি সফটওয়্যার কোম্পানির পার্টনার। দুই জামাইয়ের সঙ্গেই ঝুনঝুনওয়ালার খুব ভালো সম্পর্ক।

'একজন সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ, আর আরেকজন সফটওয়্যার কোম্পানির মালিক। চমৎকার কম্বিনেশন। আর তারপর?'

'রূপা সামন্তর নামে ওঁর আগের ব্যাঙ্ক থেকে একবার কেস করা হয়েছিল।'

সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'সে কী? কেন? ফান্ড এমবেজলমেন্ট? তহবিল তছরুপ?'

বিব্রত হল মনুজেন্দ্র, 'সেটা এখনও জানি না। থানার রেকর্ড চেয়ে পাঠিয়েছি। আজ পেয়ে যাব। তবে আরেকটা মারাত্মক খবর আছে।'

'কী?'

'রূপা সামন্তর হাজব্যান্ডের নাম জানেন?'

'কী করে জানব? তদন্তটা আমি করছি, না তুমি?'

'সৌরভ মিত্র। যার সঙ্গে কাল অত কথা বলে এলেন।'

প্রফেসর মুখার্জি মুখটা দুবার খাবি খাওয়া মাছের মতো হাঁ করলেন। গলার স্বর ফুটল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মনুজেন্দ্র। 'আর মনোহর শ্রীবাস্তব কলকাতার রইস আদমিদের প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের ট্যাক্সেশন সামলান। এমনকি রুলিং আর অপোজিশন পার্টি মিলিয়ে কমসে কম তিরিশ থেকে চল্লিশ জন টপ লেভেলের লিডারের পার্সোনাল ট্যাক্সও উনিই দেখেন। ফলে ওঁকে বোধহয় বাদ দেওয়াই যায়।'

'মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডস?'

'ওসব চাইলেই ঝট করে পাওয়া যায় না স্যার। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সিনেমা সিরিয়ালে যা দেখায় ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাল সন্ধে নাগাদ পাব আশা করছি।'

'গুড মানু, কার কার কল রেকর্ড চেক করেছ?'

'পলাশ রাহা, রূপা সামন্ত, মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালা, ব্যাস,এই তিন জন।'

'হোয়াই নট অয়ন রায়চৌধুরী?'

'সে কী স্যার? ভিকটিমের কল রেকর্ডস চেক করতে যাব কেন?'

'আহ, করোই না বাপু। কোন এক মহাপুরুষ ছাই পেলেই উড়িয়ে দেখার একটা সদুপদেশ দিয়ে গেছিলেন না?'

'যথা আজ্ঞা। আর কোনও আদেশ স্যার?'

প্রফেসর মুখার্জি চোখ বুজে ফেলেছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'কয়েকটা

জিনিসে একটু খটকা লাগছে হে। যেমন ধর মোহনদাসের ওই কথাটা। উনি কী করে অয়নের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট নম্বর জানলেন? দ্বিতীয়ত, কিংশুক রাহার স্যালারিটা খেয়াল আছে তোমার?'

'আছে স্যার।'

'একজন সাধারণ বি কম গ্রাজুয়েটকে অত টাকা স্যালারি দিয়ে কে সেক্রেটারি রাখে মনু? আর তৃতীয়ত, রূপা সামন্তর ওপর অয়ন রায়চৌধুরী এত স্নেহশীল কেন? শুধুই স্নেহ? না অন্যকিছুও আছে?'

'আপনি মাইরি দিন দিন পারভার্ট বুড়োদের মতো হয়ে যাচ্ছেন।'

হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করে হাত ওলটালেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কী করব বলো মনু, আমার মন তাই ওরকম। আসল কাঠ বাঙাল তো, আঁশটে গন্ধ ছাড়া থাকতে পারি না হে। এখন বলো তো বাপু, আলটিমেটলি হাতে কী রইল?'

'পেনসিল আর ইরেজারটা অবধি নেই স্যার।'

'হুমম। এখনও অবধি আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। রূপা সামন্ত, কিংশুক রাহা আর মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালা ছাড়া সন্দেহ করার মতো আর কেউ নেই। খুব সম্ভবত জামতাড়া গ্যাং-এর কাজ নয়। মানি ট্রেইলের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কী করে অয়ন রায়চৌধুরীর অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিক হল জানা যাচ্ছে না। কী করে ওঁর ফোনে ম্যালওয়্যার ইনস্টল হল জানা যাচ্ছে না। মানে বেসিক্যালি আমরা এখনও কিছুই জানতে পারিনি।'

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর মুখার্জি। বললেন, 'একটা কথা বলো মনু, জয়নগর থেকে কলকাতা আসতে গাড়িতে কতক্ষণ সময় লাগে?'

'এই ধরুন আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা।'

'তা সত্ত্বেও ম্যানেজার অশোক সাহা লক্ষ্মীকান্তপুর লোক্যালে করে কলকাতা এল কেন?'

মনুজেন্দ্র ভুরু কুঁচকে বলল, 'টু কভার আপ দ্য ট্রেইল, আর কী।'

'এক্স্যাক্টলি মনু, আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি অতীব ধুরন্ধর। তিনি জানেন যে তিনটে বড় ট্রলি ব্যাগ নিয়ে কলকাতায় আসতে গেলে গাড়ি ভাড়া করে আসতে হবে। সেই গাড়িকে ট্র্যাক করা পুলিশের পক্ষে বাঁয়া হাতকা খেল। ফলে এসেছেন ট্রেনে। মিশে গেছেন ভিড়ে, যাতে ট্রেস করা কঠিন হয়। একটি পারফেক্ট ক্রিমিনাল মাইন্ড। এবং এই যে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ চত্বরে এত সাইবার জালিয়াতি চলছে তার পেছনে ইনিই মাস্টারমাইন্ড হলে আশ্চর্য হব না।'

'বলছেন কী স্যার?' চমকে উঠল মনুজেন্দ্র।

'এ আমার ইন্টুইশন বলছে মনু। এবং আমার ইনটুইশন খুব সাঙ্ঘাতিক, ঝট করে ভুল হতে দেখিনি। আরও বলছি শোনো, আমার ধারণা এই লোকটার ওই সল্টলেক সেক্টর ফাইভ চত্বরে এমন কোনও একটা অ্যাক্সেস আছে যার থ্রু দিয়ে লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস জোগাড় করা যায়। সেইটে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

'অ্যাক্সেস বলতে?'

'ধরো কোনও ব্যাঙ্কিং অ্যাডভাইসর। কোনও ফিনানশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম। বা এমন কোনও ব্যাঙ্কের চাকুরে যার কাছে প্রতিনিয়ত প্রচুর লোকের ব্যাঙ্কিং ডিটেইলস জমা পড়ে।'

'তাহলে এই ক্ষেত্রে তো মিস রূপা সামন্ত অ্যান্ড কোং এর অপরাধী হওয়ার চান্সই সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে।'

'কেন? রূপার অফিস এখানে বলে? ওর বর সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট বলে? আর মোবাইলে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়া? সেগুলো কী করে করছে ও?'

'সেটা আমার মাথাতেও নেই স্যার।'

এর মধ্যেই অফিসের পিয়ন এসে মনুজেন্দ্রকে বলল, 'আমারে ডাকতেছিলেন ছ্যার?'

মনুজেন্দ্র ছদ্মবিনয়ের সঙ্গে সিট থেকে উঠে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহাপ্রভু। আমার কয়েকটা রিপোর্টের প্রিন্ট আউট দরকার ছিল। অফিসের প্রিন্টার তো ইন দ্য ভোগ অফ মা। আপনি কী দয়া করে বাইরের ওই মা তারা জেরক্স সেন্টার থেকে দশ পাতা প্রিন্টআউট এনে দিতে পারবেন?'

পিয়ন একগাল হেসে বলল, 'পারবুনি ক্যান? তবে ডেরি হবেক।'

'কেন প্রভু? ডেরি হবেক কেন?'

'এডিজি ছায়েব একগাদা কাগজ দিছেন, জেরস করতি হবে। ব্যাঙ্কের লোক এসে বসি আছে। ছায়েব হুম লুন নেবেন কী না।'

'চাকলাদার সায়েব আবার একটা ফ্ল্যাট কিনছেন? বাহ। তাহলে বড় সাহেবের হুম লুনের কাগজ জেরক্স হয়ে গেলে দয়া করে আমার কাজটা করে দেবেন স্যার, ওকে?'

একপাটি দাঁত দেখিয়ে পিয়ন সাহেব অন্তর্হিত হলেন।

মনুজেন্দ্র প্রফেসর মুখার্জির দিকে ঘুরে বলল, 'কী বলছিলেন স্যার?'

'বলছিলাম শুধু শুধু রূপা সামন্তকে আলাদা করে সন্দেহ করে লাভ নেই। একটু মাথা খাটালেই বুঝবে এই অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস হাতাবার সুযোগ সবার কাছেই ছিল। এখন কে ভিক্টিমদের মোবাইলে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এবং কীভাবে সেইটে বার করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। নইলে সবই যে উটের পাকস্থলী হয়ে যাবে যে ভায়া!'

মনু গোঁজ হয়ে বসে রইল। বোঝা গেল কথাটা তার মনঃপূত হয়নি।

প্রফেসর মুখার্জি সামান্য হেসে মনুজেন্দ্রর পিঠে চাপড় মেরে বললেন, 'চিয়ার আপ মাই বয়। মুখখানা অমন তুম্বো করে বসে থাকার কিছু হয়নি। চলো কাজে নামা যাক। এখন বাজে বেলা এগারোটা। এখন এখান থেকে রওনা দিলে বারোটার আগে গড়িয়া বা সোনারপুর পৌঁছতে পারব না মনু?'

'আরামসে। কিন্তু কার সঙ্গে দেখা করবেন? কিংশুকবাবু তো অফিসে। আর ওঁর মা বাবা বোধহয় বাড়িতে নেই, কোথায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছেন।'

'তার মানে অলরেডি সম্ভাব্য অপরাধীদের ওপর ওয়াচ রাখা শুরু করে দিয়েছ। এক্সেলেন্ট জব মনু, ব্রিলিয়ান্ট। না না, আমি অন্য কাজে যাব। হরি হে, দীনবন্ধু, পার করো বাবা।'

* * *

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের প্রিন্সিপাল মোহন গড়াই প্রফেসর মুখার্জির পূর্ব পরিচিত। দেখা হতেই দুজনকে সমাদর করে বসালেন। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর গড়াইবাবু জিগ্যেস করলেন, 'বলুন প্রফেসর মুখার্জি। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

'আপনাদের এখানকার দুটি ছাত্রের ঠিকুজী কুলুজী চাই স্যার। নাম কিংশুক রাহা আর পলাশ রাহা। দুজনেই কমার্স স্ট্রিমের স্টুডেন্ট। দাদাটি অর্থাৎ কিংশুক দিল্লি থেকে বি কম, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করে বিদেশ যায়। তারপর আর দেশে ফিরে আসেনি।'

মোহন গড়াই মোবাইল ফোনটা বার করে বোতাম টিপতে গিয়ে বললেন, 'যাহ্।'

'কী হল?'

'চার্জ শেষ। ওদিকে চার্জারটাও বাড়িতে ফেলে এসেছি। দুলাল, দুলাল। এই কে আছিস, দুলালকে একবার আসতে বল তো।'

অফিস থেকে একটু পরেই একটা সিড়িঙ্গে দেখতে লোক দৌড়ে এল, 'ডাকছিলেন স্যার?'

'হ্যাঁ, তোমার ওই পাওয়ার ব্যাঙ্ক কী একটা ব্যাঙের মাথা আছে, ওটা একটু দিয়ে যাও তো। ফোনে একদম চার্জ নেই। আর শোনো, এঁদের মাখনবাবুর কাছে নিয়ে যাও।' বলে মোহন গড়াই দুজনের দিকে ফিরলেন, 'মাখনবাবু হচ্ছেন এই কলেজের জীবন্ত এনসাইকোপিডিয়া। বাইশ বছর বয়সে এই কলেজে জয়েন করেন ক্লার্ক হিসেবে। এখন এক্সটেনশনে আছেন অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে। ষাট বছর বয়স। আর মেমোরি একেবারে কম্পিউটারের মতো। কর্মজীবনের আটত্রিশ বছর ধরে যত স্টুডেন্ট দেখেছেন, সবার কথা মনে আছে। উনি হেল্প করতে পারবেন।'

* * *

মাখনবাবুকে দেখলে পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমার হেডস্যারদের কথা মনে পড়ে যায়। কাল আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং। এক মাথা ধবধবে সাদা চুল, আর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। মানুষটি দুজনকে সমাদর করে বসালেন। তারপর দুজনের নাম শুনে খানিক ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিংশুক রাহা, কমার্স? ২০১১-র ব্যাচ?'

প্রফেসর মুখার্জি দু-হাত জোড় করে বললেন, 'ধন্য আপনার স্মৃতিশক্তি।

ওরকমই হওয়ার কথা। একটু দেখে বলবেন প্লিস?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক টুক টুক করে কম্পিউটারের সামনে বসলেন। মন দিয়ে এক-একটা কি প্রেস করে বেশ কিছু ডকুমেন্ট খুললেন। মনুজেন্দ্র ফিসফিস করে বলল, 'আরিব্বাস! ভদ্রলোক এই বয়সেও কম্পিউটার চালালেন?'

প্রফেসর মুখার্জি নিচু স্বরে বললেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়েসটা কোনও বাধা নয় মনু। ইচ্ছেটাই আসল।'

একটু পরে স্ক্রিনে দুই ভাইয়ের অ্যাডমিশন ডিটেলস ফুটে উঠল। প্রফেসর মুখার্জি নোট করে নিলেন। কিংশুক রাহা, ডেট অফ বার্থ ১৬-০৮-১৯৯০, ডেট অফ অ্যাডমিশন ০১-০৫-২০০৮। পলাশ রাহা, ডেট অফ বার্থ ০৯-০৯-১৯৯৪, ডেট অফ অ্যাডমিশন ১০-০৫-২০১২। মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'দুজনের ছবি মোবাইলে সেভ করে নাও তো মনু।'

মাখনবাবু বললেন, 'আর ওদের মায়ের ডিটেলস নেবেন না?'

'মা?' অবাক হয়ে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এখানে মা এলেন কথা থেকে?'

'রমলা। রমলা রক্ষিত, এদের মা, সে-ও তো এই কলেজের ছাত্রী ছিল।'

'বলেন কী?' চমৎকৃত হলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এটা তো জানতাম না।'

'দাঁড়ান, রমলার ডিটেলসও বার করছি।'

এবার আর কম্পিউটার নয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা হাঁক দিলেন, 'দুলাল, ১৯৭০-এর রেজিস্টারটা একবার নিয়ে আয় তো।'

একটু পর দুলালবাবু এসে একটা মোটা রেজিস্টার খাতা দিয়ে গেলেন। একটা ডাস্টার দিয়ে তার ধুলো ঝেড়ে ধীরে ধীরে পাতাগুলো ওলটাতে লাগলেন। একটু পর একটা পাতায় এসে থামলেন। 'এই নিন।'

প্রফেসর মুখার্জি আর মনুজেন্দ্র ঝুঁকে পড়লেন পাতাটার ওপর। একটি বেণী ঝোলানো মেয়ের ছবি। পাশে ডিটেলস লেখা, ডেট অফ বার্থ ১৫-০২-১৯৬৯, ডেট অফ অ্যাডমিশন ০২-০১-১৯৮৬। মনুজেন্দ্র ঝটপট ছবি তুলে নিল পাতাটার।

মাখনবাবু বেশ স্নেহের সুরে বললেন, 'ভারি চমৎকার মেয়ে। খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। একবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গেয়েছিল, "ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—"। আহা, এখনও কানে লেগে আছে। আমাকে ভারি ভক্তি-শ্রদ্ধা করত মেয়েটা। কলেজ শেষ করেই বিয়ে করে ফেলে। ওর বিয়েতেও খেয়ে এসেছিলাম তো। দিনটা এখনও মনে আছে। ১৯৮৯-এর শেষ দিন, ৩১ ডিসেম্বর।'

প্রফেসর মুখার্জি খাতাটা হাতে তুলে নিলেন। তিনিও ওই ব্যাচের স্টুডেন্ট। মমতার সঙ্গে ফোটোগুলো ওলটাতে লাগলেন।

ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় এসে চমকে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। সেটা মাখনবাবু আর মনুজেন্দ্র দুজনেই লক্ষ করলেন। মাখনবাবু নামটা দেখে বললেন, হ্যাঁ, এও আমাদেরই স্টুডেন্ট, ওই ব্যাচেরই। আজকাল খুব বড় বিজনেসম্যান হয়েছে শুনেছি। পরের বছর কলেজের কোনও ফাংশানে ডাকব ভাবছি।'

প্রফেসর মুখার্জির হাতে ধরা পাতার ওপর বড় বড় করে লেখা অয়ন রায়চৌধুরী।

* * *

পরের দিন দুপুর নাগাদ মনুজেন্দ্র কল করল প্রফেসর মুখার্জিকে, 'স্যার, বাড়িতে আছেন নাকি?'

প্রফেসর মুখার্জি বাড়িতেই ছিলেন। এখন সেমিস্টার ব্রেক চলছে, বাড়িতে বসে স্টুডেন্টদের খাতা চেক করছিলেন। বললেন, 'আছি ব্রাদার, চলে এসো।'

মনুজেন্দ্র চলে এল, ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর ছোঁয়ার আগেই। এসেই হাঁক দিয়ে বলল, 'বউদি, আমি কিন্তু খেয়ে যাব। সকালে ব্রেকফাস্ট অবধি করার টাইম পাইনি। হেব্বি খিদে পেয়েছে।'

প্রফেসর মুখার্জি খাতার বান্ডিল সরিয়ে বললেন, 'সে কি হে, সকাল থেকে নেমে পড়েছ দেখছি। তা লাঙল চালিয়ে পেলে কিছু?'

'জব্বর খবর আছে স্যার, বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু অবজারভেশন আছে।'

'বলে যাও।'

'পলাশ রাহা আর মোহন ঝুনঝুনওয়ালার কল রেকর্ডস একেবারে নিষ্পাপ, গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসি পাতা। তবে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে অয়ন রায়চৌধুরীর কল রেকর্ডস। ভাগ্যিস আপনি বলেছিলেন।'

'কী জানলে? অয়ন রায়চৌধুরীর সঙ্গে রূপা সামন্তর আফেয়ার আছে?'

'দেখুন, আফেয়ার কিনা বলতে পারব না। তবে ভদ্রলোক প্রায়ই রাতের বেলা রূপা সামন্তকে কল করতেন। রূপা ম্যাডামও কল করতেন অয়নবাবুকে। এবং তাও যখন অয়নবাবু ট্যুরে বাড়ির বাইরে থাকতেন।'

'বটে? হুম। আন্দাজ একটা করেছিলাম। আর কিছু?'

'আর একজনকেও রেগুলার কল করতেন অয়নবাবু। রমলা রাহা, ওরফে রমলা রক্ষিত।'

'হুম। এটা কালই আন্দাজ করেছিলাম। নইলে পলাশ রাহা অত টাকা মাইনের চাকরি পেত না। ভেবেছিলাম এমনিই হয়তো বন্ধুকৃত্য করেছেন। ওল্ড ফ্লেমের কেস বলছ?'

'হান্ড্রেড পারসেন্ট। ওই ব্যাচের একজনকে ফেসবুকে খুঁজে পেয়েছি। ভদ্রলোক এখন নবান্নতে বসেন। ভূমি-রাজস্ব দপ্তরে কাজ করেন। তিনি কনফার্ম করলেন, ইয়েস, রমলা রক্ষিত আর অয়ন রায়চৌধুরীর মধ্যে ঘোর প্রেম ছিল। কলেজে দুজনে কাপল হিসেবে বেশ ফেমাস ছিলেন। তারপর কলেজ থেকে পাশ করার পরেই তড়িঘড়ি করে রমলা দেবীর বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। আর সেই দুঃখে অয়নবাবুও নাকি কোথায় হাওয়া হয়ে গেছিলেন, বেশ কয়েক বছরের জন্য।'

'আরিব্বাস! কামাল করে দিয়েছ তো মানু। যদিও রমলা দেবীর তড়িঘড়ি

করে বিয়ে দেওয়ার কারণটা আমি জানি।'

'অ্যাঁ? আপনি জানলেন কী করে?'

'চোখ-কান খোলা থাকলে তুমিও জানতে পারতে। আর অয়নবাবু খুব সম্ভবত দুঃখ নয়, ভয়ে হাওয়া হয়ে ছিলেন। সে যাই হোক, বলে যাও।'

'পলাশ রাহা খুব শান্ত টাইপের লোক। স্কুলে পড়ায় ভালো ছেলে হিসেবে সুনাম আছে। কিন্তু দাদা কিংশুক রাহা যেমন ইনটেলিজেন্ট, তেমনই ডানপিটে ছিলেন। তিনি এম. কম করতে দিল্লি যান। তারপর তাঁর আর কোনও খোঁজখবর নেই।'

'কোনও খবর নেই আবার কী?' যেন ধমকেই উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কিংশুক রাহা দিল্লি থেকে বিদেশ যাত্রার পুরো ঘটনাটাই আমরা জানি।'

'এখানেও একটা কেস আছে। আমি কিংশুক রাহার এম. কম পড়ার সময়ের এক ফ্রেন্ডের খোঁজ পেয়েছি। ভদ্রমহিলা কলকাতার মেয়ে, দিল্লি গিয়েছিলেন এম. কম করতে। সেইখানেই কিংশুকের সঙ্গে আলাপ। তিনি বলছেন এম. কম করার পরেই কিংশুক রাহা নাকি একদম হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যান। অনেক করেও তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'আই সি। তাহলে বলছ পলাশ রাহা তাঁর দাদার ব্যাপারে মিথ্যে বলছেন?'

'নাও হতে পারে। হয়তো এই মহিলা ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর তার বন্ধুর তেমন খোঁজখবর রাখেননি।'

'করেক্ট। তাও হতে পারে।'

'কী নাম এই ম্যাডামের?'

'শালিনী ঝুনঝুনওয়ালা।'

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন মনুজেন্দ্রর দিকে। তারপর বললেন, 'বটে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এনাকে চিনলে কী করে?'

'ইনি পার্ট টাইম সমাজসেবা, আর পার্ট টাইম চাকরি করেন, লাস্ট চাকরি কলকাতায় করেন। তারপর দিল্লি চলে যান। এখন একটা এনজিওতে আছেন।'

'ইউ আর ইয়েট টু আনসার মাই কোশ্চেন মনু। এনাকে চিনলে কী করে?'

'ফেসবুক থেকে। কিংশুক রাহার কলেজ, ইয়ার এসব দিয়ে সার্চ দিই। সেই লিস্টেই এনাকে পাই। এনাকে দেখলাম মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালা আর পলাশ রাহা, দুজনেই ফ্রেন্ড লিস্টে আছেন। তারপর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম। তারপর আলাপ পরিচয় করে...'

'বুঝেছি, এমনিতেই সুন্দরী মহিলারা তোমার প্রতি একটু দ্রুতই দুর্বল হয়ে পড়েন।'

কথাটা গায়ে মাখল না মনুজেন্দ্র। বলল, 'কথাটা সেটা নয় স্যার। কথাটা হচ্ছে যে...'

'এই শালিনী ঝুনঝুনওয়ালা হচ্ছেন মোহন ঝুনঝুনওয়ালার মেয়ে। তাই তো?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই না...'

'ইনি পলাশ রাহার আগে অয়ন রায়চৌধুরীর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতেন। এটাই বলতে চাইছ তো মনু?'

মনুজেন্দ্র নিচু হয়ে প্রফেসর মুখার্জির পা দুটো খুঁজতে লাগল। মুখার্জিসাহেব হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'আহা করো কী। এখনই স্নান করে এসেছি। ধুলো টুলো কিছু পাবে না বাপু। আপাতত গাত্রোত্থান করো। একবার অয়ন রায়চৌধুরীর অফিসে যাও। কী কী জিগ্যেস করতে হবে বলে দিচ্ছি। তার উত্তরগুলো আমাকে ফোনে জানাবে। তারপর আমি যা বলব ঠিক সেটাই করবে।'

'আর আপনি?'

'আমাকে রূপা সামন্তর অফিসে নামিয়ে দাও। সাইবার মিত্তিরকে বলো ওখানে পত্রপাঠ চলে আসতে।'

'কিন্তু ওয়ারেন্ট ছাড়া তো কত্তা গিন্নীকে গ্রেফতার করতে পারব না স্যার। তার জন্য তো টাইম লাগবে।'

'সে আমার ওপর ছেড়ে দাও। লেটস মুভ কুইকলি।'

মনুজেন্দ্র তার স্যারের এই লক্ষণ ভালমতো চেনে। সাগ্রহে বলল, 'কোনও লিড পেলেন নাকি এক্ষুনি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু একটা ব্যাপার এখন ক্লিয়ার হচ্ছে না।'

'কী স্যার?'

'সেটা এখনই বলছি না। আরেকটু ভাবতে দাও।'

গাড়ি এল উল্টোডাঙার মোড়ে। এখন দুপুর বলে জ্যামজট একটু কম। নইলে সর্বক্ষণ গাড়ির হর্ন, চেল্লামেল্লি এসবে জায়গা নরক গুলজার হয়ে থাকে। তার ওপর যুক্ত হয়েছে ট্রাফিকের রবীন্দ্রসঙ্গীত। এখন যেমন বাজছিল 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়'। প্রফেসর মুখার্জি গানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছেন। গানের স্থায়ী চলছে এখন।

ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
আমার আপনহারা প্রাণ আমার বাঁধন-ছেড়া প্রাণ॥

এবার অন্তরা।

তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান॥

গানটা গুনগুন করে গাইতে গাইতে হঠাৎ একেবারে স্থির হয়ে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। অস্ফুটে বললেন, 'তাইতো, তাইতো। কী মূর্খ আমি। কাল মাখনবাবু

বললেন...' বলতে বলতে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কেস সলভ হয়ে গেছে মনু। তুমি আমাকে নামিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অয়নবাবুর অফিসে যাও। কুইক।'

* * *

'তাহলে বলছেন এভাবেও সম্ভব?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্ভব। এবং আমি নিশ্চিত এইভাবেই হয়েছে। নইলে ভাবুন না, যে ফোন বাইরে থেকে কোনও মতেই অ্যাক্সেস করা সম্ভব নয়, সেখানে ম্যালওয়্যার ইন্সটল করা হল কীভাবে?'

'আর অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস?'

'সেটা বলতে পারব না স্যার। তবে যেভাবে অপরাধী পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে, তাতে বোঝা যায় যে অতি ঘোড়েল লোক। কীভাবে এইসব তথ্য হাতাচ্ছে কে জানে।'

'হুম। বুঝলাম মিত্তির মশাই। এখন পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো ক্লিয়ার। শুধু একটা ইনফরমেশনের জন্য ওয়েট করে আছি। সেটা কনফার্মড হলেই...'

বলতে বলতেই প্রফেসর মুখার্জির মোবাইল ফোন রিং হল। উনি ফোন তুলেই বললেন, 'অয়ন রায়চৌধুরীকে জিগ্যেস করো উনি কখনও অফিসের কারও চার্জার বা পাওয়ার ব্যাঙ্ক নিয়ে ওঁর ওই ব্যাঙ্কিং এর জন্য আলাদা করে রাখা মোবাইলে চার্জ দিয়েছিলেন কি না।'

ওপার থেকে মনু কিছু বলল। সেটা শুনে প্রফেসর মুখার্জির মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। বললেন, 'অয়নবাবুকে বলো ওই পাওয়ার ব্যাঙ্কটা আবার নিতে। তারপর ওটা নিয়ে স্ট্রেইট রূপা ম্যাডামের অফিসে চলে এসো। ওটা মিত্তির মশাইকে দিতে হবে। আরে, হ্যাঁ রে বাবা, যা ভাবছ তাই। পেপার ওয়ার্কস কী কী লাগে দেখে নিও। কী বললে? অয়নবাবু পাওয়ারব্যাঙ্কটা ফেরত দেওয়ার সময় কী বলবেন? বলো যে ভুল করে তুমি নিয়ে চলে এসেছ। ইয়েস, দ্যাটস ইট। আর তোমার যে টিম কাদের কাদের নাকি স্যাডো করছে, সেই টিমকে অ্যালার্ট থাকতে বলো।'

* * *

অয়ন রায়চৌধুরীর অফিসের গেটের ঠিক উল্টোদিকে একটা ঠেলার সামনে দাঁড়িয়ে গোগ্রাসে ব্রেড অমলেট খাচ্ছিলেন প্রফেসর মুখার্জি, ডাবল এগ উইথ এক্সট্রা কাঁচালঙ্কা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত সিগারেট টানছিল মনুজেন্দ্র। মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে চাপা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সে।

খাবার শেষ করে ঝালের চোটে উহ আহ করতে করতে এদিকে ফিরলেন

প্রফেসর মুখার্জি। তারপর রুমাল বার করে চোখের জল মুছে বললেন, 'দোকানটা কখন খুলবে খোঁজ পেলে মনু?'

ঘড়ি দেখল মনু। বলল, 'আশেপাশের দোকানদারেরা তো বলছে এতক্ষণে খুলে যাওয়ার কথা। কেন খুলছে না বুঝতে পারছি না। তা যতক্ষণ না খোলে ততক্ষণ কি আপনি ব্রেড অমলেট খেয়ে যাবেন?'

ঘড়ি দেখলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'শুধু ব্রেড অমলেট কেন, ঘুগনিও খেতে পারি। কিন্তু দোকানটা খুলছে না কেন? একবার খবর নাও তো মনু, দেখো তো পলাশ রাহা অফিসে এসেছেন কি না।'

ফোন তুলে পলাশকে কল করল মনুজেন্দ্র। প্রথম দুবার কেউ তুলল না। তৃতীয়বার দেখা গেল ফোন স্যুইচড অফ।

লাফিয়ে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এক্ষুনি সোনারপুর থানাকে অ্যালার্ট করো মনু। ফোর্স নিয়ে যেন পলাশ রাহার বাড়িতে যায় আর ওকে ইনক্লুডিং ওর মা-বাবাকে বসিয়ে রাখে। আর তোমার টিমকে বলে দাও উইকেন্ডে পলাশবাবুর যে মাসতুতো ভাই দেখা করতে আসেন, তাকে যে করে হোক আটক করতে।'

'সে কী? কেন?'

'তার কারণ উনিই মিস্টার অশোক সাহা। ওরফে কিংশুক রাহা। এই ক্রাইমের মাস্টারমাইন্ড।'

* * *

আড্ডাটা জমেছিল চায়না টাউনে, বিগ বস রেস্তোরাঁর টপ ফ্লোরে। মনোজ চাকলাদারের সৌজন্যে একটি নিরিবিলি কোণ পাওয়া গেছে। সেখানেই বসেছিলেন সবাই। সবাই বলতে মনুজেন্দ্র, প্রফেসর মুখার্জি, অয়ন রায়চৌধুরী, রূপা সামন্ত, সৌরভ মিত্র এবং এডিজি সাহেব স্বয়ং। পার্টি থ্রো করেছেন রায়চৌধুরী সাহেব।

অয়ন রায়চৌধুরী একটা জ্যুসের গ্লাস হাতে তুলে বললেন, 'মাই সিনসিয়ার থ্যাঙ্কস টু পোলিস ডিপার্টমেন্ট। ওঁরা এত তাড়াতাড়ি অপরাধীকে আইডেন্টিফাই না করতে পারলে টাকাটার কোনও হদিশই পাওয়া যেত না।'

'অপরাধী কেন, অপরাধীরা বলুন।'

চুকচুক করলেন অয়ন রায়চৌধুরী, 'দুই ছেলে আর বাবা-মা মিলে যে এত বড় একটা র‍্যাকেট খুলে বসবে, তাও আমারই অফিসের নীচে, বুঝতেই পারিনি। আর পলাশকে তো পছন্দই করতাম। কী করে যে এই মতিভ্রম হল ওর।'

'আসলে লোভ সামলাতে পারেনি।' মুখ খুলল মনুজেন্দ্র, 'মেইন সেন্টার হচ্ছে ওই মনসপর্ণা নামের জেরক্স কাম মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ এর দোকানটাই। ওখান থেকে ছোট ছেলে আর বাপ মিলে জাল ছড়াত, আর জাল টেনে মাছ তুলত বড় ছেলে।'

'দোকানটার মালিক কে?' প্রশ্ন করলেন সৌরভ মিত্র।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অয়ন রায়চৌধুরী, 'আমিই, মানে চৌধুরী এন্টারপ্রাইজই। কাজে লাগছে না দেখে ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। পরে শুনি পলাশই দোকানটা বাবার নামে ভাড়া নিয়েছে। শুনে খুশিই হয়েছিলাম।'

সবে স্টার্টার এসেছে। তারই একটা টুকরো মুখে পুরে এডিজি মনোজ চাকলাদার বললেন, 'এবার বলুন মামাবাবু, কী করে এই গ্যাংটাকে আইডেন্টিফাই করলেন।'

এতক্ষণ উর্ধ্বনেত্র হয়ে বসেছিলেন প্রফেসর মুখার্জি। হাতে একটি বাকার্ডির গ্লাস। এইবার একটু নড়েচড়ে বসে বলা শুরু করলেন।

'প্রথম দিকেই ক্লিয়ার হয়ে গেছিল যে এই কেসটা ঠিক টিপিক্যাল জামতাড়া মার্কা সাইবার জালিয়াতির কেস নয়। প্রথমতো, অয়ন রায়চৌধুরীর ফোনে কী করে ম্যালওয়্যার ইনস্টল হল সেটা বুঝতে পারছিলাম না, কারণ তাঁর কাছে না কোনও ফোন, না কোনও সাসপিশাস লিঙ্ক এসেছিল। দ্বিতীয়ত, ঠিক এইভাবে রিসেন্টলি ওই সেক্টর ফাইভ চত্বরেই অনেক লোকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়েছে। জামতাড়া গ্যাং সচরাচর এমন এলাকাভিত্তিক অপারেশন চালায় না।

ফলে আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল দুটো। এক, কী করে এই ম্যালওয়্যারটি অয়নবাবুর মোবাইলে এল। দুই কী করে অয়নবাবুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস অপরাধীদের হাতে গেল।

এইসব কেসে পুলিশ সচরাচর ব্যাঙ্কিং ট্রেইল দেখে। মানে টাকাটা কোথায় গেছে, কার অ্যাকাউন্ট থেকে কার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে ইত্যাদি। অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট ট্র্যানজাকশন হলে সেসব অ্যাকাউন্টের মালিকদের হদিশ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না ক্যাশ নিয়ে কেউ উধাও হলে। তাই চট করে কোনও অ্যাকাউন্টে অত টাকার নগদ ট্র্যানজাকশন সব ব্যাঙ্কই সন্দেহের চোখে দেখে। টাকা জমা করতে হলে প্যান কার্ড লাগে। আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও চেনাজানা কাস্টমার ছাড়া কোনও বেগানা লোককে এত টাকা জমা দিতে বা তুলতে দেবেন না। সেটাই সবচাইতে কার্যকরী উপায় অপরাধীদের পাকড়াও করার।

কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল সর্ষের মধ্যেই ভূত! ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নিজেই আসল অপরাধী। তাঁরই ব্যাঙ্কে জালিয়াতির টাকা জমা পড়েছে। তিনি সেইটে নিয়ে উধাও। উধাও হয়েছেন এমনভাবে যে তাঁর টিকিটিরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এক্ষেত্রে অপরাধের সোর্সে ফেরাই সাব্যস্ত হল। অর্থাৎ মোডাস অপারেন্ডিটা আগে খুঁজে বার করা।

আমরা প্রথমেই আমাদের সন্দেহের বৃত্তে চারজনকে নিলাম, যাঁদের কাছে অয়ন রায়চৌধুরীর ব্যাঙ্কের ডিটেইলস থাকা সম্ভব। তাঁদের মধ্যে আমাদের মনে হল, অপরাধী হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ম্যাডাম রূপা সামন্তর।'

'এরকম মনে হওয়ার কারণ?' ছদ্মকোপে জিগ্যেস করলেন রূপা।

'কারণ প্রথমতো আপনি একজন ফিনানশিয়াল অ্যাডভাইসর, আপনার সব ক্লায়েন্টদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস আপনার কাছে থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত,

আপনার অফিস সল্টলেকে, সেক্টর ফাইভ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আর আমরা জানি যে অপরাধী বা অপরাধীচক্র সেক্টর ফাইভে চাকরি করে বা তার আশেপাশের বাসিন্দাদেরই টার্গেট করেছে। আর তৃতীয়ত, আপনার নামে একবার পুলিশ কেস হয়েছিল।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন রূপা, 'আরে মশাই চুরি চামারির কেসে পুলিশ কেস ফাইল হয়নি। লাস্ট কোম্পানিতে আমি নোটিস পিরিয়ড সার্ভ না করে জাস্ট হাওয়া হয়ে গেছিলাম। তাই কোম্পানি অ্যাবস্কন্ডিং বলে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। পরে অবশ্য সেসব মিটে যায়।'

'হ্যাঁ, সেটা আমরা পরে জেনেছি। যাই হোক, মোটামুটি আপনি আর মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালা ছিলেন আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট। পলাশবাবুও ছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল তাঁর কাছে আপনাদের মতো এই জালিয়াতিটা করার অত আধুনিক উপায় ছিল না।

তদন্ত করতে নেমে আমরা বেশ কিছু তথ্য পাই যাতে আমার মনে হয় শুধু টাকা চুরি নয়, এর পেছনে অন্য একটা মোটিভও থাকতে পারে।

আমরা পলাশ এবং কিংশুকের ব্যাপারে খোঁজ করতে গিয়ে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুস কলেজে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দুটো আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করি। এক, পলাশ, কিংশুকের মা, রমলা রক্ষিতও ওই কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন। আর একই ব্যাচে অয়নবাবুও ছিলেন। আমরা আরও খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে রমলা দেবী এবং অয়নবাবুর মধ্যে গভীর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন অয়ন রায়চৌধুরী, 'ওয়েল প্রফেসর। আমার অতীতের ঘটনার সঙ্গে এই বর্তমান কেসের কোনও সংযোগ নেই আশাকরি। আমি এই নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহী নই।'

প্রফেসর মুখার্জি অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন, 'আছে রায়চৌধুরীমশাই, খুব গভীর সম্পর্ক আছে। বলে যাচ্ছি, শুনুন। ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন। কেমন?

আমরা অয়ন-রমলার ব্যাচের এক ভদ্রলোকের খোঁজ পাই, যিনি আমাদের জানান যে কলেজ পাশ করার পরপরই রমলার বিয়ে হয়ে যায়। অয়ন রায়চৌধুরী মনের দুঃখে উধাও হয়ে যান। কিন্তু আমি কাল দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে গিয়ে এমন কিছু সূত্র পাই যাতে মনে হয় যে কেসটা তা নয়।

রেজিস্টার থেকে জানতে পারি, কিংশুক রাহার ডেট অফ বার্থ হল, ১৬ আগস্ট ১৯৯০। ওদিকে কথায় কথায় ওখানকার অফিসের এক পুরোনো কর্মচারী মাখনবাবু জানান যে তিনি রমলার বিয়ে অ্যাটেন্ড করেন। সেটা ছিল ১৯৮৯-এর শেষ দিন, ৩১ ডিসেম্বর। অর্থাৎ রমলার যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি অলরেডি দেড় বা দু-মাসের প্রেগন্যান্ট।'

চারিদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা। অয়ন রায়চৌধুরী দু-হাতে মাথা নিচু করে কপালের রগ টিপে বসে আছেন।

প্রফেসর মুখার্জি জিগ্যেস করলেন, 'বিয়েতে আপত্তিটা কার ছিল? আপনার বাবার?'

ধীরে ধীরে ওপর-নীচে দুবার মাথা নাড়লেন অয়ন রায়চৌধুরী।

'কারণ কী? রমলারা খ্রিস্টান ছিল বলে?'

'বাবাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না।' ক্ষীণ স্বরে বললেন অয়নবাবু।

মনুজেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু রমলা দেবী যে খ্রিস্টান, সেটা আপনি জানলেন কী করে?'

মনোজ চাকলাদার বলে উঠলেন, 'ওঃ, মনু, চোখ-কান একটু খোলা রাখতে হবে তো। শুনলে না, রমলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল ডিসেম্বরের লাস্ট দিনে। ওটা বাংলার পৌষ মাস। পৌষ মাসে হিন্দু শাস্ত্রমতে বিয়ে নিষিদ্ধ।'

প্রফেসর মুখার্জি ফিরে এলেন তাঁর কথায়, 'রমলার বিয়ে হয়ে গেল। ভয়ে হোক বা বিরহে, অয়ন রায়চৌধুরী উধাও হয়ে গেলেন। কলকাতার বাইরে চাকরি নিলেন। আবার তিনি পাবলিক ফিগার হিসেবে ফিরে এলেন কয়েক বছর আগে। তখন তিনি বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

রমলা দেবী তাঁর পুরোনো প্রেমিককে ফিরে পেয়ে আবার যোগাযোগ করলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা তখন পড়ে গেছে। তিনি কিংশুকের কথা বলে অয়ন রায়চৌধুরীর কাছে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দাবি করতে লাগলেন। ব্ল্যাকমেল বলাটা হয়তো খুব রুড শোনাবে, তবে এতদিন বাদে এসে যদি জানা যায় যে বিখ্যাত উদ্যোগপতি অয়ন রায়চৌধুরীর একটি অবৈধ পুত্রসন্তান আছে, সেটা একটা সেন্সেশনাল খবর বই কি।

অয়নবাবু যতটা পারলেন রমলা দেবীর দাবি মেনে নিলেন। পলাশ রাহাকে বেশ মোটা টাকায় নিজের সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করলেন। নইলে একজন সাধারণ বি কমের পক্ষে সেক্রেটারি হয়ে অত টাকা স্যালারি পাওয়া প্রায় স্বপ্ন। এছাড়া আরও কিছু সাপোর্ট করতেন কিনা জানি না। তবে খুব সদ্য রাহা ফ্যামিলি গড়িয়ার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে সোনারপুরে নিজেদের বাড়ি করে উঠে গেছিল। এত টাকা ওরা কোথায় পেল সেটা হয়তো সে একমাত্র মিস্টার রায়চৌধুরীই বলতে পারবেন।

এদিকে কিংশুক তখন দিল্লিতে। সেখানে তার সঙ্গে আলাপ হল জনৈক শালিনী ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে। মোহনদাস ঝুনঝুনওয়ালার মেয়ে।

এখানে বলে রাখা ভালো, মোহনদাস আমাদের একবার বলেছিলেন যে তিনি অয়ন রায়চৌধুরীর পার্সোনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর জানেন। কীভাবে জানলেন সেটা উনি বলেননি। আমার ধারণা অয়ন রায়চৌধুরী যেখানে যেখানে সরাসরি টাকা দিতে পারতেন না, বা টাকা নিতে পারতেন না, সেসব কাজকর্ম প্রাণের বন্ধু মোহনদাসের থ্রু দিয়েই হতো।

কিংশুক অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু তার মধ্যে একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিমিন্যাল লুকিয়ে ছিল। ইনটেলিজেন্ট লোক যদি শয়তানি করতে শুরু করে, তাকে ধরা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

শালিনীর মারফত কিংশুক জানতে পারত তার জন্মদাতা পিতা ক্রমেই বড়লোক হয়ে উঠছেন। অথচ সে সেই সম্পত্তির কিছুই পাচ্ছে না। রমলা দেবী কিংশুকের

কথা বলে এবার একটা এককালীন মোটা টাকা দাবি করলেন। এইবার অয়ন রায়চৌধুরী বেঁকে বসলেন। তিনি অত টাকা দিতে সাফ সাফ মানা করে দিলেন। বললেন যে চাকরি দিতে পারেন, কিন্তু এক লপ্তে অত টাকা দিতে পারবেন না।

অয়ন রায়চৌধুরী গম্ভীর গলায় বললেন, 'একবার যদি ব্ল্যাকমেইলারের দাবি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সে আরও পেয়ে বসে। আমি আউট অফ কম্পাশন পলাশকে চাকরি দিয়েছিলাম। প্রফেসর সাহেব যেমন বললেন, তার যোগ্যতার থেকে অতিরিক্ত মাইনে দিয়ে। কিংশুক চাইলে তাকেও দিতাম। কিন্তু ওভাবে ব্ল্যাকমেইল্ড হতে আমার আপত্তি আছে।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'কিংশুক আর রমলা নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে অয়ন সরাসরি টাকা দেবেন না। এদিকে অয়নবাবুকে আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতো ব্ল্যাকমেল করা যায় না। অর্থাৎ ক্ষমতা, প্রতিপত্তি তিনটেতেই তিনি অনেক ওপরে। তিনি মোহন দাস আর শালিনী মারফত কিংশুককে বলে দিলেন যে এর বেশি বাড়াবাড়ি করলে এবার তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

কিংশুক বুঝল ওভাবে হবে না। আমার ধারণা কিংশুক বহুদিন ধরেই জামতাড়া গ্যাং স্টাইলের কোনও ফিনিশিং অপারেশন চালাত। সে একজন সাইবার ক্রাইম এক্সপার্ট বললেই চলে। তাই সে উধাও ছিল বেশ কিছুদিন। শালিনীও তার খোঁজ পায়নি। এই বিদ্যেতে তখন থেকেই তার হাত পাকানো। কারো অ্যাকাউন্ট এম্বেজেল করার পর কী করে মানি ট্রেইল কভার করতে হয় সে নিয়ে সে একেবারে দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

তখন সে নতুন ফাঁদ পাতল। আর তাতে জড়িয়ে পড়ল পুরো রাহা ফ্যামিলি।

কিংশুক রাহা যে প্ল্যান করেছিল তার তুলনা নেই। সেই প্ল্যান মতো অয়ন রায়চৌধুরীর অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশ লাখ হাপিস হয়ে গেল। টাকাটা জমা পড়ল এক কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ব্রাঞ্চে। যেখানে শ্রী কিংশুক আগে থেকেই ম্যানেজার হয়ে বসে আছেন। তিনি প্রতি উইকেন্ডে সোনারপুরের বাড়িতে আসতেন পলাশের মাসতুতো দাদা হিসেবে। সোনারপুরে রাহা ফ্যামিলি নতুন এসেছে। নতুন প্রতিবেশীরা কেউ কিংশুককে ছোটবেলায় দেখেননি। তারা জানালেন যে কিংশুক আমেরিকা গিয়ে মা-বাবাকে ভুলে গেছে।

কিংশুক টাকা তুলে জাস্ট হাওয়া হয়ে গেল। পলাশও নিশ্চয়ই তাকে পালাতে সাহায্য করেছিল। খুব সম্ভবত সে-ই একটা গাড়ি নিয়ে শিয়ালদা স্টেশন গিয়েছিল দাদাকে তুলতে। এদিকে পুলিশ মানি ট্রেইলের কোন হদিশ পেল না। কী করে অপরাধীরা রায়চৌধুরী সাহেবের ব্যাংক আকাউন্টের ডিটেলস পেল জানা যাচ্ছে না। মোবাইলে কোনও সাসপিসিয়াস মেসেজ, ওটিপি, কল কিছু আসেনি। শুধু একটা ম্যালওয়্যারের হদিস পাওয়া গেছে। কিন্তু সেটা কী করে ফোনে এল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। মানে সবমিলিয়ে একটা পারফেক্ট নিখুঁত ক্রাইম।

তদন্ত শেষ পর্যন্ত আটকে যাওয়ার মুখে, এমন সময় মুশকিল আসান শ্রীহরি হয়ে দেখা দিলেন সিআইডি ডিপার্টমেন্টের জনৈক পিয়ন।'

'অ্যাঁ! পিয়ন? আমাদের ডিপার্টমেন্টের?' চাকলাদার সাহেবের হাঁ হওয়া মুখের মধ্যে অনেকটা আধখাওয়া চিকেন উইংস উঁকি দিচ্ছে। মনুজেন্দ্রর অবস্থাও তথৈবচ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ এডিজি সাহেব। আমি কেসটা নিয়ে আলোচনা করতে আপনাদের অফিসে গেছিলাম। তখন আমাদের মনুবাবু পিয়নমশাইকে ডেকে কয়েকটি পাতা প্রিন্টআউট বাইরের কোনও জেরক্স সেন্টার থেকে জেরক্স করে আনতে দেন। কথায় কথায় পিয়নমশাই জানান যে এডিজি সাহেব আর-একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য হোম লোন নিচ্ছেন, আর তার পেপার্সের জন্য ব্যাঙ্কের লোক এসে ওঁর চেম্বারে বসে আছে।'

চাকলাদার বলে উঠলেন, 'রাইট রাইট। পরশু আমার থেকে সব পেপার টেপার নিতে ব্যাঙ্কের লোক এসেছিল বটে।'

'আর সেই কথাটা শুনেই আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। তাই তো, আমরা তো হামেশাই আমাদের কত প্রয়োজনীয় পেপার জেরক্স করতে দিই। তার মধ্যে চেক, ব্যাঙ্কের পাসবই, স্যালারি স্লিপ, আধার কার্ড, প্যান কার্ডের জেরক্স কত কিছুই তো থাকে। যার বদ উদ্দেশ্য আছে, তার পক্ষে সেসব ডিটেইলস হাতসাফাই করা এমনকী কঠিন কাজ!'

সবাই চুপ। সৌরভ মিত্র অস্ফুটে বললেন, 'তাই তো, এটা তো ভাবিনি।'

'তখন আমার নজর যায় ওই বিশেষ জেরক্সের দোকানটির দিকে। রাজারহাট, নিউটাউন সল্টলেক মিলিয়ে শ'খানেক জেরক্সের দোকান আছে আশা করি। কিন্তু সেক্টর ফাইভের মতো জমজমাট অফিস পাড়ায়, অমন প্রমিনেন্ট জায়গায় জেরক্সের দোকান বোধহয় খুব বেশি নেই।

আর এই কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা আপাততুচ্ছ অসঙ্গতি বড় হয়ে দেখা দিল।' বলে তিনি মনুজেন্দ্রর দিকে ফিরলেন, 'মনু, যখন ওই দোকানটায় আমরা যাই, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলে?'

'কী?'

'দোকানের মালিক, ষাট বছরের ভদ্রলোক ডানহাতে ঘড়ি পরেন?'

'তাতে কী? সে তো অনেক পুরুষমানুষই ডানহাতে ঘড়ি পরেন।'

'সে রেশিওটা চার পাঁচ পার্সেন্টের বেশি নয় মনু। আর ব্যাপারটা আরও চোখে লাগে, যখন একটু আগেই আমি দেখে এসেছি যে পলাশবাবুও ডানহাতে রিস্টওয়াচ পরেন।

ব্যাপারটা হয়তো আপনাদের খুব একটা লজিক্যাল শোনাল না। কিন্তু আমার মনে একটা অস্বস্তির চোরকাঁটা বিঁধে রইল।

আর সেই অস্বস্তিটার সম্পূর্ণ কারণ খুঁজে পেলাম যে মুহূর্তে আমার সামনে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের মোহন গড়াই তাঁর মোবাইলটা চার্জ দেওয়ার জন্য তাঁরই এক অ্যাডমিন অফিসারের থেকে একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক চেয়ে নিলেন। আমার চকিতে মনে হল, যদি অনলাইন সম্ভব না হয়, তাহলে কি অফলাইন কোনও পদ্ধতির মাধ্যমে মোবাইলে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব? যেমন চার্জার বা পাওয়ারব্যাঙ্ক? কারণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখে এসেছি যে ওই মনসপর্ণা মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ

কাম জেরক্স সেন্টারে চার্জার পাওয়ারব্যাঙ্ক সবই পাওয়া যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মনুকে বললাম অয়ন রায়চৌধুরীর অফিস গিয়ে জিগ্যেস করতে যে তিনি তাঁর মোবাইলটা অন্য কারও পাওয়ারব্যাঙ্ক বা চার্জার ধার নিয়ে চার্জে বসিয়েছিলেন কি না। উনি জানালেন যে হ্যাঁ, হপ্তাখানেক আগে গাড়িতে করে কোথাও একটা যাওয়ার সময় পলাশের কাছ থেকে একটা পাওয়ারব্যাঙ্ক নিয়েছিলেন বটে চার্জ দেওয়ার জন্য। ওনার নতুন ফোনের ব্যাটারির ব্যাক আপ ভালো নয়। ঘন ঘন চার্জ দিতে হয়। সচরাচর উনি নিজের চার্জারই ইউস করেন। কিন্তু সেদিন গাড়িতে থাকায় চার্জার ইউস করা সম্ভব হয়নি। পলাশের পাওয়ারব্যাঙ্ক নিতে হয়েছিল। ততক্ষণে আমাকে মিত্তির সাহেব জানিয়েছেন যে, এইভাবেও সাইবার জালিয়াতি সম্ভব। আমি তাই মনুকে বললাম ওটা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে।...বাকি অংশটুকু না হয় মিত্তির সাহেবই বলুন।'

হাতে ধরা গ্লাসের তলানিটা এক চুমুকে শেষ করলেন সৌরভ, ওরফে সাইবার মিত্তির। তারপর বলতে শুরু করলেন।

'সাইবার ক্রিমিনালদের এই নয়া কায়দাটার নাম হচ্ছে জ্যুস জ্যাকিং। আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন পাবলিক প্লেসে ইউ এস বি চার্জিং পয়েন্ট থাকে। আজকাল তালেবর সাইবার চোরেরা সেসব ইউ এস বি চার্জিং পয়েন্ট হ্যাক করে রাখে। আপনি হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন আপনার মোবাইলে চার্জ শেষ। এদিকে পাঁচ মিনিট ফেসবুক বা হোয়্যাটসঅ্যাপ না করলে আপনার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। ফলে অমন একটি পাবলিক চার্জিং পয়েন্ট দেখামাত্র আপনি কেবল বাগিয়ে দৌড়ে গেলেন, আর আপনার মোবাইলে আপনার অজান্তেই একটি ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে গেল। এদিকে ওই ফোনেই আবার আপনার সমস্ত ব্যাঙ্কিং অ্যাপ ইনস্টল করা আছে। সাইবার জালিয়াতরা কী করে, ওই ম্যালওয়্যারটির সাহায্যে আপনার ফোনটির সমস্ত অ্যাপ ওদের কোনও একটি ফোনে ক্লোন করে নেয়। তার জন্য একবারই, মাত্র একবারই অরিজিনাল ফোনে আসা একটি ওটিপি ওদের হস্তগত করতে হয়। ব্যস, তারপর যাকে বলে একেবারে ফ্রি রান।

এখানেও, মানে অয়নবাবুর সঙ্গেও এটাই হয়েছে। প্রোগ্রামিং করা পাওয়ারব্যাঙ্ক তুলে দেওয়া হয়েছে ওঁর হাতে। তাতে ম্যালওয়্যার ইনস্টল করা হয়েছে। আর ওঁর ব্যাঙ্কিং ডিটেইলস তো জেরক্স সেন্টারের কল্যাণে ওদের কাছে অ্যাভেলেবল ছিলই। বাকিটা আর না বললেও চলবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অয়ন রায়চৌধুরী, 'আসলে ওই দিন দুপুরে পলাশ একবার আমার রুমে আসে একটা ওটিপির জন্য। আউটরাম ক্লাবে আমার একটা অনলাইন পেমেন্ট করার ছিল তাই। আমিও সরল বিশ্বাসে দিয়ে দিই। এখন বুঝতে পারছি ওটা দিয়েই ওরা আমার ফোনের কন্ট্রোল নেয়।'

'পলাশ একটাই ভুল করে, ওই পাওয়ার ব্যাঙ্কটা নিজের কাছে রেখে দেয়।' প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'এবং বলা বাহুল্য তাতে ওই বিশেষ ম্যালওয়্যারটির ট্রেস পাওয়া গেছে। ওটা ফেলে দিলে হয়তো এত সহজে ধরতে পারতাম না।

তবে এতসবের পরেও আমি দীনবন্ধু আম্ভুজ কলেজের পাওয়া তথ্যগুলোর সঙ্গে এই সাইবার জালিয়াতিটা কনেক্ট করতে পারছিলাম না। আমার চোখ খুলে দিলেন আপামর বাঙালির অগতির গতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ।'

'রবীন্দ্রনাথ?' মনোজ চাকলাদার এই সন্ধেবেলায় দ্বিতীয়বারের জন্য চমকালেন, 'এখানে রবীন্দ্রনাথ এলেন কোথা থেকে?'

'রমলা দেবী দুর্দান্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। কলেজের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গেয়েছিলেন, 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়'। গানটা নিশ্চয়ই রমলা দেবীর খুব প্রিয় গান। হয়তো বা তাঁর মর্মরিয়া ওঠা দুঃখরাতের গান। সেই গানটাই শুনছিলাম উল্টোডাঙার ট্রাফিক সিগনালে। রূপা ম্যাডাম, গানটা একবার গাইবেন নাকি?'

রূপা সামন্ত সলজ্জ মুখে নিচুগলায় ধরলেন,

ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
আমার আপনহারা প্রাণ আমার বাঁধন-ছেড়া প্রাণ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান॥'

গান থামতেই সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'ওই যে লাইনটা লক্ষ্য করুন। অশোকে কিংশুকে।' আমার মনে পড়ে গেল যে পলাতক ম্যানেজার সাহেবের নাম অশোক সাহা। মাথায় বিদ্যুৎচমক মতো নামগুলো গেঁথে গেল, অশোক, কিংশুক, পলাশ। তারপর মিস্তিরবাবু জ্যুস জ্যাকিং ব্যাপারে জানাতেই সব ক'টা ধাঁধা জিগ্‌স পাজলের মতো খাপে খাপে বসে গেল।

'বুঝতে পারি যে পলাশ রাহার সেই ব্রিলিয়ান্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দাদাটিই এই বিদ্যেয় হাত পাকিয়ে ফিরে এসে জয়েন করেছে জয়নগরের এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে, যেখানে অনেক দরিদ্র নিরীহ খাতকের বেওয়ারিশ অ্যাকাউন্ট দখলে রাখাটা কোনও ব্যাপারই না। প্লাস যে ব্যাঙ্কের অপারেশনের পুরোটাই সে কন্ট্রোল করতে পারে। সেখান থেকে মানি ট্রেইল হাপিস করা তার পক্ষে সোজা।

'আর ফ্রন্ট এন্ড হিসেবে, মানে জেরক্স দোকানের আড়ালে অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস জোগাড় করা, আর এলাকার পয়সাওয়ালা কাস্টমারদের ম্যালওয়্যার ইনফেক্টেড পাওয়ার ব্যাঙ্ক সাপ্লাই করার জন্য তো বাবা আর ভাই রইলই। বেশ কয়েকটা সফল অপারেশনের পর যেদিন অয়ন রায়চৌধুরী নতুন মোবাইল কিনলেন, সেদিনই আগে থেকে ছকে রাখা প্ল্যান এক্সিকিউট করা শুরু।'

ততক্ষণে খাবার চলে এসেছিল। সবাই ডিনার প্লেটে মনোনিবেশ করলেন।

প্রফেসর মুখার্জিই শুধু হাত লাগালেন না। হাতের গ্লাসটা নিয়ে নাড়তে চাড়তে লাগলেন, 'একমাত্র রমলা রাহার জন্যই দুঃখ হয়। হয়তো সবটুকু দিয়েই অয়নবাবুকে ভালোবেসেছিলেন ভদ্রমহিলা। বদলে জীবনে কিছুই পেলেন না।'

রূপা সামন্ত প্রশ্ন করলেন, 'একটা কথা বলুন প্রফেসর সাহেব, ওরা পালাতে গেল কেন?'

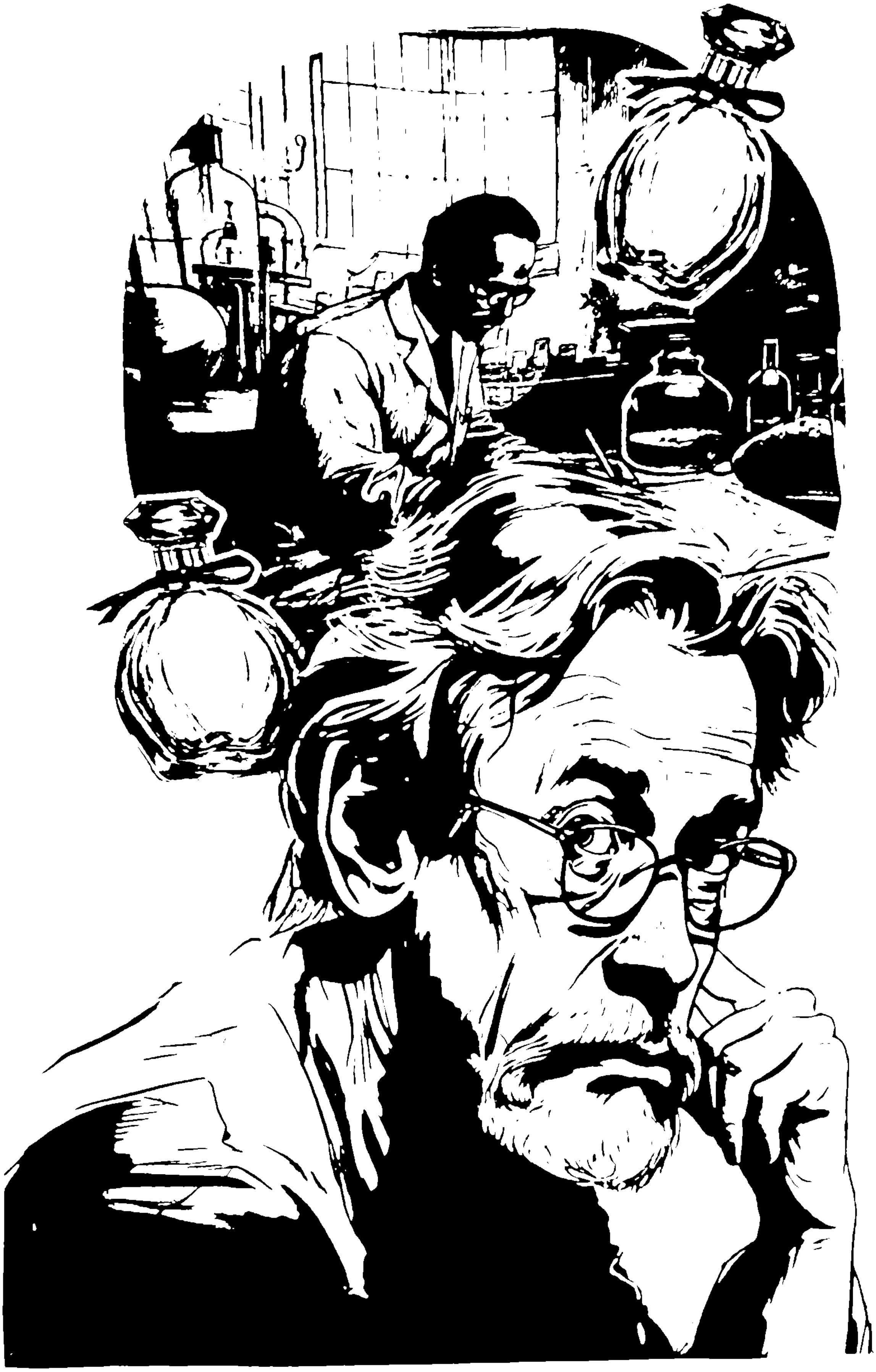
'যেই মুহূর্তে পলাশবাবু শোনেন যে ওই বিশেষ পাওয়ারব্যাঙ্কটি 'ভুল' করে মনুজেন্দ্র নিয়ে চলে এসেছে, সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারেন যে এইবার ফাঁদে পড়েছেন। এর আগের জালিয়াতি করে পাওয়া সব টাকাই জয়নগর কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে জমা পড়ত আর দাদাভাইটি সে টাকা তুলে বাড়িতে দিয়ে যেতেন। পার কেস অ্যামাউন্টও খুব বেশি হতো না।

কিন্তু এটা যে সে লোকের টাকা নয়, নামী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অয়ন রায়চৌধুরীর টাকা। তিনি ছেড়ে কথা বলার লোক নন। কিংশুকবাবু তাঁর তীক্ষ্ণ ক্রিমিনাল মাইন্ড কাজে লাগিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতার গোপন আস্তানায় এসে লুকিয়ে রইলেন। আশায় ছিলেন যে একটু থিতিয়ে গেলে অন্য কোথাও ভেসে উঠবেন। কিন্তু মনু আগে থেকেই একটা শ্যাডো করার ব্যবস্থা করে সে উপায় আর রাখল না।' ছদ্ম আক্ষেপে চুকচুক করেন প্রফেসর মুখার্জি।

'থ্যাঙ্কিউ স্যার।' সলজ্জ মুখে কৃতিত্বটা হজম করে যায় মনু। সেই দেখে কুপিত হলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'তবে একটা কথা বলি মনু। কলেজ লাইফে বটানিটা মন দিয়ে পড়লে এই কেস তুমি প্রথম দিনেই সলভ করে ফেলতে পারতে, বুঝলে হে।'

'কীরকম?' সবাই কৌতূহলী হলেন।'

'পলাশ আর কিংশুক নামের মানে যে এক সে বোধহয় বলতে হবে না। তবে জানলে আশ্চর্য হবেন, পলাশ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম বিউটিয়া মনস্পার্মা! মনসপর্ণার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল বলুন তো!'



নরেন মিত্তিরের পারফিউম

ল্যাপটপের স্ক্রিনের ওপর অনেকক্ষণ ঝুঁকে ছিল মাথাটা। একের পর একটা ছবি আসছে আর সরে যাচ্ছে। স্ক্রিনের দিকে এক ঝলক তাকালে বোঝা যায় ডার্ক ওয়েবের অন্ধকার সমুদ্রে তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজছে সে।

ধীরে ধীরে কয়েকটা বিশেষ পেজ টাস্কবারে সেভ করল সে। এবার একটা কমান্ড বক্স খুলল, কিছু প্রম্পট টাইপ করল। তারপর এন্টার বাটন টিপে উঠে গেল একটা কফি বানিয়ে আনবে বলে।

সে যখন কফির মগ নিয়ে ফিরে এল, তখন কয়েকটি পেজের কিছু কিছু ট্র্যানজাকশন হলুদ রঙে মার্ক করা হয়ে গেছে। মাথাটা এবার ঝুঁকে পড়ল সেই মার্ক করা অংশগুলোর ওপর।

হাতের কাছে একটা রাইটিং প্যাড টেনে নিল সে। একটা বিটকয়েনের কোড নাম্বার লিখে নিল। তারপর আরও কিছুক্ষণের ডার্ক ওয়েবে ঘোরাঘুরি। আরও কিছু ছোট ছোট কোড রান করার পর তার স্ক্রিনে একজন মানুষের ছবি, নাম আর ফোন নাম্বার ফুটে উঠল।

কিছু পরে মানুষটার মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। বিড়বিড় করল সে, পিপল ক্যান বি স্মার্ট, বাট আই অ্যাম স্মার্টার।

আড়মোড়া ভাঙল সে। এতদিনের পরিশ্রমের সফল হতে চলেছে তার। তারপর কব্জি উলটে রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নিল। কলকাতায় সকাল হতে চলেছে এখন। কল করাই যায় নাকি?

মোবাইলটা তুলে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করল মানুষটা। যাকে কল করছে তার স্ক্রিনে অবশ্য লোকটার ফোন নাম্বার ফুটে উঠবে না। কারণ কলটা সে করছে আইপি অ্যাড্রেস মাস্ক করে।

একটু পর ওদিক থেকে কে যেন হ্যালো বলল। এদিক থেকে শোনা গেল একটাই প্রশ্ন, 'রহমত শেখ?'

* * *

মাথা থেকে গলা অবধি ঢাকা কালো মাস্কটা খুলে নিতেই হাঁউমাউ করে উঠল বিপিন, 'আমি কিছু করিনি দাদারা। চুরি দাঙ্গা মারপিট কিচ্ছু না। আমি একদম সাধাসিধে ছেলে গো দাদাবাবু, দোকান চালিয়ে খাই। আমাকে ছেড়ে দিন।'

অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে একটা শীতল কণ্ঠে ধমক ভেসে আসে, 'চোপ। একদম চেঁচামেচি করবি না। কয়েকটা প্রশ্ন করবো, ঠিকঠাক উত্তর দিলে তোকে

যেমন তুলে আনা হয়েছে, ঠিক তেমন ছেড়ে আসা হবে। আর যদি চালাকি করেছিস তো গলা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবো। মনে থাকে যেন।'

বিপিন আবার হাঁউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিল, কাঁধে একটা ভারী হাতের চাপ পড়তে চুপ করে গেল।

'তোর নাম বিপিন হালদার। নিউ মার্কেটের শ্রীগুরু কসমেটিকস নামের দোকানটা তোর, তাই তো?'

'একদম ঠিক বলেছেন দাদারা। আমি ছোটখাটো মানুষ, সেন্ট, পারফিউম এসব বেচে পেট চালাই। ছোট দোকান। আমি গরীব লোক, পয়সাকড়ি কিচ্ছু পাবেন না...আ-আ-আমাকে ছেড়ে দিন।'

'আহ্, শাট আপ, একটাও বাড়তি কথা বলবি না। কাঁই কাঁই করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'আচ্ছা,' বিপিন মিইয়ে যায়।

'কী সেন্ট বেচিস?'

'সব রকমের বেচি। সস্তা সেন্ট, দামি পারফিউম, আতর, ডিওডোরেন্ট। বিদেশি সেন্টও পাবেন। দু-পুরুষের দোকান আমাদের।'

বলতে বলতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নেয় বিপিন। জায়গাটা বোধহয় একটা গ্যারাজ ঘর। মুখের ওপর একটা লাইট ফেলা আছে বলে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে মনে হলো যে প্রশ্ন করছে সেইই লিডার। বাকি আরও দুজন আছে, যারা ওকে তুলে এনেছে। সে দুটো নির্ঘাত এর স্যাঙাৎ হবে।

'এ ঠিক বলছে তো, রহমত?' লিডার ভারী গলায় প্রশ্ন করে অন্য দুজনের উদ্দেশ্যে।

'হ্যাঁ, একদম ঠিকঠাক বলছে। নরেনবাবুর সব সেন্ট-এর দোকান থেকেই বিক্রি হয়।'

গলা শুনে বিপিনের মনে হল এটা ওই গাট্টাগোট্টা চেহারার লোকটা, যে ধর্মতলা যাওয়ার রাস্তা জিগ্যেস করেছিল। কিন্তু গলাটা চেনা চেনা লাগছে না?

ন'টা সাড়ে ন'টা বাজলেই বিপিন দোকানে তালা লাগিয়ে একটা অটো ধরে ধর্মতলা আসে। সেখান থেকে রাত দশটা নাগাদ রাণীহাটি অবধি যাওয়ার বাস ছাড়ে একটা। সেটা মিস হলে পরের বাসের জন্য আবার ঘণ্টাখানেকের হা পিত্যেশ। তাই যে করে হোক আটটায় মধ্যে দোকান বন্ধ করতে হয় তাকে।

আজ একটু দেরি হওয়াতে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল বিপিন। কী করে সাড়ে আটটার আগে ধর্মতলা পৌঁছবে ওপরওয়ালাই জানেন!

এমন সময় রাস্তায় হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। চোখে গগলস পরা একটা লোক জানলা দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'ভাই ধর্মতলায় কে সি দাসের মিষ্টির দোকানটা কোনদিকে একটু বলবেন?'

বিপিন দেখল এই সুযোগ। এদের সঙ্গে যদি ধর্মতলা অবধি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সাড়ে আটটার অনেক আগেই পৌঁছতে পারবে। বিপিন একটু কায়দা করে বলল, 'ওই, তো, সোজা চলে যান না, সামনেই। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।'

লোকটা শুনে হাতে চাঁদ পেল যেন। একগাল হেসে বলল, 'তাই নাকি? বাহ বাহ। তা আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ুন না। রাস্তাটা দেখিয়েও দেবেন, ওখানে নেমেও যাবেন।'

বিপিন ঝটপট গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতেই কে যেন তার মুখের ওপর ভিজে কিছু একটা চেপে ধরল। সেই যে জ্ঞান হারাল, বিপিন জাগল এই এখানে।

'শেয়ালের মতো হাসা বন্ধ করো রহমত। যেটা জিগ্যেস করছি তার জবাব দাও।' ধমকে ওঠে লিডার, 'তুমি শিওর, যে নরেন মিত্তিরের ফ্যাক্টরির সব সেন্ট এখানেই আসে?'

'একদম পাক্কা।'

'সে কী? নরেন মিত্তির তার কাস্টমারদের সরাসরি প্রোডাক্ট বেচত না? মাঝখানে আবার দোকানদার এল কোথা থেকে?'

'শুনেছি উনি পছন্দ করতেন না কাস্টমার ওঁর বাড়িতে আসুন। তাই এই বিপিনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। সবাই নরেন মিত্তিরকে অর্ডার দিয়ে ডেলিভারি নিতেন বিপিনের কাছে। পেমেন্টও বিপিনকেই করতেন।'

'হুম। এবার একটা কথা বলো তো বিপিনবাবু, বাজারে এত লোক থাকতে নরেন মিত্তির তোমাকেই কেন বেছে নিল?'

ঢোঁক গিলল বিপিন, 'আজ্ঞে, সবার পক্ষে নিউ মার্কেট আসা সুবিধার কী না। তাই...'

'শুধু তাই? নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?'

মাথাটা একবার চুলকে নিল বিপিন। এখানে সব কিছু খুলে বলাটা কি ঠিক হবে?

'মনে পড়ছে না, তাই না রে বিপিন?' ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করল রহমত নামের লোকটা, 'বেশি চালাকি শিখেছিস, না রে? মনে করানোর অনেক উপায় আমাদের জানা আছে। দেখতে চাস?'

বিপিন বুঝল, এখন হাঁউমাউ করে কোনও লাভ নেই। মাথা ঠান্ডা করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। তার আগে জানা দরকার কয়েকটা সেন্টের শিশির জন্য ওকে কিডন্যাপ করার মানেটা কি।

'আজ্ঞে উনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন কী না। তাই ওনার বানানো সেন্ট বিক্রির জন্য আমাকেই দিতেন।'

'বটে? নরেন মিত্তির ভালোবাসার জন্য ভালো লোককেই খুঁজে নিয়েছিল দেখছি। তা লাস্ট ক'টা পারফিউমের শিশি এসেছিল নরেন মিত্তিরের ফ্যাক্টরি থেকে?'

'তা প্রায় গোটা বিশেক হবে। তার মধ্যে চারটে বিক্রি হয়ে গেছে।'

'হুম, শিশিগুলো কাকে কাকে বিক্রি করেছিস?'

মাথা টাথা চুলকে বিপিন বললো, 'একজন হলেন সুমিত লস্কর, রঙের কোম্পানির বড়সায়েব, মল্লিক বাজারে অফিস। আরেকজন মধুমিতা সান্যাল, সল্ট লেকের সি এ স্কুলের টীচার। আর অন্যজন হলেন গিয়ে গোপাল শিকদার, বেহালার প্রোমোটার যোগেন শিকদারের বড় ছেলে, বাড়ি চোদ্দো নাম্বারে। শেষের জন নতুন

কাস্টমার, নামটা মনে পড়ছে না। তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন সে বলতে পারব না।'

পিঠে একটা কিল নেমে এল বিপিনের, মুখ থুবড়ে পড়ল সে। পেছন থেকে কে যেন তার চুল টেনে ধরল সজোরে। লিডার খুব শান্ত গলায় বলল, 'বলতে পারব না শোনার জন্য তোকে তুলে আনা হয়নি বিপিন।'

হাউমাউ করে উঠল বিপিন, 'মাইরি বলছি, নরেন মিস্ত্রিরের পারফিউম চেনা লোকেরাই নিয়ে যায়, তাই সব্বার নাম ধাম জানি। কিন্তু লাস্টের লোকটা নতুন, তাই ভালো করে আলাপ হয়নি। তবে লোকটা যদি ফের আমার দোকানে আসে, তখন ঠিকানা, বাবার নাম, আধার কার্ড, ফোন নাম্বার সব জেনে নেব, মায়ের দিব্যি।'

রহমত নামের লোকটা বোধহয় আবার কিছু একটা করার জন্য হাত ওঠাচ্ছিল। লিডার থামাল তাকে। তারপর অন্য লোকটাকে বলল, 'এই লস্কর, শিকদার আর সান্যালের ব্যবস্থা আমি করছি, নাম ধাম আর কাজকর্মের হদিশ সবই যখন জানা গেছে, তখন ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। আর বিপিনবাবু, দেখো তো, শেষ লোকটা তোমার দোকান থেকে সেন্ট কিনে নিয়ে গেছিল তাকে দেখতে কেমন, নাম ধাম এসব কিছু মনে করতে পারো কি না। মনে না পড়লেও বলো। মনে করাবার অনেক ওষুধ আমাদের জানা আছে।'

হাত-পা ঠান্ডা হয়েই ছিল। এবার ঘামতে শুরু করে বিপিন। খানিকটা হলেও ও বুঝতে পেরেছে কেসটা কী। নরেন মিস্ত্রিরের কারখানা থেকে আসল সেন্টের শিশিগুলো কারা কিনেছে, সেটা এরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেটাই এদের টার্গেট। কিন্তু কেন?

বিপিন কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, 'বয়স্ক লোক, ষাটের ওপর তো হবেই। বেশি হাইট না, রোগাপাতলা চেহারা। একটু আস্তে হাঁটে, গালে সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে, মাথার মাঝখানে টাক, আর চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, এটুকুই মনে আছে স্যার।'

'আর কিছু?'

উদভ্রান্তের মতো তাকায় বিপিন, 'আর কিছু বলেছে বলে তো মনে পড়ছে না স্যার। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লোকটার বাড়ি সল্টলেকে, বিজে ব্লকে। কোন একটা ব্যাটারি কম্পানির হাই পোস্টে আছে।'

উঠে দাঁড়ায় লিডার, তারপর পকেট থেকে একটা অদ্ভুত দেখতে মাস্ক বার করে নিয়ে মুখে বাঁধে। 'রহমত, এর দোকান থেকে বাকি সব সেন্টের শিশিগুলো আজ রাতে তুলে নিয়ে এসো। তাতে যদি কাজ হয় তো বখেরা মিটেই গেল। আর যদি না হয় তাহলে খাটাখাটুনি আছে। আর তুমিও মুখে মাস্ক বাঁধো।'

বিপিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই লিডার পকেট থেকে একটা ছোট পারফিউমের শিশি বার করে এনে বিপিনের ঘাড়ে স্প্রে করে দিল। চোখের সামনের দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে এল বিপিন হালদারের।

* * *

দুটো সন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছিল ল্যাপটপের স্ক্রিনের ওপর। সামনে একটা ডেটাবেস খোলা। একের পর একটা ছবি আর বাড়ির ঠিকানা ভেসে আসছে স্ক্রিনে। লোকটা একবার করে দেখছে, তারপর পরের ছবিতে চলে যাচ্ছে।

এই করে করে ঘণ্টাখানেক সময় পেরিয়ে গেল। ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে। আঙুল মটকাচ্ছে, পা নাচাচ্ছে। একবার মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কপাল টিপে ধরল মিনিট দুয়েকের জন্য। অ্যাশট্রেতে একটার পর একটা সিগারেটের শেষাংশ জমে জমে স্তূপাকার হতে চলেছে প্রায়।

অবশেষে একটা ছবিতে এসে স্থির হল সে। স্ক্রিনে একজন মধ্যবয়স্ক লোকের ছবি। গালে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। নাম ব্রজেন পুরকায়স্থ, পাশে ঠিকানা লেখা, বিজে ২১, সল্টলেক।

এবার সে একটা ম্যাপ খুলল। সাধারণ ম্যাপ নয়, থ্রি ডি। অনেকক্ষণ সার্চ করার পর একটা দোতলা বাড়িতে ওপর এসে কার্সর স্থির হল।

এইবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। যাক অবশেষে পাওয়া গেছে। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা মোবাইল ফোনটা টেনে নিল সে, একটা এ পি আই লিঙ্ক ক্লিক করল। তারপর একটা নাম্বারে কল করে বলল, 'রহমত, রেডি হতে হবে। কাজ আছে।'

* * *

আজ পয়লা জুন, প্রফেসর মুখার্জির জন্মদিন। সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে। দুপুরে লাঞ্চের আয়োজন হয়েছে। মেনুতে রয়েছে প্রফেসর মুখার্জির প্রিয়তম আইটেম, বিরিয়ানি। নিমন্ত্রিত অবশ্য অল্পই। মনুজেন্দ্র আর মনোজ চাকলাদার তো আছেনই। আর আছেন প্রফেসর মুখার্জির খুব কাছের দুজন বন্ধু।

লাঞ্চের আগে সবাই একত্রিত হয়েছেন প্রফেসর মুখার্জির ড্রয়িংরুমে। প্রফেসর মুখার্জি একজন প্রসিদ্ধ সুরারসিক, তাঁর বাড়ির জমায়েত পানীয় ছাড়া ভাবাই যায় না। তিনি একটি জিন উইথ লাইম কর্ডিয়ালের গ্লাস তুলে নিয়ে হৃষ্টমুখে বললেন 'চিয়ার্স গাইজ, এনজয় দ্য ডে।'

মনোজ চাকলাদার স্কচ ছাড়া কিছু ছোঁন না। তিনি খাচ্ছিলেন ব্ল্যাক লেবেল অন দ্য রকস্। তিনি গ্লাসটা সামান্য তুলে বললেন, 'চিয়ার্স, টু দ্য মোস্ট ইয়ংগেস্ট অ্যান্ড স্মার্টেস্ট স্লুথ অফ বেঙ্গল।'

প্রফেসর মুখার্জি খুব লজ্জা পাওয়ার ভাব করে বললেন, 'আহা, তা কেন? আজকাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ তো অনেকেই আছেন, যাঁরা যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন। আমি সামান্য সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং-এর প্রফেসর, তোমরা বলো বলে

দু-একটা কেস দেখি, কিছু ফেলে যাওয়া সূত্র পেলে ধরিয়ে দিই, এই আর কী। আমাকে আবার এসব বলে লজ্জা দেওয়া কেন।'

মনুজেন্দ্র খুব একটা মদ খায় না। তাছাড়া সামনে বড় সাহেব উপস্থিত আছেন, তাঁর সামনে বেশি মদ্যপান ঠিক দেখায় না। সে একটা বিয়ারের মগ হাতে নিয়ে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল। প্রফেসর মুখার্জির কথাটা শুনে আস্তে করে বলল, 'উফ্, বিনয়ের ঝাউগাছ।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'অ্যাঁ? কিছু বললে মনু?'

মনুজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলল, 'না, না, কিচ্ছু বলিনি। নিজের মনে বিড়বিড় করছিলাম।'

মুখার্জিগৃহিনী মুখ টিপে হাসলেন। এই সুদর্শন কুমারটিকে তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করেন। তিনি মনুজেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাবা মনু, তোমাকে আর এক প্লেট কাজুবাদাম দিই?'

মনুজেন্দ্র শোনামাত্র ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে দিল। প্রফেসর মুখার্জি মিষ্টি করে গিন্নিকে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়ে যাও তো এক প্লেট। দেখো, যেন বেশি কড়া করে ভাজা না হয়। আর হ্যাঁ, ওই বেঙ্গল ঘি-টাই ইউজ কোরো।'

মুখার্জি গৃহিনী যেতে যেতে কঠিন স্বরে বললেন, 'যার কোলেস্টেরল টঙে চড়ে বসে আছে তার পক্ষে একবেলা বিরিয়ানিই যথেষ্ট। তার আর ঘিয়ে ভাজা কাজুবাদাম খেয়ে কাজ নেই। ওটা অন্যাদের জন্য।'

মনোজ চাকলাদার গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতেই একবার কেশে উঠলেন। বাকিরা হাসি চেপে খুব গম্ভীরমুখে মোবাইল দেখতে লাগলেন। একমাত্র মনুজেন্দ্রই খুব সিরিয়াস। চিন্তিত মুখে বলল, 'সে কী! স্যারের কোলেস্টেরল এত ওপরে? আমরা তো জানতামই না। এবার থেকে কোনও কেসে বাইরে গেলে স্যারের লাঞ্চের দিকে খেয়াল রাখতে হবে দেখছি।'

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে মনুজেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিক্তমধুর সুরে প্রশ্ন করলেন, 'আপাতত তোমার হাতে কোনও জটিল কেস নেই, তাই না মনু?'

মনুজেন্দ্র একগাল হেসে বলল, 'তা কেন হবে। কেস একটা এসেছে বটে। খুনের কেস। তবে ও আমরাই সলভ করে নিতে পারব।'

'হুম, বুঝেছি। তা কেসটা কী শুনি?'

'দিন তিনেক আগে লেক গার্ডেন্সের কাছে একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বয়েস ছাপান্ন, পেশায় একজন একজন সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ।'

প্রফেসর মুখার্জির দুই বন্ধুর মধ্যে একজন চমকে উঠলেন, 'সে কী? নরেন মিত্র মারা গেছেন?'

প্রফেসর মুখার্জির ভুরু কুঁচকে গেল, 'সে কী ব্রজেন? চেনো নাকি ভদ্রলোককে?'

ব্রজেন পুরকায়স্থ এককালে প্রফেসর মুখার্জির সঙ্গে একই কোম্পানিতে চাকরি করতেন। দীর্ঘ দুই দশক পেরিয়েও সেই বন্ধুত্ব অটুট আছে। তিনি বললেন, 'চিনি বই কি, বিলক্ষণ চিনি। তুমি তো জানো চিন্টু, আমার পারফিউমের শখ আছে।

এমন কোনও দেশি-বিদেশি বিখ্যাত ব্র্যান্ড নেই যা আমি কখনও ব্যবহার করিনি। তবে নরেন মিস্তিরের বানানো পারফিউমের এত সুনাম শুনে এই প্রথম অর্ডার দিয়ে একটা পারফিউম নিয়েছিলাম।'

'কেন? খুব ভালো পারফিউম নাকি?'

'ভালো! শুধু ভালো বললে কম বলা হয় হে। শুনেছি ও জিনিস ব্যবহার করতে পারাও নাকি একটা এক্সপিরিয়েন্স। আর আরও স্পেশ্যাল ব্যাপার কী জানো? শুধু আমার জন্য ছাড়া ওই বিশেষ পারফিউমটি আর কারো জন্য তৈরি হবে না।'

'অ্যাঁ? বলো কী হে?'

'হুঁ-হুঁ বাওয়া। আমাকে বসিয়ে রীতিমতো ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। তারপর ঘামের স্যাম্পল, চামড়ার উপরিভাগের অংশ এসব কালেক্ট করে, পার্সোনালিটি অ্যানালাইজ করে, একদম আমার জন্য কাস্টমাইজড পারফিউম বানিয়েছিলেন।'

'বলো কী হে? কলকাতায় বসে পারফিউমারির মালিক কাস্টমাইজড পারফিউম বানাচ্ছে? এ তো ভাবাই যাচ্ছে না ব্রজেন। তুমি জানো এ কত কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট?'

'হতে পারে। লোকটা তো কম টাকা কামায়নি। এটা শখের ব্যবসা শুনেছিলাম।'

'হুম, তা এমন ঘনিষ্ঠ লোক তোমার, তার মারা যাওয়ার খবরটা পাওনি?'

'আরে দেখা তো মাত্র একবারই হয়েছে। জানব কী করে?'

'সে কী? অমন কাস্টমাইজড পারফিউমটা তাহলে কিনলে কোথা থেকে? ওঁর কাছ থেকে কিনতে না? রেগুলার দেখাপত্তর হতো না?'

'না, না, নরেন মিস্তিরের একজন এজেন্ট ছিল নিউ মার্কেটে, বিপিন হালদার। ওখান থেকেই কালেক্ট করেছিলাম পারফিউমের শিশিটা।'

'ইন্টারেস্টিং তো। খুবই ইন্টারেস্টিং।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নরেন মিস্তির এক-এক জনের জন্য আলাদা আলাদা সুগন্ধি বানাতেন। আর সবক'টাই একেবারে অনন্য, এক্সক্লুসিভ।'

'বটে? তা এত এক্সক্লুসিভিটির কারণ কী?'

ব্রজেন পুরকায়স্থ বোঝাতে প্রবৃত্ত হন।

দামি পারফিউম হচ্ছে শখের জিনিস, অনেকটা দামি স্কচ বা চুরুটের মতো। যিনি একটি বিশেষ পারফিউমের প্রেমে পড়েছেন, তিনি সচরাচর অন্য পারফিউম ব্যবহার করেন না।

নরেন মিস্তির যে পারফিউম বানাতেন, সেটা হচ্ছে কাস্টমাইজড পারফিউম। মানে ওই সুগন্ধিটি তার ক্রেতা মানুষটির ব্যক্তিত্ব, পছন্দ, পেশা, সামাজিক ব্যবহার, এসব বিচার করে বানানো। ওই পারফিউম শুধুমাত্র ওই বিশেষ ক্রেতাটির ব্যক্তিত্বকেই ফুটিয়ে তুলবে। তাই ওই নির্দিষ্ট ক্রেতা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কাউকে সে পারফিউম বিক্রি করা হবে না।

এই বিশিষ্টতা বা এক্সক্লুসিভিটি দুনিয়ার সব রইস খানদানি লোকেরাই চান। আর তার জন্য তাঁরা উপযুক্ত দাম দিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাই মিস্তির মশাইয়ের পারফিউমের ক্রেতার সংখ্যা কম হলে কী হবে, তাঁরা প্রত্যেকেই বিলক্ষণ বড়লোক।

এক একটি ১০০ মিলিলিটারের সুগন্ধির বোতলের জন্য তাঁরা পকেট থেকে যে পয়সাটা দিতেন সে অকল্পনীয়। ব্রজেন পুরকায়স্থ তাদেরই মধ্যে একজন।

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ তো সাঙ্ঘাতিক জিনিস মনু। এমন প্রতিভাধর সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ তো লাখে একটা মেলে।'

মনুজেন্দ্র মাথা নাড়ে, 'সে আর বলতে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, দুটোতেই ভালো মার্কস ছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে কেমিস্ট্রি অনার্স করেন, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। মাস্টার্স করেন আমেরিকায়। তারপর প্রায় সারাজীবন ফ্রান্সে কাটিয়েছেন, একটি বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক পারফিউম কম্পানির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে। বেশ কিছু পৃথিবীবিখ্যাত পারফিউমের ফর্মুলেশন এঁরই বানানো।

বছর আটেক আগে সব ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে এসে নিজস্ব একটি ওয়ার্কশপ গড়ে তোলেন। সেখানে কিছু বিশেষ টাইপের পারফিউম তৈরি করতেন। তাঁর ক্লায়েন্ট সার্কেল বেশ ছোট ছিল, কারণ কিছু বিশিষ্ট গুণগ্রাহী ছাড়া নরেন মিত্তির তাঁর পারফিউম অন্য কাউকে বেচতেন না। তাঁর ক্রেতাদের মধ্যে দেশ বিদেশের বেশ কিছু নামিদামি সেলিব্রিটিও আছেন।'

ঝুঁকে এলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'তা এমন প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ থাকতেন কোথায়?'

'ভদ্রলোক থাকতেন লেক গার্ডেন্স আর যোধপুর পার্কের মাঝামাঝি একটা দোতলা বাড়িতে। একাই থাকতেন, সঙ্গে আর কেউ না। ফ্রান্সে থাকাকালীন বিয়ে করেছিলেন একবার, নিজেরই কোনও এক কলেজমেটকে। সে বিয়ে বেশিদিন টেঁকেনি। তারপর আর বিয়েশাদি করেননি ভদ্রলোক। দেশেও কেউ ছিল না। মা-বাবা গত হয়েছিলেন অনেকদিন আগে। একটি ভাই আছে, বিদেশে থাকেন। এছাড়া আর কেউ নেই। ড্রাইভার আর দুটি কাজের লোক, ব্যস, এই ছিল নরেন মিত্তিরের সংসার।'

'আর ব্যবসা? সেটাও কি একাই দেখতেন নাকি?'

'গবেষণার কাজটা ওঁর বাড়িতেই হতো। দোতলায় একটা ছোটখাটো ল্যাব বানিয়েছিলেন। ওয়ার্কশপটা বাড়ির পেছনে। খুব বেশি বড় না, মেরেকেটে দু-হাজার স্কোয়্যার ফিটের হবে। দুজন কেমিস্ট ছিল সহকারী হিসেবে। একজনের নাম রাজকুমার মণ্ডল, আরেকজনের নাম সুলতানা নাসরিন। দুজনেই ইয়াং, পড়াশোনায় ভালো, ওয়ার্কশপের প্রথম দিন থেকেই মিত্তিরবাবুর সঙ্গে আছে।'

'হুম, বুঝলাম। এবার বলো তো বাপু, খুনটা হল কী করে?'

'হয়েছে রাতের দিকে। বাড়ির কাজের লোক এসে অনেকক্ষণ ধরে কলিংবেল বাজিয়েও কারো সাড়া পায়নি। তারপর সে জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে ভদ্রলোক ড্রয়িং রুমের সোফায় পড়ে আছেন। সেই চেঁচামেচি করে আশেপাশের লোকজন জড়ো করে, মণ্ডল আর সুলতানাকে খবর দেয়। রাজকুমারই পৌঁছোয় আগে, সে বুদ্ধি করে সঙ্গে একজন ডাক্তারকেও নিয়ে এসেছিল। তিনিই সন্দেহ করেন যে মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। তাঁর পরামর্শেই পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়।'

'তা খুনটা হল কী করে? গলা টিপে খুন? বুলেট? ছুরি? হাতুড়ি? নাকি বিষ?'

'ওই লাস্টে যেটা বললেন। বিষ।'

'হুম, তা কেমনতরো বিষ?'

মনুজেন্দ্র মাথা চুলকে বলল, 'ইয়ে...সেটা এখনও বোঝা যায়নি। প্রাথমিক ময়না তদন্তে শুধু এটুকু জানা গেছে যে ভদ্রলোককে কোনও একটা আনইউজুয়াল বিষ প্রয়োগে খুন করা হয়েছে। কোন বিষ সেটা জানার জন্য ফরেনসিক টিম লেগে রয়েছে কাজে।'

'ইন্টারেস্টিং। আর ভিসেরা রিপোর্ট?'

এবার মুখ খুললেন মনোজ চাকলাদার স্বয়ং, 'সেখানেই কিন্তু একটা বড় খটকা আছে মামাবাবু। ভিসেরা রিপোর্টে পাকস্থলীতে বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বিষ রক্তে মিশেছে সরাসরি। অথচ সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও ইঞ্জেকশন এর নিডল ফোটাবার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। চিবিয়ে বা ওরাল অ্যাডমিনিস্টার করার চিহ্ন নেই। তবে মনুজেন্দ্র যেমন বলল, ফরেন্সিক টিম লেগে আছে। আশা করা যায় শিগ্গিরিই এর একটা সুরাহা হবে।'

'স্ট্রেঞ্জ। মানে কোন বিষ জানা যাচ্ছে না, আর কী করে বিষটা প্রয়োগ করা হল সেটাও জানা যাচ্ছে না। বেশ। আর মোটিভ? মানে খুন করার মোটিভটা কী?'

মনুজেন্দ্র মাথা চুলকে বলল, 'সেটা এখনও ক্লিয়ার হয়নি স্যার। আমরা তদন্ত করছি। যদিও ভিকটিমের ল্যাপটপ আর মোবাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তবুও বলছি চুরি-ডাকাতির চান্স কম, কারণ ওখানে আরও অনেক দামি যন্ত্রপাতি ছিল, যার কিছুই চুরি যায়নি।

'স্থানীয় পুলিশ অনেক ছানবিন করেও কিছু খুঁজে পায়নি, তাই শেষমেশ আমাদের ঘাড়েই চেপেছে। আসলে আমাদের হোম মিনিস্টারও নরেন মিত্তিরের পারফিউম ইউজ করতেন কী না। দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল।'

প্রফেসর মুখার্জির ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসিটা কারো নজর এড়াল না।

বাকি অতিথি দুজন বেশ মনোযোগ সহকারে এই আলাপ আলোচনা শুনছিলেন। ব্রজেন পুরকায়স্থ দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'আহা, অমন প্রতিভাবান লোকটা চলে গেলো? অমন পারফিউম আর কে বানাবে।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'একবার শুঁকিও তো ব্রজেন। দেখি কী এমন অসাধারণ পারফিউম বানাতেন মিত্তিরমশাই।'

'তার আর উপায় নেই চিন্টু। সে পারফিউমের শিশি গতকাল রাতে চুরি গেছে।'

'সে কী? চুরি গেছে? শিওর? হারায়নি?'

'না হে, চুরিই গেছে। তুমি তো জানো, হারানোর মতো বেখেয়ালি লোক আমি নই, তাও অমন শখের জিনিস।'

'তা চুরিটা গেল কী করে?'

'পরশু একটা আউটস্টেশন অফিস পার্টি ছিল। কাল ফিরে আসতে আসতে প্রায় ভোর ভোর হয়ে যায়। ফিরে এসে আমার বেডরুমে চেঞ্জ করতে ঢুকেছি, কেমন যেন মনে হল জিনিসপত্র একটু এদিক-ওদিক হয়ে আছে। তুমি তো জানো, আমি একটু খুঁতখুঁতে মানুষ। আমার সব কিছু একদম নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। ফলে

একটা কিছুও এদিওদিক হলে আমার নজর এড়ায় না। খুঁজে খুঁজে দেখি বাকি সব ঠিক আছে, শুধু ওই পারফিউমের বোতলটাই হাওয়া।'

'শুধু একটা পারফিউমের বোতলই হাওয়া? আশ্চর্যের ব্যাপার তো। আর কিছু চুরি যায়নি?'

'নাহ্, আর কিচ্ছু না। আর সেটাও বেশ আশ্চর্যের। একই জায়গায় বেশ কিছু বিদেশি ঘড়ি রাখা ছিল, একটা দামি ট্যাব ছিল। তুমি তো জানো, আমার বিদেশি কয়েন জমানোর শখ আছে। সব ঠিকঠাক আছে। শুধু ওই পারফিউমের শিশিটাই গায়েব।'

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'চোর ঢুকলো কীভাবে কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'নাহ্। দরজা জানালা যেভাবে লক করে গেছিলাম সেভাবেই সব আটকানো ছিল। এমনকী ডোরবেল ক্যামেরাতেও কারো ছবি নেই।'

'পুলিশে জানাওনি?'

'ধুর, পুলিশের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। চারিদিকে খুন জখম ডাকাতি এত বেড়ে গেছে যে সেইসব সামলাতেই পুলিশ নাজেহাল। তাদের কি আর সেন্টের শিশি খোঁজার টাইম আছে?'

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ব্রজেন পুরকায়স্থর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'কাল একবার তোমার বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে ব্রজেন?'

'সার্টেনলি। কিন্তু কেন?'

'আমি একবার জানতে চাই চুরিটা হল কীভাবে। মনটা বড়ই খচখচ করছে হে।'

* * *

পরের দিন সকাল সকাল প্রফেসর মুখার্জি পৌঁছে গেলেন ব্রজেন পুরকায়স্থর বাড়িতে। ব্রজেনবাবুর বাড়িটা সল্টলেকের বিজে ব্লকে। ভদ্রলোকের বাবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরায়ন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যথেষ্ট উঁচু পোস্টে কাজ করতেন। তিনিই সস্তায় জমি পেয়ে বাড়িটা বানিয়েছিলেন। দোতলা বাড়ি। বেশ শৌখিন অথচ ছিমছাম ভাবে সাজানো। বোঝা যায় যে গৃহস্বামীর শুধু অর্থ নয়, রুচিও আছে।

এককাপ চা খেয়ে নিজের কাজ শুরু করে দিলেন প্রফেসর মুখার্জি। আজকাল বেশ আধুনিক ডোরবেল হয়েছে, আগন্তুকের ছবি আর ভিডিও ওঠে। সেসব খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর যে ঘর থেকে ব্রজেন পুরকায়স্থ'র পারফিউমের বোতল চুরি গেছে সেটাও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করলেন। ব্রজেনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। তিনি একবার বললেন, 'পুলিশ ডেকেও কিছু হতো না। তারপর আমরা এই ঘরের এত জিনিস নাড়াঘাঁটা করেছি, যে চোরের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া প্রায় অসম্ভব।'

এবার ছাদে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। গিয়ে বুঝলেন কারো পক্ষে ছাদে নেমে চুরি করাও অসম্ভব, এক যদি না চোরকে হেলিকপ্টার থেকে ড্রপ করা হয়।

আশেপাশের বাড়ি থেকে এই বাড়ির ছাদ অনেকটা দূর। ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে কোনও গাছও নেই যা বেয়ে চোর ছাদে নামতে পারে।

প্রফেসর মুখার্জি নীচে নেমে বাইরে বেরিয়ে এলেন। যে ঘর থেকে চুরিটা হয়েছে তার জানলার নীচে মাটিটা একবার নিচু হয়ে দেখলেন। আগের দিন বিকেল বেলায় একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। মাটি এখনও ভিজে আছে। ফলে কোনও পায়ের ছাপটাপ কিছুই পেলেন না।

এবার জানালার নীচে দেওয়ালটা খুব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন প্রফেসর মুখার্জি। একটু পর ঘাড় ঘুরিয়ে ব্রজেনবাবুকে বললেন, 'একটা আতশকাচ এনে দিতে পারো ব্রজেন?'

ব্রজেন পুরকায়স্থ দৌড়ে গিয়ে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনে দিলেন। প্রফেসর মুখার্জি অতি নিবিষ্টমনে সেটি হাতে নিয়ে জানলার নীচের দেওয়ালের প্রতি ইঞ্চি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁর ভ্রুকুটি ঘন হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে মুখার্জিমশাই জানালায় পৌঁছলেন। জানালার গ্রিল, পাল্লা, এসবের ইঞ্চি ইঞ্চি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ব্রজেন পুরকায়স্থ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'ও দেখে লাভ নেই চিন্টু। জানলার গ্রিল খোলা হয়নি। দরজা খোলা হয়নি, ছাদের দরজা বন্ধ ছিল। ক্লোজড ডোর মার্ডার মিস্ট্রি হয় শুনেছি, মনে হচ্ছে এ হল ক্লোজড ডোর চুরি মিস্ট্রি।'

জানলার পাল্লাগুলো দেখতে দেখতে প্রফেসর মুখার্জির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'না হে ব্রজেন, চোরকে যতটা বোকা ভাবছিলাম ততটা বোকা নয়। বরং আমাদের থেকে বহুগুণ চালাক সে। আর তাতে আমি যেটা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই আরও পাকা হচ্ছে হে।'

'কী সন্দেহ?'

'নরেন মিত্তিরের খুন কোনও সাধারণ খুন নয়। এর পেছনে গভীর কোনও রহস্য আছে। তুমি আজ আমাকে একবার যে দোকান থেকে নরেন মিত্তিরের পারফিউম কিনতে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'সার্টেনলি। কিন্তু চুরির ব্যাপারে কী বুঝলে শুনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এটা কোনও ক্লোজড ডোর চুরির মিস্ট্রি নয় ব্রজেন। ওরা জানলার গ্রিল খুলে ঢোকেনি, পুরো জানলাটাই খুলে নিয়েছিল ফ্রেম থেকে।'

ব্রজেন পুরকায়স্থ কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর স্খলিতস্বরে বললেন, 'অ্যাঁ? সে কী? পুরো জানলাটাই খুলে নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। এই আতশকাচ দিয়ে ফ্রেমের কর্ণারের স্ক্রুগুলোকে দেখো। অতি যত্নে সেগুলো খুলে নিয়ে গোটা ফ্রেমটাকেই নামিয়ে নিয়েছিল চোরেরা। তারপর ভেতরে ঢুকে তোমার সাধের সেন্টের শিশি চুরি করে গেছে। যাওয়ার আগে জানলাটা আবার ঠিকঠাক যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়ে গেছে।'

ব্রজেন পুরকায়স্থ চোখ বড় বড় করে বললেন, 'এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার চিন্টু। একটা পারফিউম চুরি করার জন্য এত কাণ্ড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ব্রজেন, আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ একটা সুগন্ধির বোতল চুরি করার জন্য এত কাণ্ড। আর তাই তো বলছি, এই চুরি কোনও সাধারণ চুরি নয়। অত্যন্ত প্রশিক্ষিত কোনও চোরেদের গ্যাং ছাড়া নিঃসাড়ে এমন নিপুণহাতে এই কাজ করতে পারে না। তার মানে ওই গ্যাং-এর প্রধান উদ্দেশ্য পারফিউমের বোতল চুরি করা নয়, অন্য কিছু, আরও সিরিয়াস কিছু। আর সেটা যে কি, সেটাই আমাদের জানতে হবে। সেই জন্যই যে দোকান থেকে তুমি নরেন মিত্তিরের পারফিউম কিনতে, সেখানে যাওয়া এবং ওই বিপিন হালদারের সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি। যদি না ইতিমধ্যেই সেখানে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গিয়ে থাকে।'

* * *

ব্রজেন পুরকায়স্থ আর প্রফেসর মুখার্জি যখন নিউ মার্কেট পৌঁছলেন তখন বেলা একটা। দুজনেরই খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছিল। ফলে প্রফেসর মুখার্জির সাজেশনমতো তৃপ্তি করে বিরিয়ানি খাওয়া হল। তারপর একটা করে পানের খিলি মুখে পুরে দুজনে নিউ মার্কেটে ঢুকলেন।

শ্রীগুরু কসমেটিকস খুঁজে পেতে ব্রজেন পুরকায়স্থ'র সময় লাগল ঠিক তিন মিনিট। আর এই তিন মিনিটের মাথায় দুজনেই সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে শ্রীগুরু কসমেটিকস-এর সামনেটা পুলিশে ছয়লাপ, আশেপাশের লোকজন আগ্রহে উত্তেজনায় উঁকিঝুঁকি মারছে, আর সেই পুলিশবাহিনীর সামনে যে লোকটা গম্ভীরমুখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে দুজনেই চেনেন। ইনস্পেকটর মনুজেন্দ্র বর্মণ।

প্রফেসর মুখার্জি কিছুই যেন হয়নি এমন একটা ভাব করে সামনে এগিয়ে গেলেন। মনুজেন্দ্রর কাঁধে টোকা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আরে মনু যে, তুমি এখানে? কিছু হয়েছে?'

মনুজেন্দ্র ঘুরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'এ কী! আপনারা এখানে কী করছেন?'

প্রফেসর মুখার্জি অমায়িক হেসে বললেন, 'এই একটু বাজারহাট করতে এসেছিলাম। তা এখানে কি কিছু হয়েছে মনু?'

'হ্যাঁ স্যার। কাল রাতে এই দোকানের মালিকের ডেডবডি পাওয়া গেছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই দোকানেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র মশাইয়ের ফ্যাক্টরি থেকে সব পারফিউম আসত, কাল যাঁর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল।'

প্রফেসর মুখার্জি আর ব্রজেন পুরকায়স্থ দুজনেই ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রফেসর মুখার্জি খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন মনুজেন্দ্রর দিকে। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'সে কী? কবে? কী করে?'

মনুজেন্দ্র যা বলল তা এইরকম।

বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে মাঠকল বলে একটা জায়গা আছে, গার্বেজ

ডাম্পিং গ্রাউন্ড। গতকাল গভীর রাতে পুলিশের একটা টহলদারি ভ্যান দেখে ওখানে কে যেন একটা বেঢপ বড় সাইজের বস্তা পুঁতে ফেলার চেষ্টা করছে। পুলিশ ভ্যান দেখে লোকদুটো পালিয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে দেখে বড় সাইজের বস্তায় একটি ছেলের মৃতদেহ। পেট্রলিং পুলিশ বডিটা উদ্ধার করে আনে।

কলকাতা শহরে খুন জখম হামেশাই লেগে আছে। সে কোনও নতুন কথা নয়। বেওয়ারিশ লাশও পাওয়া যায় নিত্য। কিন্তু বিপিন হালদারের কপাল ভালো ছিল। লালবাজারের এক পুলিশকর্তা বিপিনের দোকান থেকে রেগুলার পারফিউম, ডিওডোরেন্ট এসব কিনতেন, বিপিনকেও চিনতেন ভালোমতোই। তাঁর দৌলতেই বিপিনের তত্বতালাশ খুঁজে পাওয়া গেল দ্রুত।

তবে তার থেকেও মিস্টিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে আজ, এইমাত্র। মনুজেন্দ্র অ্যান্ড কোং সদলবলে বিপিনের দোকানে এসে দেখে রাতের বেলাতেই কেউ বিপিনের দোকানের তালা ভেঙে বেশ কিছু পারফিউমের বোতল তুলে নিয়ে গেছে।

প্রফেসর মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, 'রাত্রিবেলা নিউমার্কেটের গেট বন্ধ থাকে না?'

'থাকে। লিন্ডসে স্ট্রিটে বেঁকে গিয়ে যেখানে নিউমার্কেটের পেছন দিকটায় গিয়ে মিশেছে, ওই গেটটা একটু ভাঙা আছে। একটা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকতো। চোরেরা ওইখান দিয়ে ঢুকেছে।'

ব্রজেন পুরকায়স্থ বললেন 'খুব ডেয়ারডেভিল চোর বলতে হবে।'

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'বিপিনের বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ি হাওড়ার রাণীহাটিতে। বাড়িতে বুড়ো বাপ মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষ হলে বডি হ্যান্ডওভার করা হবে।'

'ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে আমাকে একবার জানিও তো মনু।'

'সার্টেনলি স্যার।'

* * *

মনোজ চাকলাদারের ফোনটা এল রাতের দিকে। প্রফেসর মুখার্জি তখন ক্লাসের খাতা দেখা শেষ করে বোতলটা সবে নামিয়েছেন। মোবাইলটা তুলে বললেন, 'বলুন ভাগনেবাবু, কী সমাচার?'

মনোজ চাকলাদার ভনিতার মধ্যে দিয়ে গেলেন না। বললেন, 'বিপিন হালদারের খুনের খবর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন মামাবাবু।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সত্যি কথা বলতে কি, এমন একটা কিছু যে ঘটতে পারে সেরকম একটা আশঙ্কা আমার মনের মধ্যে ছিল।'

'জানি, ব্রজেন পুরকায়স্থ আমাদের সব বলেছেন।'

'বাহ্, বাহ্! ব্রজেনের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে? ভেরি গুড ভাগনেবাবু।'

'একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে মামাবাবু। আপনার হেল্প চাই।'

'কী হেল্প বলো।'

'একটু আগে বিপিন হালদারের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এসেছে।'

'বুঝেছি। আর তাতে তোমরা দেখেছ, যে বিষ নরেন মিত্তিরের বডিতে পাওয়া গেছে, সেই একই বিষ এই বিপিন হালদারের ফরেনসিক রিপোর্টেও উপস্থিত, তাই তো?'

'একদম মামাবাবু। বুঝতেই পারছেন, বিষয়টা নিয়ে ডিপার্টমেন্টে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুটো খুনে একই মার্ডার ওয়েপনের উপস্থিতি বড়কর্তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। দুটো খুনের মধ্যে শুধু যে কোনও কানেকশন নেই তাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে দুটো খুনেরই কোনও মোটিভও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বয়ং হোম সেক্রেটারি আমাকে ফোন করে একবার খবর নিয়েছেন। বড়কর্তাদের আশঙ্কা উই হ্যাভ আ ম্যানিয়াক সিরিয়াল কিলার অ্যামং আস। অ্যান্ড হি ইস ইনটেলিজেন্ট প্লাস রিসোর্সফুল এনাফ টু হ্যাভ দ্যাট পয়জনাস এলিমেন্ট অ্যাট হিস ডিসপোজাল।'

'না হে মনোজ। তোমাদের একটা ভুল হচ্ছে। নরেন মিত্তির আর বিপিন হালদারের খুন একেবারে একই সূত্রে বাঁধা। বড় সাহেবদের বলে দাও যে এটা কোনও সিরিয়াল কিলিং-এর কেস নয়, এ ব্যাপারে ওঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'বলছেন?'

'অফ কোর্স। আমি এও বলছি যে এসবের পেছনে একটা ম্যানিয়াক গ্যাং আছে, যারা খুন আর চুরি দুটোতেই সিদ্ধহস্ত। শুধু তাই নয়, তারা টেকনিক্যালি যথেষ্ট আপ টু ডেট। এদের একটা কোনও উদ্দেশ্য আছে যেটা আমরা বুঝতে পারছি না, মানে খুনের মোটিভটা। সেটা বুঝলেই এই কেস সলভ হয়ে যাবে।'

'মামাবাবু, এই কেসে কি আপনার সাহায্য পাওয়া যাবে?'

'যাবে তো বটেই। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে এই দুজনে কীভাবে খুন হল। তুমি তো একটা কথা মানবে মনোজ, মানুষ খুন করা খুব কঠিন কাজ। ওটা একটা বিশেষ চিন্তাপদ্ধতি এবং ট্রেনিং-এর মধ্যে দিয়ে আসে। যারা এভাবে মানুষ খুন করে তাদের একটা খুনের হিস্ট্রি থাকে। এবং সেই সব হিস্ট্রি শিটারদের খোঁজখবরও পুলিশের কাছে থাকে। আমি জানতে চাই এই খুন দুটোর পদ্ধতি আর এই ধরনের খুন আর কবে কবে কোথায় কোথায় হয়েছে তার মধ্যে একটা তুলনামূলক স্টাডি। তোমার ডিপার্টমেন্টে আছে কেউ এমন?'

'একজনই আছেন মামাবাবু। আর তাকে আপনি খুব ভালো করে চেনেনও।'

'কে মনোজ?'

'অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পাল। শুনেছি তিনিও নাকি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে আছেন।'

* * *

মনোজ চাকলাদার গম্ভীরমুখে বললেন, 'মিস্টার পাল, শুরু করুন।'

অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পাল প্রবীণ মানুষ। সদাপ্রসন্ন মানুষটির মুখে সর্বদাই

জর্দাপান থাকে। কিন্তু এখন তিনিও খুব গম্ভীর হয়ে রয়েছেন।

'দেখুন স্যার, ওপরমহলের চাপে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে রেখে আমাকে সবার আগে বিপিন হালদারের ডেডবডির ফরেনসিক করতে হয়েছে। আর আমি শিওর যে বিপিন হালদার আর নরেন্দ্রনাথ মিত্রর হত্যার ধরন সম্পূর্ণ এক।

দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ার কারণে। বিষ ইনজেক্ট করা হয়নি, কারণ বডিতে কোনও নিডল পুশ করার চিহ্ন নেই। ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়নি। অথচ বিষ রক্তে মিশেছে। কী করে মিশেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে দুজনের শরীরেই হাই মাত্রার নিকোটিনের প্রেজেন্স। মারা যাওয়ার আগে দুজনেই প্রচুর সিগারেট বা সিগার জাতীয় কিছু খেয়েছেন। অথচ আমরা জানতে পেরেছি যে কেউই খুব একটা ধূমপান করতেন না। করলেও তাতে ব্লাড স্ট্রীমে এত নিকোটিন মেশার কথা নয়।'

শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিষটা কী সেটা বোঝা গেছে নিশ্চয়ই।'

অস্বস্তির সঙ্গে একটু নড়েচড়ে বসলেন পালমশাই। 'সেটাই আমাদের অবাক করছে সবচেয়ে বেশি। এ আমাদের চেনা কোনও বিষ নয়। অতি দ্রুত রক্তে মিশেছে আর নার্ভাস সিস্টেম অচল করে দিয়েছে। ফলে প্যারালিটিক সিজার, এবং শেষমেশ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু।'

'বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বোঝান পালমশাই।'

বটকৃষ্ণ পাল বোঝাতে লাগলেন।

খুন করার জন্য সচরাচর কিছু বিশেষ ধরনের বিষ ব্যবহার করা হয়। যেমন সায়ানাইড, আর্সেনিক, মার্কারি, স্ট্রিকনিন, অ্যাকোনাইট, অ্যাট্রোপিন, ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কাজ করে সায়ানাইড। সায়ানাইডের থেকেও একটি বিষাক্ত বিষ আছে অবশ্য, নাম টিটিএক্স বা টেট্রোডক্সিন। এটি প্রধানত পাফার ফিশ বা কিছু বিশেষ সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়।

কাজ করার ধরন অনুসারে বিষ প্রধানত তিন ধরনের হয়, নিউরোটক্সিন, সাইটোটক্সিন আর হেমোটক্সিন। এর মধ্যে সবচেয়ে তীব্র এবং সবচেয়ে দ্রুত কাজ করে নিউরোটক্সিন।

নরেন মিত্তির আর বিপিন হালদারের রক্তে একই ধরনের নিউরোটক্সিন বিষ পাওয়া গেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তার নেচারটা এতই অদ্ভুত যে চেনা পরিচিত কোনও বিষের সঙ্গে তার মিল নেই।'

'খুনের সময় জানা গেছে নিশ্চয়ই?'

'রিগর মর্টিস দেখে আন্দাজ করা যায় যে মোটামুটি রাত ন'টা নাগাদ মারা গেছেন।'

'আর বিষটা অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে কখন?'

'সেটা বিষের প্রকৃতি না জানলে বলাটা একটু চাপের। বিষের কার্যক্ষমতা মাপা হয় মিডিয়ান লিথাল ডোজ বা এলডি ফিফটি নামের একটি ইউনিট দিয়ে। প্রতিটি বিষের একটি নির্দিষ্ট এলডি ফিফটি ভ্যালু আছে। তাই কী বিষ, আর তার

টক্সিসিটি না জানা গেলে কতক্ষণ আগে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে সেটা বলা মুশকিল।

'আর বাসনপত্র, ফার্নিচার এসব থেকে কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'আছে। সবই মিত্তিরমশাইয়ের নিজের এবং ওঁর সহকর্মী বা কাজের লোকেদের। অচেনা কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।'

'বাড়ির বাইরে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল না?'

'ওয়ার্কশপে আছে। বাড়ির মধ্যে নেই। শুধু সদর দরজার ওপরে একটা ক্যামেরা আছে। তাতে যাদের আসা যাওয়ার কথা, তাদের ভিডিও আছে। যেমন রান্নার মাসি, ওঁর দুই সহকর্মী, ড্রাইভার ইত্যাদি। অতিরিক্ত আছে আরও একজনের আসার ভিডিও, বিপিন হালদারের। সে এগারোটায় ঢোকে, বারোটায় বেরিয়ে যায়। অতক্ষণ সে ভেতরে কী করছিল সে একমাত্র তা নিজে আর মিত্তিরমশাই জানতেন।'

'হুম। তা বিপিন হালদার আর নরেন মিত্তিরের বডি আছে কোথায় এখন?'

'বিপিন হালদারের বডি তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে বোধহয় দাহসংস্কারও হয়ে গেছে। আর নরেন মিত্তিরের বডি মর্গে।'

'কেন? বডি এখনও মর্গে কেন?'

এবার উত্তর দিলেন মনোজ চাকলাদার, 'কারণ কাল রাত থেকে কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে মামাবাবু। একজন মহিলা ফ্রান্স থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি দাবি করছেন যে তিনিই নরেন মিত্তিরের ডিভোর্সড ওয়াইফ। একই সঙ্গে নরেন মিত্তিরের ভাই, যিনি ইউ কে-তে থাকেন, এবং এতদিন দাদার কোনও খোঁজ রাখতেন না, তিনিও এসে বডি দাবি করছেন।'

'শুধু বডি না সঙ্গে সম্পত্তিও?'

মনোজ চাকলাদার অর্থপূর্ণ হাসলেন।

'তা এঁরা খবরটা পেলেন কোথা থেকে?'

'রাজকুমার মণ্ডল নামে যে ছেলেটি নরেন মিত্তিরের ফ্যাক্টরিতে কাজ করত, তার কাছেই নাকি মিত্তিরমশাই এই দুজনের ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছিলেন। সেই ছেলেটিই দুজনকে ফোন করে।'

'হুম। তোমরা ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'মনু আজ কথা বলতে যাবে। যদিও নরেন মিত্তিরের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা পুলিশের হয়েই গেছে, তবুও আমরা চাইছি আপনিও মনুর সঙ্গে থাকুন। ও, বাই দ্য ওয়ে, আমরা এক ভদ্রলোককে ট্রেস করতে পেরেছি, যিনি দিল্লি থেকে এসেছেন, এবং বিভিন্ন সূত্রে নরেন মিত্তিরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। ভদ্রলোক তাজ বেঙ্গলে উঠেছেন। আমরা রিকোয়েস্ট করেছি আমাদের না জানিয়ে যেন শহর না ছাড়েন।'

'বাহ্, বাহ্! কেস তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি। তা সবার সঙ্গেই তো দেখা করতে হবে এক এক করে। আর এডিজি সাহেব, কতগুলো জিনিস একটু জোগাড় করে রাখতে পারবেন?'

'বলুন মামাবাবু।'

'এক, নরেন মিত্তির আর বিপিন হালদারের গত এক মাসের মোবাইল কল রেকর্ড চাই। সঙ্গে রাজকুমার, সুলতানার আর নরেন মিত্তিরের কাজের লোকদেরও। দুই, বিপিন হালদারের দোকান কি পুরোই সাফ করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা?'

'নাহ, অনলি সাম পারফিউম'স। আন্দাজ করছি নরেন মিত্তিরের ফ্যাক্টরি থেকে আসা শিশিগুলোই চুরি হয়েছে।'

'বেশ। তাহলে দোকানের বিলবইটা আমার চাই। দোকানে আসা লেটেস্ট স্টক থেকে কাকে কাকে বিপিন নরেন মিত্তিরের পারফিউম বিক্রি করেছিল সেটার একটা আন্দাজ চাই। ক্রেতাদের নাম, ফোন নাম্বার, কিছু একটা হলেই হল।'

'বিলবই আমার কাছেই আছে, এক্ষুনি দিতে পারি। আর কিছু?'

'তিন, যে অতিথিরা এসেছেন তাঁদের গতিবিধির সংবাদ চাই। কবে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন, কোথায় কোথায় গেছেন, সব কিছু।'

'ওক্কে মামাবাবু, সব পেয়ে যাবেন। এই নিন বিপিনের দোকানের বিলবই।'

'বেশ। তাহলে চলো মনু, বেরোনো যাক।'

* * *

পুরো রাস্তাটা প্রফেসর মুখার্জি বিপিনের দোকানের বিলবই ভারি মন দিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর একটা ফোন করলেন মনোজ চাকলাদারকে, 'এডিজি সাহেব, তিনজনের ফোন নাম্বার দিচ্ছি। এদের সব্বাইকে গত দশ দিনের মধ্যে বিপিন হালদার নরেন মিত্তিরের বানানো পারফিউম বিক্রি করেছে। এদের সবাইকে ফোন করে এদের কেনা নরেন মিত্তিরের পারফিউমের শিশি কোথায় আছে, কেমন আছে সেসব এক্ষুনি জানা দরকার আমার। একজন হলেন সুমিত লস্কর, বার্জার পেন্টস-এর সেলস হেড। দ্বিতীয়জন হলেন মধুমিতা সান্যাল, সল্ট লেকের সি এ স্কুলের টীচার। আর অন্যজন হলেন গোপাল শিকদার, বাড়ি বেহালার চোদ্দ নাম্বারে। আর একজনের নামও বিলবইতে আছে, তবে তাকে ফোন করে লাভ নেই। তার নাম ব্রজেন পুরকায়স্থ। আমি মিত্তিরমশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাকে কল করছি।'

লেক গার্ডেন্সের যে রাস্তাটা বেঁকে প্রিন্স আনোয়ার শা' রোডে মিশেছে, নরেন মিত্তিরের বাড়িটা সেইখানে। পাড়ার ভেতরে দোতলা বাড়ি। দেখলে বোঝা যায় না যে এর পেছনে একটা ছোট ওয়ার্কশপও আছে।

মনুজেন্দ্রর কথামত রাজকুমার মণ্ডল, সুলতানা নাসরিন, দুই কাজের লোক গোবিন্দ আর শিউলির মা, আর ড্রাইভার যোগেন্দ্র যাদবকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল।

রাজকুমারের বয়েস বত্রিশ। উচ্চতা, গায়ের রঙ, সপ্রতিভতা, সবই মাঝারি। বাড়ি রাজপুরের দিকে। নরেন্দ্রপুরের কেমিস্ট্রি অনার্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট না হলেও বেশ ভালো রেজাল্ট দুটোতেই। বাবা নেই, মা আর এক অবিবাহিতা দিদি আছেন। তাঁরাই রাজকুমারকে বহু কষ্টে

মানুষ করেছেন।

রাজকুমার চাকরিটা পায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে। এত লোকের মাঝে মিত্র স্যার তাঁকেই কেন পছন্দ করলেন সেটা জানে না সে, তবে রাজকুমার এটুকু বলতে পারে তার কাজ নিয়ে স্যারকে কোনওদিন অসন্তুষ্ট হতে হয়নি।

সুলতানার বয়েস তিরিশ। তার বাবা ডাক্তার, মা গৃহবধূ। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারের একমাত্র মেয়ে সে, বাড়ি কড়েয়া রোডে। তার গ্র্যাজুয়েশন স্কটিশ চার্চ থেকে, মাস্টার্স প্রেসিডেন্সি। সুলতানা ফর্সা, সুলতানাকে দেখতে ভালো, সুলতানার গজদাঁত আছে আর সুলতানা হাসলে মনে হয় যেন চারিপাশটা আলো হয়ে গেল।

সুলতানাও চাকরি পায় বিজ্ঞাপন দেখে। তার অবশ্য শখের চাকরি। ড্যাডির কাছ থেকে হাতখরচ নিতে তার লজ্জা লাগে বলে এই জবটা করছে সে।

মনুজেন্দ্র সবার সঙ্গে প্রফেসর মুখার্জির আলাপ করিয়ে দিল। তারপর বলল, 'চলুন স্যার, আগে বাড়িটা আর ওয়ার্কশপটা দেখে নিই।'

বাড়ির একতলায় ড্রয়িংরুম, রান্নাঘর, গেস্টরুম আর বাথরুম। দোতলার প্রায় পুরোটা জুড়েই অত্যাধুনিক ল্যাব। প্রফেসর মুখার্জি ল্যাবে ঢুকলেন বটে, তবে প্রায় কিছুই চিনলেন না। রাজকুমার আর সুলতানা সঙ্গে ছিল, তারাই যন্ত্রপাতিগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল এক-এক করে। সবই বিদেশি এবং অত্যাধুনিক টেকনলোজির মেশিন। প্রফেসর মুখার্জি আন্দাজ করলেন যে এই ঘরে যা যন্ত্রপাতি আছে তার দাম সব মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকার কম হবে না।

দোতলার একপ্রান্তে একটিই ঘর। নরেন মিত্তির সেই ঘরে থাকতেন। একটি কুইন সাইজ বেড, দেওয়ালে গাঁথা ওয়ার্ড্রোব, আয়না, ড্রেসিং টেবিল আর একদিকের দেওয়ালজোড়া বই রাখার র‍্যাক, এছাড়া কিছু নেই। সঙ্গে অ্যাটাচড টয়লেট।

প্রফেসর মুখার্জি টয়লেট দিয়ে শুরু করলেন। বেসিনের ওপর একটা কাচের গ্লাসে টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ রাখা। পাশে লিক্যুইড হ্যান্ডওয়াশ, বডিওয়াশ আর লুফা। বেসিনের ওপর একটা আয়না। তার পাশে একটা ছোট্ট কাঠের স্টোর ক্যাবিনেট। তার মধ্যে শ্যাম্পু, শেভিং সেট, ডেটল এসব রাখা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে এলেন প্রফেসর মুখার্জি। বিছানায় টান টান করে পাতা রয়েছে নিভাঁজ বেডকভার। ওয়ার্ড্রোব খুলে দেখলেন জামা প্যান্ট কোট জ্যাকেট মোজা আন্ডারগার্মেন্টস একদম যথাযথ জায়গায় পরিপাটি সহকারে সাজানো। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা ট্রেতে চিরুনি, চুলের ক্রিম, আর বডিলোশন রাখা।

চারিদিকে তাকিয়ে প্রফেসর মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, 'বেশ পরিপাটি ঘর তো। কে দেখাশোনা করত?'

সুলতানা উত্তর দিল, 'ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ গোবিন্দদা-ই করে। তবে স্যার নিজেও খুব পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। বাড়ির কোথাও ঝুল, ধুলো, ময়লা এসব একদম বরদাস্ত করতেন না।'

'হুম। আর বাকি কে কী কাজ করে?'

'ঘরদোর ঝাড়াপোঁছা তো বললামই। রান্নাবান্নার ডিউটি শিউলির মায়ের। দুপুরের লাঞ্চ স্যার বাড়িতেই করতেন। আমরাও স্যারের সঙ্গেই লাঞ্চ করতাম। ইন্টারভিউয়ের

সময়েই স্যার বলে দিয়েছিলেন যে ওঁর সঙ্গেই লাঞ্চ করতে হবে। আর গাড়ি চালায় যোগেনদা। যোগেনদাকে বাদ দিয়ে, বাকি সবাই যবে থেকে স্যার দেশে ফিরেছেন, তবে থেকে স্যারের সঙ্গে আছি।'

'তোমাদের স্যার দেশে ফিরেছেন কবে?'

'আজ থেকে বছর আটেক আগে। তারপর ওই ল্যাব আর ওয়ার্কশপ তৈরি করতে বছর দুয়েক সময় নেন। আমরা স্যারের টিম জয়েন করি তখনই। সেই থেকে স্যারের ওয়ার্কশপ আমরাই সামলাই।'

'প্রোডাকশন আর সেলস দুটোই?'

'হ্যাঁ। খুব বেশি তো আর প্রোডাকশন হতো না, তাছাড়া প্রোডাকশন প্রসেস প্রায় অনেকটাই অটোমেটেড। আর সেলস বলতে তো বিপিন হালদারের হাতে মাল ডেলিভার করা আর পয়সা গুনে নেওয়া। সেও মাসে দু-তিনবারের বেশি নয়। ও আমরা দুজনেই দেখে নিতে পারি।'

'এখানে কি শুধু ওই কাস্টমাইজড পারফিউমই বানানো হতো?'

সুলতানা আর রাজকুমার একে অন্যের মুখের দিকে চাইল। প্রফেসর মুখার্জি লক্ষ্য করলেন দুজনের মুখেই যেন একটা ভয়ের ছায়া চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ দুজনেই পালা করে উত্তর দিচ্ছিল। এবার মনে হল দুজনেই একটু অপ্রস্তুত। তারপর রাজকুমার একটু কেশে বলল, 'না, তা নয়। এমনি পারফিউমও বানানো হতো। ওয়ার্কশপ তো নিয়মিত চলতে হবে। তবে সেও যে খুব বেশি পরিমাণে তা নয়। আর সেও বিপিনদার থ্রুতেই বেচা হতো।'

'হুম। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, এই যৎসামান্য প্রোডাকশন বেচতে বিপিন হালদারের মতো একজন সেলস এজেন্ট দরকার হলো কেন?'

'সে বলতে পারব না স্যার। তবে স্যার সরাসরি কাস্টমার হ্যান্ডল করা একদম পছন্দ করতেন না, বলতেন ওসব পাটোয়ারী দোকানদারি তাঁকে মানায় না। আসলে স্যার লোকজন ভিড়ভাট্টা হই-হট্টগোল একদম সহ্য করতে পারতেন না। আজ অবধি বাড়িতে স্যারের কোনও বন্ধুবান্ধবকে আসতে দেখিনি। একমাত্র কাস্টমাইজড পারফিউমের প্রসপেক্টিভ কাস্টমার ছাড়া আর কাউকে এন্টারটেইন করতেন না, তাও আবার তার ব্যাকগ্রাউন্ড রীতিমতো চেক করে। এছাড়া আর কারো সঙ্গে স্যার দেখা করতে চাইতেন না। এ বিষয়ে স্যারের, যাকে বলে রীতিমতো ওসিডি ছিল।'

'তা আপনাদের স্যার চেক করতেন কীভাবে?'

আবার দুইজনের সেই চোখ চাওয়াচাওয়ি, অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর সুলতানা বলল, 'সে বলতে পারব না স্যার। তবে এটুকু বলতে পারি, স্যার কম্পিউটার, নেট সার্ফিং, মানে টোটাল সাইবারওয়ার্ল্ড বিষয়ে মাস্টার লোক ছিলেন। ল্যাপটপে বসেই লোকের নাড়িনক্ষত্র বের করে নিতে পারতেন। কী করে পারতেন বলতে পারব না।'

'মানুষ হিসেবে কেমন লোক ছিলেন আপনাদের স্যার?'

'পরিশ্রমী, খুঁতখুঁতে এবং শৌখিন লোক ছিলেন। একটু নাক উঁচু ভাব ছিল। টাকার অভাব ছিল না। বেশ দামি জামাকাপড়, স্যুট, টাই, আফটারশেভ লোশন,

পারফিউম ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। তবে ধনী হলে কী হবে, টাকাপয়সার ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন, কোনও ধারবাকির কারবারে বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য দেওয়ার ব্যাপারেও সেই ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতেন। আমাদের সবাইকে ঠিক টাইমে টাকা দিতেন, আর বলতে নেই, মাইনে খারাপ দিতেন না। কথা বলতেন কম, আলাদা ডিগনিটি মেইনটেইন করে চলতেন। আর পারফিউমারির ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান ছিল স্যারের, প্রায় চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া বললেই চলে। আমরা কত কিছু যে শিখেছি স্যারের থেকে...'

'বেশ। এবার বলো তো, মারা যাওয়ার দিন নরেন মিত্তির কী কী করেছিলেন? জানি পুলিশ একপ্রস্থ এজাহার নিয়েই গেছে। তবু আরেকবার শুনি।'

এবার রাজকুমার উত্তর দেয়, 'কিছুই না স্যার। যেদিন মারা যান, তার আগের দিন একজন প্রসপেক্টিভ কাস্টমার এসেছিলেন। আমরা দেখিনি, স্যারই জানিয়েছিলেন। সেই থেকে স্যারকে একটু অস্থির আর অন্যমনস্ক লাগছিল। পরদিন আমরা ওয়ার্কশপে আসি। স্যার নিজের ল্যাবে ছিলেন। বিপিন হালদার এসেছিল ডেলিভারি নিতে। স্যার একবার ওকে নিজের ঘরে ডেকে নেন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লেগেছিল। কারণ এর আগে স্যার যতবার বিপিনদার সঙ্গে দেখা করেছেন, ওয়ার্কশপেই করেছেন।

আধঘণ্টা বাদে বিপিন ওয়ার্কশপে এসে ওর ডেলিভারি নিয়ে চলে যায়। আমরাও সন্ধেবেলা ওয়ার্কশপ বন্ধ করে স্যারকে গুডবাই করে চলে যাই। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে গোবিন্দদার ফোনে। আমি ডাক্তার শাসমলকে নিয়ে দৌড়ে যাই, আমাদের পাড়ারই লোক। বাকিটা তো জানেনই।'

'গুড। এবার বাকিদের সঙ্গে কথা বলে নিই একবার।'

প্রথমে কথা হল গোবিন্দর সঙ্গে। মেদিনীপুরের লোক, বয়েস পঞ্চাশের ওপর। যবে থেকে নরেন মিত্তির দেশে ফিরেছেন তবে থেকে সে দাদাবাবুর সেবায় আছে। সকাল আটটা থেকে সন্ধে ছ'টা, এই ছিল তার কাজের সময়। বাড়ি সাউথ সিটির পাশে, কাটজুনগরে। বিবাহিত, একটিমাত্র ছেলে আছে, টোটো চালায়।

দাদাবাবু কেমন লোক ছিলেন? ভালো লোক, চুপচাপ, বেশি কথা বলতেন না। সারাদিন ল্যাবেই কাটাতেন প্রায়। কড়া কফি খেতেন, আর মাঝেমধ্যে একটা দুটো সিগারেট। না, আর কোনও নেশাভাং করতেন না দাদাবাবু। খুব একটা বাইরে বেরোতেন না, গেলেও গাড়িতেই যাতায়াত করতেন। কারো সঙ্গে সহজে দেখা করতেন না, মাঝেমধ্যে দু-একজন খদ্দের 'সিটিং' দিতে আসতেন, ব্যস। এর বেশি আর কেউ আসত না বাড়িতে। কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না বাবুর। রাত দিন নিজের ল্যাপটপ আর বই নিয়েই থাকতেন।

'মারা যাওয়ার দিন কে কে এসেছিল দাদাবাবুর কাছে?'

'বলতে পারব না বাবু, আমি সেদিন ছুটি নিয়েছিলাম। শিউলির মা বলতে পারবে। তার আগেরদিন এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বটে, 'সিটিং' দিতে। লোকটা বেশ হাট্টাকাট্টা, হাইটে আমাদের মতোই, চৌকো চোয়াল আর চোখে সানগ্লাস পরেছিল। মাথায় টুপি পরে ছিল বলে মুখটা ভালো করে দেখতে পাইনি। আমি

ওপর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাই। অনেকক্ষণ ছিল, অন্তত দুবার কফি নিয়ে যেতে হয় আমাকে। কথাবার্তা যা শুনেছি, বাবুর সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলছিল লোকটা।'

শিউলির মায়ের বয়েস ষাটের কোঠায়। তারও প্রায় সাড়ে সাত বছর হয়ে গেল দাদাবাবুর সংসারে। শিউলির মায়ের কাজ ছিল সকালবেলার জলখাবার আর দুপুরের রান্না, একই সঙ্গে রাতের রান্নাও।

দাদাবাবু বেশি খেতেন না। রাতে তো দু-পিস পাঁউরুটি আর একবাটি স্যুপ খেতেন। বরং খেতে ভালোবাসে সুলতানা দিদি আর রাজুদা। ওদের আবদারেই শিউলির মাকে নানা রকম পদ বানাতে হতো। আর হ্যাঁ, দাদাবাবু খুব কফি খেতেন। শিউলির মাকে বাড়ি যাওয়ার আগে এক ফ্লাস্ক ভর্তি কফি বানিয়ে রেখে যেতে হতো।

মারা যাওয়ার দিন শিউলির মায়ের থাকার সময়ে একজনই এসেছিল দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, বিপিন হালদার। পিঠে একটা ব্যাগ ছিল, আজকাল ছেলেছোকরারা পিঠে যেমন ব্যাগ নিয়ে ঘোরে, তেমন। একটু পর সে চলে যায়। তারপর দাদাবাবু, রাজুদা আর সুলতানা দিদি খেতে বসেন। খাওয়া শেষ হলে আমি এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করে, টেবিল মুছে, থালা বাসন ধুয়ে তুলে রাখি। দাদাবাবু ওপরে চলে যান, আর রাজুদা সুলতানাদি ফ্যাক্টরিতে।

আগের দিন? হ্যাঁ, আগের দিন একজন সিটিং দিতে এসেছিলেন বটে, টুপি পরে। তবে তাকে রান্নাঘর থেকে একঝলকই দেখেছে শিউলির মা। তার বেশি আর কিছু না।

ড্রাইভার যোগেন্দ্র যাদবকে জিগ্যেস করেও নতুন কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। তার বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, গায়ে গতরে বেশ গাঁট্টাগোট্টা আর ছোটছোট কদমছাঁট চুল। যোগেন্দ্রর দেশের বাড়ি বিহারের নওদা জিলায়। তবে জন্ম ইস্তক কলকাতার কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে মানুষ। তার বাপ ধর্মেন্দ্র যাদব কলকাতা কর্পোরেশনের জমাদার ছিলেন। যোগেন্দ্র বিশেষ লেখাপড়া করেনি। তার শখ হচ্ছে সিনেমা আর ফেসবুকের রিলস দেখা।

যোগেন্দ্র নরেন মিত্তিরের ডিউটি জয়েন করেছে মাস দুয়েক হল। তার আগে সে পার্ক সার্কাসে আল্লারাখা শেখের ড্রাইভারি করত। শেখ সাহেব কলকাতার বাস চুকিয়ে মাস তিনেক আগে দুবাই চলে গেছেন। মাসখানেক সে বসেই ছিল। তারপর সে খবর পায় যে বাবুর আগের ড্রাইভার ভজহরি হঠাৎ করে ডিউটি ছেড়ে দিয়েছে। পেরাইভেট গাড়ির ড্রাইভারদের মধ্যে এসব খবর চালাচালি হতেই থাকে। সেখান থেকেই সে খবর পেয়ে বাবুর কাছে দরবার করতে আসে।

মারা যাওয়ার দিন আর তার আগের দিন মালিক কোথাও বেরোননি। তার বাইরে বেশি সে কিছু জানে না। তার ডিউটি হচ্ছে রোজ সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে মালিকের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে গাড়ি ধুয়েমুছে রেডি রাখা। তারপর বেরোবার হলে মালিক বেরোতেন, নইলে সন্ধে ছ'টা নাগাদ সে গাড়ির চাবি মালিককে ফেরত দিয়ে বাড়ি চলে যেত। বাকি সময়টা সে হয় গাড়িতে বসে মোবাইল দেখত, অথবা বাইরে বেরিয়ে বাড়ির কাছের একটি চায়ের ঠেকে দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে

খোশগল্প করত।

যোগেন্দ্র যে একজন মোবাইলনেশাড়ু মানুষ, সে তার কথাবার্তা ভাবভঙ্গিতেই প্রকাশ পাচ্ছিল। একে তো কথা বলতে বলতে বারবার মোবাইল দেখছিল। তার ওপর তার মোবাইলটিও ভারি মনোহারী। মোবাইলের ব্যাককভারে আবার সিংহের ছবি আঁকা। যদিও ব্যাককভারের রঙ চটে গেছে, মাথার দিকটাও একটু ভাঙা। প্রফেসর মুখার্জি আর দু-একটা প্রশ্ন করে হাল ছেড়ে দিলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'গাড়ির চাবি কার কাছে?'

'জি রাজুদার কাছে।'

চমকে উঠল মনুজেন্দ্র, 'রাজুদার কাছে মানে? ও জমা দেয়নি?'

যোগেন্দ্র ভারি উদাস মুখে বলল, 'সে আমি কী করে বলবো? এখন তো আমার মালিকও নেই। কাল থেকে কার কাছে আমার রোটি বাঁধা আছে জানি না।'

যোগেন্দ্র চলে গেলে প্রফেসর মুখার্জি মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'খুনটা কোথায় হয়েছে, একটু দেখাও তো মনু।'

ড্রয়িংরুমটাও বেশ সাজানো গোছানো। একটা থ্রি সিটার সোফা, দুপাশে দুটো সিঙ্গল সিটার। মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল। দেওয়ালে একটা পঞ্চান্ন ইঞ্চির টিভি লাগানো।

'বডি পড়ে ছিল এই থ্রি সিটার সোফাটার পায়ের কাছে। পরনে বারমুডা আর টি-শার্ট। চোখমুখ দেখে বোঝা যায় প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন ভদ্রলোক।'

'শরীরে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল?'

'না। মানে কেউ চেপে ধরে বিষটা প্রয়োগ করেনি। যদি সোফাতে বসা অবস্থাতেই তাঁর ওপর বিষটা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সেটা কীভাবে করা হল সেটাও একটা আশ্চর্যের বিষয়। কারণ দেখাই যাচ্ছে যে ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে বেশিদূর যেতে পারেননি। মানে বিষটা, খুব তাগড়া বিষ বলতে হবে।'

'তার মানে সবাই চলে যাওয়ার পর এমন কেউ এসেছিল, যাঁকে নরেন্দ্রনাথ আগে থেকেই চিনতেন। নইলে অমন কেতাদুরস্ত মানুষটি যার তার সামনে বারমুডা পরে থাকতেন না।'

'সে আর বলতে! এবং তিনি খুবই নির্লোভ সৎ মানুষ বলতে হবে। খুন করার পর জাস্ট ল্যাপটপ আর মোবাইল নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছেন, আর কিচ্ছুটি নেননি।'

'হুম। কিন্তু তার আগে দরজার বাইরে লাগানো সিসিটিভি বন্ধ করল কে? নরেন্দ্রনাথ নিজেই করেননি তো?'

'কেন করবেন? করে তাঁর লাভ?'

'হয়তো রেকর্ড রাখতে চাননি, কে আসছে। বাই দ্য ওয়ে, ভদ্রলোকের চরিত্র কেমন ছিল কিছু খোঁজ নিয়েছ? মানে সেদিন কোনও গোপন অভিসারিকার আগমন ঘটেনি তো?'

'কাম অন স্যার! আপনার ওই ভিক্টোরিয়ান মরাল মেসোমশাইগিরিটা ছাড়ুন

প্লিস। একজন ডিভোর্সি একলা মানুষের যদি কোনও গোপন অভিসারিকা থাকেই, তাতে তাঁর চরিত্র খারাপ হয়ে যায় কোন যুক্তিতে শুনি?'

কথা বলতে বলতে দুজনে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'এদের সব স্টেটমেন্ট করোবোরেট করা হয়েছে মনু?'

'হ্যাঁ স্যার। সব চেক করে দেখেছি, সবাই সত্যি বলছে। তবুও এদের কলকাতা ছাড়তে বা অন্য কোথাও কাজ করতে না যেতে বলেছি।'

'বাই দ্য ওয়ে, বাড়ির চাবিটাবি কার কাছে?'

'আপাতত গোবিন্দর কাছে একসেট আছে। আর এক সেট স্থানীয় থানায় জমা রাখা আছে। গোবিন্দকে স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা ফোনে অ্যাভেলেবল থাকে, ডাকলেই যেন পাওয়া যায়।'

'বটে? তা বাপু এই যে এতগুলো লোক, এদের এই কারেন্ট মাসের মাইনে কে মেটাবে? আর যদ্দিন না কেসের সুরাহা হয় তদ্দিনই বা এদের দেখভাল করবে কে?'

মনুজেন্দ্র গোমড়া মুখে বলল, 'সে আমি কী করে বলব। আমি হুকুমের চাকর।'

'বুঝেছি। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলো তো, এদের সবার, ইনক্লুডিং নরেন মিস্ত্রির আর বিপিন হালদার, সবার মোবাইলের কল লিস্ট চেক করেছ? কল লিস্ট কিন্তু মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকেই চেক করবে, ওদের মোবাইল থেকে নয়।'

'ইয়েস স্যার, আমি দুটোই চেক করতে দিয়েছি। মানে ওদের নিজেদের মোবাইলের কল লিস্ট আর সার্ভিস প্রোভাইডারের পক্ষ থেকে পাওয়া কল লিস্ট। যদি কোনও মিসম্যাচ থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে কেউ নিজের কল লিস্ট ট্যাম্পার করেছে।'

প্রফেসর মুখার্জি মনুজেন্দ্রর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন 'সাব্বাস মনু। ওই জন্যই বলেছিলাম মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে কল লিস্ট চেক করতে। যাক, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক।'

মনুজেন্দ্র বেশ একটা ঝলমলে হাসি উপহার দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্কস স্যার। সাইবার ক্রাইম দিনরাত এক করে কাজ করছে। আজকালের মধ্যেই রিপোর্ট চলে আসবে।'

'ভেরি গুড মনু। এবার যে তিন প্রবাসী বঙ্গসন্তান সিনে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করো।'

'করছি স্যার। তবে আজ হবে না। কাল মিটিং ফিক্স করছি। আর কিছু?'

'একবার বিপিন হালদারের বাড়ি যাই চলো। তার আগে একবার ভাগনেবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিই, দাঁড়াও।'

মনোজ চাকলাদার ফোন তুলেই বললেন 'খোঁজ পেয়েছি মামাবাবু। এখনই বলব কি?'

'হ্যাঁ এডিজি সাহেব, বলুন।'

'ব্রজেন পুরকায়স্থর শিশি যে চুরি গেছে সে তো জানেনই। সুমিত লস্কর পারফিউমের শিশিটা তাঁর ট্র্যাভেল ব্যাগে নিয়ে ট্যুরে যাচ্ছিলেন বর্ধমান। মাঝখানে শক্তিগড়ে টিফিন করতে নেমেছিলেন। সেখানে তাঁর ট্রাভেল ব্যাগটি গাড়ি থেকে কেউ তুলে নিয়ে পালায়। মধুমিতা সান্যাল তাঁর পারফিউমের শিশি খুঁজে পাচ্ছেন না। ওঁর ধারণা কাজের মেয়েটি চুরি করেছে। বলা বাহুল্য, মেয়েটি তা অস্বীকার করেছে। আমাদের ধারণা মেয়েটি ঠিকই বলছে। কারণ চাইলে ও আজ অবধি মধুমিতা দেবীর গয়না, টাকা, মোবাইল, ঘড়ি, ট্যাব অনেক কিছুই চুরি করতে পারত, কিন্তু ম্যাডাম স্বীকার করছেন যে আজ অবধি ওঁর অন্য কিছু খোওয়া যায়নি।'

'স্বাভাবিক। আর গোপাল শিকদার?'

'এইখানে একটা টুইস্ট আছে। গোপাল শিকদার একটি পাক্কা নেশাড়ু ছেলে, বড়লোকের স্পয়েল্ট ব্র্যাট বললেই হয়। ছোটবেলা থেকেই সে বিবিধ তরল এবং বায়বীয় নেশায় অভ্যস্ত। তার ধারণা সে একটি বিশিষ্ট প্রতিভা, এই পোড়া বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা বিশেষ। সে নাকি এখন অর্গানিক ফার্মিং, থাই নৃত্য এবং আফ্রিকার উলুলু আদিবাসীদের হাতিশিকারের পদ্ধতি নিয়ে এক বিশেষ ধরনের প্রোটেস্ট কালচার তৈরি করছে। বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটির খ্যাপাটে ছেলেমেয়েদের দল তার নিত্যসঙ্গী।'

'বাহ। তা এই অসাধারণ প্রতিভাটি এখন কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'অ্যাঁ? হাসপাতালে? কেন?'

'ছোকরা বড়ই শৌখিন। দামি স্কচ, দামি গাড়ি, দামি পারফিউম ছাড়া তেনার চলেই না। ইনি নরেন মিস্তিরের কাছ থেকে স্পেশ্যাল পারফিউম বানিয়ে বিপিন হালদারের দোকান থেকে হপ্তাখানেক আগে ডেলিভারি নেন। দিন চারেক আগে নেশার ওভারডোজের কারণে ছোকরাকে নিজের ঘরে বেহুঁশ অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর তাকে বেলভিউতে ভর্তি করা হয়েছে।'

'আর ওই পারফিউমের বোতলটা?'

'সে খবরও নিয়েছি। ছোকরা হাসপাতালে নিজের সব শখের জিনিস নিয়েই এসেছে। পারফিউম তো ছোটখাটো জিনিস। ক্রিম, হেয়ার জেল, মায় শখের গিটারটি অবধি।'

'তা বেলভিউয়ের মতো খানদানি হাসপাতাল সেসব অ্যালাউ করল?'

'মামাবাবু, আপনি ওর বাপ যোগেন শিকদারকে চেনেন না! পার্টির মস্ত বড় হোতা। তার ওপর বেহালার অদ্ধেক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের পিছনে যোগেন শিকদারের টাকা কথা বলে। এহেন লোকের ছেলেকে কে ঘাটাবে?'

'ভাগনেবাবু, এবার যে কথাটা বলছি, সেটা মন দিয়ে শোনো। ওই গোপাল শিকদারকে যে করেই হোক বেলভিউ থেকে তুলে নিজেদের কাস্টডিতে নাও। সম্ভব হলে আজকেই, এখুনি। আর হ্যাঁ, ওর সঙ্গের যাবতীয় লাগেজসহ। এটা খুব খুব ইম্পর্ট্যান্ট।'

'ওক্কে স্যার। অ্যাজ ইউ উইশ।'

ফোনটা রেখে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'কেস কিন্তু গণ্ডগোলের মনু।'

'সে তো বটেই।'

'আজ যখন নরেন মিস্তিরের ঘরে গেছিলাম, একটা জিনিস খেয়াল করেছিলে?'

'কী স্যার?'

'এমন শৌখিন লোক, পারফিউম বিশেষজ্ঞ, নিজেও পারফিউম ব্যবহার করেন, অথচ তাঁর ঘরে একটাও পারফিউম বা আফটারশেভের বোতল নেই কেন?'

* * *

বিপিনের বাড়ি রাণীহাটি মোড় থেকে একটু দূরে। পাঁচলা যাওয়ার রাস্তায় কিলোমিটার চারেক যাওয়ার পর বাসুদেবপুর বলে একটা আধা গ্রামে।

গাছপালা ঘেরা শান্ত পরিবেশ। একাধিক বাড়িতে টালির চাল। বোঝাই যায় যে প্রধানত নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের এলাকা। যদিও ইতিউতি ডিশ টিভির অ্যান্টেনা দেখা যায়। দু-একটা দোতলা বাড়িও উঁকি দিচ্ছে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে।

ছোট ডোবা সাইজের পুকুর পেরিয়ে পুলিশের গাড়ি এসে থামল একটা দোতলা বাড়ির সামনে। আশেপাশের বাড়ি থেকে দুএকজন কৌতূহলী লোক বেরিয়ে এল। তাদেরই একজনকে মনুজেন্দ্র কঠিন স্বরে জিগ্যেস করল, 'এটাই বিপিন হালদারের বাড়ি তো?'

লোকটা ইঙ্গিতে হ্যাঁ বলে সুড়ুত করে কেটে পড়ল। মনুজেন্দ্র আর প্রফেসর মুখার্জি বেড়ার গেট খুলে বাড়িটার উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। মনুজেন্দ্র হাঁক পাড়তে যাচ্ছিল। প্রফেসর মুখার্জি ইশারায় থামিয়ে মিষ্টি করে জিগ্যেস করলেন,'কেউ আছেন?'

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। খালি গা, পরনে লুঙ্গি, চোখে মোটা চশমা। বয়সের ভারে ঝুঁকে আছেন। ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই?'

প্রফেসর মুখার্জি খুব নম্রস্বরে বললেন, 'আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি মেসোমশাই। বিপিনের খুনের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে এসেছি।'

ভদ্রলোক আরও নুইয়ে পড়ে বললেন, 'সে না হয় কথা বলুন। কিন্তু তাতে কি আর ছেলেটাকে ফিরে পাব বাবা?'

সন্তানহারা পিতাকে সান্ত্বনা দিতে নেই। দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পর প্রফেসর মুখার্জিই ভদ্রলোককে দাওয়াতে বসিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

বিপিন ছোটবেলা থেকেই একটু দুরন্ত ছেলে। তবে বখাটে বলতে যা বোঝায় তা নয়। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়া অভ্যেস ছিল। গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালোবাসত। ওকে দোকানে বসাতে প্রথম প্রথম বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছিল ছেলেটা। ব্যবসা চলছিল মন্দ নয়। টাকাপয়সাও আসছিল বেশ। এই তো বাড়িটা সারাই করে দোতলা করার কথা হচ্ছিল, একটা বাইক কেনার কথাও ভাবছিল বিপিন। আমরা ওর জন্য মেয়ে দেখাও শুরু করেছিলাম বিয়ে দেব বলে। কিন্তু ভগবানের চোখে বোধহয় সে সুখ সহ্য হল না।'

বলতে বলতে বুড়ো মানুষটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। প্রফেসর মুখার্জি

একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলেন, 'ওর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল বলে জানেন?'

চোখ মুছে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'আমার ছেলের মতো ছেলে হয় না বাবা। নিজের সন্তান বলে বলছি না। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করার ছেলেই ছিল না। সবসময় মুখে মিষ্টি হাসি। আর কত লোকের বিপদে আপদে যে নিজে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করত তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের একমাত্র ছেলে বাবা। চোখের মণি। কে যে আমাদের এত বড় সর্বনাশ করে গেল...' শব্দ করে কেঁদে উঠলেন বিপিন হালদারের বাবা।

গাড়িতে বসে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'নিউমার্কেট চলো।'

মনুজেন্দ্র আড়চোখে তাকিয়ে দেখল প্রফেসর মুখার্জির চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার প্রফেসর সাহেব? একটু ডিসটার্বড লাগছে মনে হচ্ছে।'

প্রফেসর মুখার্জি চিন্তিত মুখে বললেন, 'একটা পারফিউমের দোকানে এত কী লাভ থাকে মনু? বিপিন তার বাড়ির দোতলা তোলার টাকা, বাইক কেনার টাকা, এসব পাচ্ছিল কোথা থেকে?'

মনুজেন্দ্ররও ভ্রূ কুঁচকে গেল।

গাড়ি যখন সাঁতরাগাছির কাছাকাছি, তখন মনুজেন্দ্র'র মোবাইলে একটা কল এলো। মনুজেন্দ্র কিছুক্ষণ হুঁ হাঁ করে ফোনটা রেখে বলল, 'ইতিমধ্যে আমার টিম একটা কাজের কাজ করেছে স্যার।'

'কী?'

'একটা ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে, নাম মুন্না। ছোকরা লিন্ডসে স্ট্রিটে গাড়ি পার্কিং দেখাশোনা করে। ও জানিয়েছে যেদিন বিপিনকে নিউ মার্কেটে শেষ দেখা যায়, সেদিন ও বিপিনকে খুব সম্ভবত একটা বড় গাড়িতে উঠতে দেখেছিল।'

প্রফেসর মুখার্জি সোজা হয়ে বসলেন, 'মাই গুডনেস। এটা তো বড় খবর হে। ব্যাপারটা খুলে বলো তো দেখি।'

'যেদিন বিপিনের বডি পাওয়া যায় তার আগের রাতের ঘটনা। টাইম ছিল রাত সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। তখন লিণ্ডসে স্ট্রিট জমজমাট থাকার কথা। কিন্তু সেদিন রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বললেই চলে। প্রথম কারণ ছিল দুপুরের প্রবল বৃষ্টি। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সেদিন ওইসময় ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল ম্যাচ ছিল। মুন্না দেখে, বিপিন লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখ থেকে রাস্তা ক্রস করে ওপারে যাওয়া মাত্র বিপিনের পাশে একটি গাড়ি এসে থামে। সঙ্গে সঙ্গে মুন্নার দৃষ্টিকে আড়াল করে একটা টাটা চারশো সাত এসে সিগন্যালে দাঁড়ায়। চারশো সাত চলে যাওয়ার পর মুন্না গাড়িটাকে আর দেখতে পায়নি। এই হচ্ছে মুন্নার ভার্সন।'

'কী গাড়ি? কী কালারের?'

'মুন্না ভালো করে দেখতে পায়নি।'

'স্বাভাবিক। ওই রাস্তায় নিশ্চয়ই সিসিটিভি লাগানো আছে? সেগুলো কাজ করে?'

'নাহ্।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মনুজেন্দ্র, 'কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে কয়েকটা

সিসিটিভি লাগানো হয়েছিল বটে এককালে। তবে তার আদ্ধেক কাজ করে না, বাকি আদ্ধেক থেকে যে ভিডিও পাওয়া যায় তা পাওয়া না পাওয়া সমান।'

'তাহলে?'

'রাস্তার ঠিক মোড়ে একটা এগরোলের দোকান আছে। খোঁজ করে দেখলুম, ওদের যে বোর্ডটা, যেটা ফুটপাথের মাথায় আড়াআড়ি হয়ে ঝোলে, তার গায়ে দুটো সিসিটিভি লাগানো আছে, একটা এমুখো, আরেকটা ওমুখো। আজ দোকানের মালিককে সিসিটিভির ফুটেজসহ ভবানী ভবনে আসতে বলেছি।'

'গ্রেট। এবার একবার বটকৃষ্ণ পালকে ফোনে ধরো তো। কথা আছে।'

অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পাল ফোন ধরেই বললেন, 'যো হুকুম প্রফেসর সাব।'

'আপনারা নরেন মিত্তির আর বিপিনের মারা যাওয়ার সময় যে জামাকাপড় পরা ছিল তার ফরেনসিক রিপোর্টটা একটু আমাকে বলবেন প্লিজ?'

'নাথিং আনইউজুয়াল। নিকোটিনের আধিক্য একটু বেশি, তবে তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আমি তো বলেইছি, যে দুজনের ব্লাড স্ট্রিমে...'

'জামাকাপড়ের কোথায়? শার্টে? না প্যান্টে?'

'আরে, কেউ স্মোক করলে তো জামাতেই থাকবে নিকোটিনের স্টেইন, প্যান্টে থাকবে নাকি?'

'জামার কোথায়?'

'এ তো আজব প্রশ্ন করলেন মুখুজ্জেমশাই। লোকে স্মোক করলে নিকোটিনের স্টেইন তো মুখ, গলা, ঘাড়, এসব জায়গাতেই থাকবে!'

প্রফেসর মুখার্জি একটু দমে গেলেন। তারপর বললেন, 'তাও বটে। আচ্ছা। পরে কথা বলছি।'

ফোন রেখে প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর স্খলিতস্বরে মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'গাড়িটা একটু চাংওয়াতে নিয়ে যাবে ভায়া? একটু বাকার্ডি দিয়ে ড্রাই চিলি চিকেন না খেলে মাথা খুলছে না।'

* * *

ভদ্রমহিলার নাম অলিভিয়া মিত্র। দেখতে যেমন মারকাটারি, পার্সোনালিটি তেমনই মারহাব্বা। মহিলা একটা পার্পল বডিকন ড্রেস পরে গ্র্যান্ড হোটেলের ৩০২ নাম্বার দরজাটা খুলে অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক সুরে বললেন, 'প্লিজ কাম ইন। আজ আমার আরও কিছু কাজ আছে এখানে। আই প্রিজিউম আপনারা বেশি সময় নেবেন না।'

প্রফেসর মুখার্জি যে ক্যাবলামার্কা হাসিটা উপহার দিলেন সেটা যাকে বলে স্বর্গীয়। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে বললেন 'না-না ম্যাডাম, আমরা আপনাকে মোটেও বিরক্ত করব না। জাস্ট কয়েকটা কথা বলেই বেরিয়ে যাব।'

অলিভিয়া মিত্রর পৈতৃক বাড়ি শ্যামবাজারে। বয়সে নরেন মিত্তিরের থেকে এক বছরের ছোট। দুজনে সেন্ট জেভিয়ার্সে একই ডিপার্টমেন্টে পড়তেন, সেখানেই আলাপ। সেই আলাপ আরও গাঢ় হয় বিদেশে একই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে।

বিয়েতে দু-বাড়ির কারোরই অমত ছিল না।

দুজনে চাকরি নেন ফ্রান্সে, আলাদা আলাদা কম্পানিতে। নরেন মিত্তির যোগ দেন একটি বিশ্ববিখ্যাত পারফিউম প্রস্তুতকারক কম্পানিতে, আর অলিভিয়া একটি ফার্মাসিউটিক্যালসে। দুজনের ডিভোর্স হয় বছর দশেক আগে। তার দুবছর পর মিত্তিরমশাই দেশে ফিরে আসেন। অলিভিয়া ওদেশেই থেকে যান। না, দুজনের সন্তানাদি নেই। অলিভিয়া আর বিয়েও করেননি।

কয়েকদিন আগে রাজকুমার মণ্ডল-এর ফোন পাওয়া মাত্র উড়ে এসেছেন অলিভিয়া। 'আমি জানি নরেন্দ্রর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। ইনভেস্টিগেশন তো চলবেই। কিন্তু বডি ক্রিমেশনের দায়িত্ব কাউকে তো নিতে হবে। আমি চাই না ওর বডিটা বেওয়ারিশের মতো জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। হাজার হোক এতদিনের বিবাহিত সম্পর্ক, সেটা তো ভুলে যেতে পারি না।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ইয়ে, মানে শুধু এই জন্য এতদূর এসেছেন, তাতেই আপনি যে কত ভালো মানুষ সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। বলছি যে দু-একটা প্রশ্ন ছিল। রুটিন প্রশ্ন, বোঝেনই তো।'

'বলুন।'

'মিস্টার মিত্রর সঙ্গে আপনার আলাপ, বিয়ে, ডিভোর্স, সবই শুনেছি। কেমন মানুষ ছিলেন আপনার প্রাক্তন স্বামী?'

'খুব রিজার্ভড, ক্লাসি, আর শৌখিন। ওর চরিত্রের ওই ক্লাসি শৌখিন দিকটাই ওকে পারফিউমারির দিকে নিয়ে যায়। আমি যতদিন ওকে দেখেছি, কোনওদিন সস্তা জামাকাপড় পরতে দেখিনি, দামি স্কচ বা সিগারেট ছাড়া খেতে দেখিনি, এমনকী যে পারফিউমটা নিজের জন্য ইউজ করত, সেটার দাম শুনলেও আপনার মাথা ঘুরে যেতে পারে। আর খুব শিভালরাস ছিল। মহিলাদের সম্মান করা, যথাযথ মর্যাদা দেওয়া ওর রক্তের মধ্যে ছিল। কথা বলত কম, কিন্তু যেটুকু বলত ভেবেচিন্তে বলত। আর পারফিউমারি বা ওভারঅল কেমিস্ট্রি সাবজেক্টটার ওপর দখল ছিল দুর্দান্ত। হি ওয়াজ ট্রুলি আ গ্রেট হিউমান বিইং।'

'ইয়ে, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?'

'পারেন, যদি খুব পার্সোনাল না হয়।'

'আপনাদের ডিভোর্সের কারণ কী?'

অলিভিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'মাফ করবেন, এর উত্তর আমি দিতে পারব না।'

প্রফেসর মুখার্জি একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'মিস্টার মিত্র হঠাৎ ওদেশ থেকে সব কিছু ছেড়েছুড়ে কলকাতা ফিরে এলেন কেন?'

'দেখুন ডিভোর্স ব্যাপারটা খুব পেইনফুল। সবাই মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া ওই সময়ে ওর সঙ্গে ওর কম্পানির কিছু গণ্ডগোলও চলছিল। সব মিলিয়ে ও সিদ্ধান্ত নেয় দেশে ফিরে যাবে। কী গণ্ডগোল সে আমাকে জিগ্যেস করবেন না প্লিজ, কারণ আমি জানি না।'

'ওদেশে কি মিস্টার মিত্রর কোনও শত্রু ছিল?'

'নাহ্। অন্তত আমি জানি এমন কেউ নেই। আর থাকলেও তারা এতদূর

এসে খুন করে যাবে না প্রফেসর মুখার্জি, করার হলে ওখানেই করত।'

'কে বা কারা এই কাজ করতে পারে সে নিয়ে কিছু বলতে পারেন?'

'না প্রফেসর মুখার্জি। ডিভোর্স হওয়ার পর আমাদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। ফলে এই বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না।'

প্রফেসর মুখার্জি এবার অন্য রাস্তা ধরলেন, 'মিস্টার মিত্র তো পারফিউম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আপনি কী নিয়ে কাজ করেন জানতে পারি?'

'আমি একজন বায়োকেমিস্ট। আমার স্পেশালাইজেশন হচ্ছে ফার্মাকোলজি, মানে বাংলায় যাকে বলে ওষুধশাস্ত্র। আরও ভালো করে বলতে গেলে কী করে একজন নেশাগ্রস্ত মানুষকে ওষুধের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় সেই বিষয়ে আমি একজন এক্সপার্ট। আমার বেশ কিছু পেপারও আছে এই বিষয়ে। ড্রাগ অ্যাবিউজ, সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ, অ্যালকোহলিজম, এই সব নিয়েই আমার কাজ কারবার।'

'দুর্দান্ত! আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, মিস্টার মিত্র কি কখনও কোনও উইল করেছিলেন?'

'না, অ্যাট লিস্ট আমার জানা নেই। কিন্তু কেন বলুন তো? এটা তো ওর উইল করার বয়েস না।'

'সে তো বটেই। আসলে ওঁর ল্যাবেরটরি আর ওয়ার্কশপের মালিকানা কে পাবেন সেই নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে তো, তাই আর কী...'

'কে প্রশ্ন তুলছে?' ভুরু কুঁচকে গেল অলিভিয়া মিত্রর, 'ওর তো তিনকূলে কেউ নেই। যদি ক্লোজেস্ট রিলেটিভ কেউ থাকে তো আমিই। আইনত আমারই পাওয়া উচিত। যদিও এই বিষয়ে এ দেশের আইন কী বলে, আমি জানি না।'

'কেউ নেই কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ভাই বলেন্দ্রনাথ মিত্র ইউ কে থেকে এসেছেন দাদার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে। তিনি বলছেন যে নরেন্দ্রনাথের দাহকর্ম শ্রাদ্ধশান্তি তিনিই করবেন, আর মৃত দাদার সম্পত্তির অধিকারীও তিনিই।'

কোথাও কিছু নেই, দুম করে রেগে গেলেন অলিভিয়া। গলার পর্দা তিনধাপ চড়িয়ে বললেন, 'কেমন ভাই? যে ভাই দাদা বিদেশ চলে যাওয়ার পর দাদার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি? যে ভাই দাদাকে বঞ্চিত করে মিত্র পরিবারের সব সম্পত্তি নিজের দখলে নিয়েছে? হি ইজ আ প্যারাসাইটিক ক্যারেক্টর। বাপ মায়ের সব সম্পত্তি বেচে ইউ কে গেছিল। সেখানে সব নষ্ট করেছে। তারপর ওখানে কোন ধনী মহিলাকে ফাঁসিয়ে তার দয়ায় বেঁচে আছে। এখন আবার দাদা মারা গেছে শুনে উড়ে এসেছে দাদার সম্পত্তিটাও হাত করবে বলে। শুনুন প্রফেসর মুখার্জি, আমি স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি, এ আমি হতে দেব না। নরেন্দ্রর ক্রিমেশনের দায়িত্ব আমিই নেব, আর ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপের সব ইকুইপমেন্টসও আমার চাই। ওইসব যন্ত্রপাতির যোগ্য মর্যাদা আমি ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। তার জন্য যতদূর যেতে হয় যাব। মিস্টার বর্মন, আমাকে নরেন্দ্র'র বডি হ্যান্ডওভারের ব্যবস্থা করুন প্লিজ।'

রাস্তায় নেমে প্রফেসর মুখার্জি হাসি হাসি মুখে বললেন, 'ভদ্রমহিলার বাংলাটা কী বিউটিফুল না?'

মনুজেন্দ্র হাসি চেপে বলল, 'শুধু বাংলা কেন, ভদ্রমহিলা যে পুরোই বিউটিফুল

সে তো আপনার হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে বড্ড শর্ট টেম্পারড।'

'আহা, সুন্দরী মহিলাদের একটু-আধটু রাগ মানায় মনু। তুমি বাচ্চা ছেলে, এসব বুঝবে না।'

'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি হঠাৎ বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যর খোঁজ পেলেন কোত্থেকে বলুন দেখি? ভদ্রলোকের সঙ্গে তো আমাদের দেখাই হয়নি।'

'আরে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম। এক কাজ করো তো মনু, ভদ্রমহিলা ফ্রান্সে কোথায় কাজ করতেন, আর যবে থেকে এদেশে এসেছেন, তবে থেকে কোথায় কোথায় গেছেন সেটা একটু বার করতে পারবে?'

'সার্টেনলি। আর কিছু?'

'ওঁদের ডিভোর্সের কারণটা জানতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সেটা বোধহয় তোমার পক্ষে একটু চাপ হয়ে যাবে, তাই না?'

'একটু চাপের কাজ তো বটেই। তবে চেষ্টা করতে পারি। আর হ্যাঁ, এর জন্য কিন্তু টাইম লাগবে, এই ইনফরমেশন তাড়াতাড়ি জোগাড় করা একটু মুশকিল।'

'বুঝেছি। এবার তাহলে বলেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাই তো?'

'ইয়াপ।'

'বাব্বা, ফুল বিদেশি মোড অন করে বসে আছো তো মনু। ইয়েস না বলে ইয়াপ!!'

বলেন্দ্রনাথ উঠেছিলেন পার্ক স্ট্রিটের পার্ক হোটেলে। মোটা ফর্সা মানুষ, চোখের নীচে চামড়ার প্যাড। বয়েস একান্ন। নিজের দেহের ভারে নড়তে চড়তে একটু সময় নেন। এই ভর দুপুরেই ভদ্রলোক ব্ল্যাক লেবেল এর একটা বোতল খুলে বসে। দুজনকে বসতে বলে উদাত্তস্বরে আহ্বান জানালেন, 'চলে নাকি?'

প্রফেসর মুখার্জি মিত্তিরমশাইয়ের প্রস্তাবে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মনুজেন্দ্র গম্ভীরমুখে বলল, 'উই আর অন ডিউটি মিস্টার মিত্র।'

মনুজেন্দ্র'র কথা শুনে নিজেকে সামলে নিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'আপনার কাছে কয়েকটা কথা জানার ছিল মিস্টার মিত্র। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'না, না, সার্টেনলি নট। প্লিস গো অন।'

'মানে আপনার দাদার খুন হওয়ার বিষয়টা নিয়েই কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।'

'প্রশ্ন করতেই পারেন। কিন্তু আগেই জানিয়ে রাখি দাদার সঙ্গে বহুদিন আমার কথাবার্তা ছিল না। তাই আমার মনে হয়না এই বিষয়ে আমি খুব বেশি হেল্প করতে পারব।'

'কথাবার্তা না হওয়ার কারণ জানতে পারি?'

'সম্পত্তি, আবার কী? দাদা চেয়েছিল সম্পত্তির হাফ। এদিকে স্বার্থপরের মতো বিদেশ চলে গেল, মা-বাবার মিনিমাম খোঁজটুকুও রাখত না। বাপ-মায়ের প্রতি যাবতীয় কর্তব্য আমিই করেছি। বাবা কেন ওকে সম্পত্তি দেবে বলুন তো? সেই থেকে মনোমালিন্য, কথাবার্তা বন্ধ, যা হয় আর কী।'

'সে তো আপনিও বিদেশে গিয়ে সেটল করেছেন।'

'হ্যাঁ করেছি, কিন্তু সন্তানের যাবতীয় কর্তব্য পালন করার পর। বাবা-মা বেঁচে

থাকা অবধি দেশেই ছিলাম।'

'তারপর বিদেশ গেলেন কেন?'

'দেশে আর মন টিকল না, বুঝলেন। আমাদের তো আর আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। তাই বাবা-মা মারা যাওয়ার পর যা পেয়েছিলাম, সব বিক্রি করে পাড়ি জমালাম ইউ কে-তে...'

'এত দেশ থাকতে ইউ কে'-তেই কেন?'

ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে প্রফেসর মুখার্জির দিকে তাকালেন বলেন্দ্রনাথ মিত্র। তারপর বললেন, 'আমাদের পারিবারিক ব্যবসা কী, জানেন তো? সাপের বিষ বিদেশে এক্সপোর্ট করা। আমাদের এজেন্ট বসতেন ইউ কে-তে। ভাবলাম মাঝখানে এজেন্টকে আর কমিশন দিই কেন, আমিই একটা এজেন্সি খুলে বসি না হয়। তাই ইউ কে'তে পাড়ি জমালাম বছর বিশেক আগে।'

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি। প্রশ্ন করলেন, 'তারপর?'

হাতে ধরা গ্লাসের তলানিটুকু এক চুমুকে মেরে দিলেন বলেন্দ্রনাথ। তারপর চুক চুক করতে করতে বললেন, 'দাঁড়াল না, জানেন। সব ঢেলে টাকা লাগালাম, কিন্তু বেশিদিন টানতে পারলাম না। শেষে আমাদের প্রাক্তন এজেন্ট যিনি ছিলেন, মিস্টার জোসেফ, তাঁকেই সব বেচেবুচে দিলাম। তারপর তাঁরই মেয়ে মার্টিনার সঙ্গে আমার বিয়ে হল।'

প্রফেসর মুখার্জি খুব বুঝদারের মত মাথা নাড়লেন, যেন এরকম হয়েই থাকে। তারপর বললেন, 'তা এখন ব্যবসা সামলায় কে?'

'মার্টিনাই সামলায়। আমি সাপ্লাই সাইডটা দেখি। মানে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের সাপের বিষ জোগাড় করতে হয় তো।'

'বেশ বেশ। তা রাজকুমারের ফোন পেয়েই চলে এলেন?'

হাত উল্টোলেন বলেন্দ্রনাথ, 'কী আর করা। হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই। কর্তব্য কর্ম বলে তো একটা বস্তু আছে। ইংরেজিতে বলে ব্লাড ইস থিকার দ্যান ওয়াটার, জানেন তো?'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই। বাই দ্য ওয়ে, আপনার দাদার সম্পত্তি কে পাবে জানেন কিছু?'

'উইল না করলে তো আমারই পাবার কথা, যদ্দূর জানি।'

'এদিকে কিন্তু আপনার সিস্টার ইন ল এসে হাজির। তিনি কিন্তু বলছেন যে আপনার দাদার দাহকার্য তিনিই করবেন আর সম্পত্তিও তিনিই নেবেন।'

বলেন্দ্রনাথ ঘর ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে ভদ্রলোকের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। হাসি থামলে ভদ্রলোক বললেন, 'উফ, আপনি মাইরি হেবি মজার মানুষ। মহিলা কথাটা বললেন আর আপনি বিশ্বাস করে নিলেন? ডিভোর্সি স্ত্রীর যে মৃত স্বামীর সম্পত্তির ওপর কোনও হক বর্তায় না এটা ওনাকে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলেন না? আর কোন মুখে দাদার সম্পত্তি চাইতে আসে ওই মহিলা? ওর কীর্তিকলাপ জানেন আপনি?'

প্রফেসর মুখার্জিকে আর আটকানো গেল না। সামনে একটা খালি গ্লাস পড়েছিল। চট করে তাতে একটা ব্ল্যাক লেবেলের লার্জ পেগ ঢেলে, তাতে দু-টুকরো

বরফ ফেলে, চেয়ারটা সামনে টেনে এনে বললেন, 'কী কেস মিস্টার মিত্তির? খুলে বলুন তো একটু।'

বলেন্দ্রনাথ নিজের গ্লাসটা তুলে একটা চিয়ার্স করে বললেন, 'আরে, ও ফুল জালি মাল, বুঝলেন। বিদেশে নকলি ওষুধের চোরা কারবার খুলে বসেছিল। দাদাকেও ফাঁসিয়েছিল তার মধ্যে। সেই নিয়ে কেলেঙ্কারির একশেষ। তারপর দাদার চাকরি চলে যায়। ওই নিয়েই তো ডিভোর্স, বুঝলেন না। যেমন দেবা, তেমনি দেবী।'

প্রফেসর মুখার্জি খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'বলেন কী মশাই! ইনি তো তাহলে ডেঞ্জারাস মহিলা!'

'তবে?' চোখ টিপলেন বলেন্দ্রনাথ, 'দাদার ওই সব ল্যাবরেটরির ইক্যুইপমেন্টগুলোর ওপর ওর নজর কেন বুঝি না ভেবেছেন? ওর হাতে ওগুলো তুলে দেওয়া মানে ও ফের একই কাজ করবে। উঁহু, সে তো আমি হতে দিতে পারি না প্রফেসর মুখার্জি। আফটারঅল সমাজের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে!'

মাথা নাড়েন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর আরও দু-চারটে কথা বলে, সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলেন।

তখন দুপুর। প্রফেসর মুখার্জি পার্ক হোটেল থেকে বেরিয়েই ডানদিকে ঘুরে সোজা ট্রিঙ্কাজ-এ ঢুকে গেলেন। মনুজেন্দ্র আটকাতে পারল না।

মনুজেন্দ্র বলল, 'কী বুঝলেন স্যার?'

'বোকা বজ্জাত বলে একটা শব্দ আছে জানো তো? ইনি হচ্ছেন সেই জাতের লোক। বাপের সম্পত্তি দখলটা কেমন মোলায়েম করে পেশ করলেন দেখেছ? তার ওপর পয়লা নাম্বারের মিথ্যেবাদী। আরে, যদি অলিভিয়া মিত্র'ই জাল ওষুধের কারবার করে ফাঁসবেন, তাহলে চাকরি তো তার যাওয়ার কথা, নরেন মিত্তির চাকরি খোয়াবেন কেন? আমার দৃঢ় ধারণা, কোনও একটা চাল চেলে ইনি ওই মার্টিনা ম্যাডামকেও ফাঁসিয়েছেন। লোকটার চোখে মুখে একটা লম্পট জোচ্চোর ভাব আছে, দেখেছ?'

'সোজা কথা বলুন না স্যার, ইনি অলিভিয়া মিত্রর ভান্ডাফোড় করে দিয়েছেন বলে আপনি লোকটার ওপর রেগে আছেন। হ্যাঁ, মানছি আপনার লজিকটা ঠিক। তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছেন স্যার? দেওর বৌদির মধ্যে বাক্যালাপ না থাকলে কী হবে, একে অন্যের হাঁড়ির খবর রাখেন কিন্তু।'

'সে আর বলতে! আরে, যতই বিদেশে যাক, শিকড় তো এই কলকাতায়। অভ্যেসটা যাবে কোথায়? তবে দুজনেই কিন্তু কিন্তু কয়েকটা ভাইটাল ইনফর্মেশন দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ স্যার। তবে তাতে কিছু লাভ হল কি? কেস তো ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'হুম। এক কাজ করো তো। আমাদের সামনে কী কী হার্ডলস আছে একবার লিখে ফেলো তো।'

মনুজেন্দ্র বলল 'লেখার কী আছে স্যার? আমি বলে যাচ্ছি, দেখুন কিছু মিস করি কী না।

আমরা জানি না কারা নরেন মিত্তিরের বানানো পারফিউমের বোতল চুরি করে বেড়াচ্ছে, কেন এবং কীভাবে। এই দুই খুনের মোটিভ কী? খুনের মোডাস

অপারেন্ডি কী? কারা বিপিনকে তুলে নিয়ে গেছিল, তার সন্ধান নেই, কারা বিপিনের বড়ি পোড়াতে গেছিল তাদের খোঁজ নেই। এদিকে দেওর বৌদির মধ্যে বাংলা সিরিয়াল স্টাইলে কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলছে, বাকি যারা আছে তাদের সব্বার অ্যালিবাই পাকা। কোথা থেকে কী শুরু করি বলুন তো?'

'শুধু কি তাই? বলো তো কেন নরেন মিত্তির বিপিন হালদারকেই বেছে নিয়েছিলেন নিজের পারফিউম বিক্রি করার জন্য? বিপিন এত বড়লোক হচ্ছিল কী করে? ভিকটিম দুজনের ভিসেরা আর ফরেন্সিক রিপোর্টে এত নিকোটিন কেন? নরেন্দ্রনাথ মিত্র আর অলিভিয়া মিত্রর ডিভোর্সের আসল কারণ কী? নরেন মিত্তিরের সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছিল আগের দিন? নরেন মিত্তিরের ওয়ার্কশপে কাস্টমাইজড পারফিউম ছাড়া আর কোন কোন পারফিউম তৈরি হতো? সে নিয়ে বলতে রাজকুমার আর সুলতানার এত দ্বিধা কেন? যেদিন নরেন মিত্তির মারা যান, সেদিন তাঁর দরজার সিসিটিভি বন্ধ ছিল কেন? মারা যাওয়ার দিন বিপিন হালদারকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেছিলেন কেন নরেন মিত্তির? কী আলোচনা হয়েছিল দুজনের মধ্যে?'

ততক্ষণে দুজনের জন্য লাঞ্চ চলে এসেছিল। দুজনে চুপচাপ লাঞ্চ শেষ করলেন।

* * *

আগের দুটো মিটিং যেমন অনায়াসে হয়ে গেছিল, শেষেরটা কিন্তু সেরকম হল না। তৃতীয় অতিথির নাম জয়ন্ত সরকার। তিনি তাজ বেঙ্গলে রুমের দরজা সামান্য ফাঁক করে অপ্রসন্ন এবং রুষ্টস্বরে বললেন, 'কে আপনারা? আমাকে বিরক্ত করতে এসেছেন কেন?'

মনুজেন্দ্র এক ঝটকায় দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'সি আই ডি। প্লিজ কো অপারেট উইথ আস।'

প্রফেসর মুখার্জি ধীরেসুস্থে ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বেশ আয়েস করে বসলেন। তারপর বললেন, 'আশেপাশে কেউ নেই তো?'

'কেন? থাকলে কী অসুবিধা আছে?'

'একটু পরে যদি পুলিশ এসে আপনার কোমরে দড়ি পরিয়ে কান ধরে জিপে তোলে সেটা যাতে কেউ দেখতে না পায়, তাই বলছিলাম আর কি। আপনি যাকে বলে আমাদের সম্মানীয় অতিথি।'

'হাউ ডেয়ার ইউ...'

মুখে আঙুল দিয়ে শ-শ শব্দ করলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'আমি এলিতেলি লোক নই মিস্টার সরকার। তাই এসব মেজাজ টেজাজ নিজের কাছেই রাখুন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পবন খেমকার উইল জালিয়াতির কেসটা মনে আছে আশা করি। গতবছর কাগজে টিভিতে ছয়লাপ হয়ে গেছিল এই কেসটা নিয়ে। সেটা আমিই সলভ করি। সেইসময় আমার এই খানদানি চাঁদবদন টিভিতে বারকয়েক দেখিয়েওছিল, জানি না আপনার মনে আছে কি না। সেই থেকে কলকাতা পুলিশ

বলুন বা সিআইডি, আমাকে একটু সমঝে চলে, বুঝলেন। তার ওপর সিআইডি-র এডিজি আমার ভাগনে। অতএব ঠিকঠাক কোঅপারেট করুন, আখেরে আপনার মঙ্গলই হবে।'

জয়ন্ত সরকারের মুখে পর্যায়ক্রমে ক্রোধ, বিস্ময়, ভয় আর অসহায়তা খেলে গেল। তিনি কিছুক্ষণ পর রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমি কে জানেন? ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং সংস্থা ডেল্টা এজেন্সির অপারেশনস হেড, এক্স সিবিআই। আমাকে ভয় দেখানো অত সহজ নয়।'

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আহা, ভয় পাওয়ার কথা উঠছে কোথা থেকে? দু-একটা প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেবেন, ব্যস। এতে ভয়ডরের কথা উঠছে কোথা থেকে? এবার বলুন, যেদিন নরেন মিত্তির মারা যান তার আগের দিন নরেন মিত্তিরের বাড়ি কী করতে গেছিলেন?'

মনুজেন্দ্র চমকেছে বিলক্ষণ। কিন্তু তার আচার আচরণে সেসব প্রকাশ পেল না। অথচ যাঁর চমকানোর কথা, তাঁকে দেখে কিন্তু মনে হল এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছেন তিনি। নিজের ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিলেন প্রফেসর মুখার্জির দিকে। তারপর বললেন, 'কয়েকমাস আগে পৃথিবীর প্রথম সারির কয়েকটি পারফিউম প্রস্তুতকারক সংস্থা ডেল্টা এজেন্সির দ্বারস্থ হয়েছে। তারা বেশ কয়েকবছর ধরে দেখছে যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে কলকাতায়, তাদের প্রোডাক্টের ডুপ্লিকেট বিপুল পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। তারা সম্মিলিতভাবে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে, খুঁজে দেখার যে কারা এই কারবার করছে। আমরা ভারতের প্রায় সব বড় বড় শহরেই তদন্ত করেছি। আমাদের ইনভেস্টিগেটিং অফিসাররা বলছেন যে এই কারবারের এপিসেন্টার হচ্ছে কলকাতা। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আসা।'

'এসে কী দেখলেন?'

'আপনারা পুলিশ প্লাস গোয়েন্দা, আপনাদের কাছে লুকোব না। আমরা এসে দেখলাম যে এই কারবারের একটা বড় উৎস হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।'

মনুজেন্দ্র আর প্রফেসর মুখার্জি এমন ভাবে সোজা হয়ে বসলেন যেন ইলেক্ট্রিকের শক খেয়েছেন। মনুজেন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জয়ন্ত সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর মানে কী?'

জয়ন্ত সরকার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই নরেন্দ্রনাথ মিত্রর হত্যা রহস্য নিয়ে ইনভেস্টিগেট করছেন। আশা করি অনেকটা এগিয়েওছেন। আমিও আমার ইনভেস্টিগেশনের কথা শেয়ার করছি। মনে হয় দু-পক্ষেরই এতে সুবিধা হবে।

আশা করি, জানেন যে রইসি লোকজনের মধ্যে দামি বিদেশি সুগন্ধির একটা চাহিদা আছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিদেশি ব্র্যান্ডেরই যা দাম সে দাম দিয়ে আসল সেন্ট কেনা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে।

এরই সুযোগ নেয় বেশ কিছু অসাধু কারবারি। ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে বিদেশি দামি সুগন্ধির নকল তৈরি হয়। অভিজ্ঞ ব্যবহারকারী বা বহুদিনের সুগন্ধি বেচার অভিজ্ঞতা না থাকলে আসলের সঙ্গে সেইসব নকল পারফিউমের তফাৎ ধরা প্রায় অসম্ভব।

আমরা তদন্ত করে জেনেছি নরেন্দ্রনাথ মিত্র ফ্রান্সে চাকরি করার সময়েই এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। কেমিস্ট হিসেবে তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন। বেশ কিছু চালু ব্র্যান্ডের এমন দ্বিতীয় কপি তৈরি করেন যে আসলের সঙ্গে তার তফাত করা মুশকিল। অথচ দাম আসল ফর্মুলেশনের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। নরেন মিত্র তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অসাধু নকল পারফিউমের কারবারিদের বিপুল পয়সার বিনিময়ে এই ফর্মুলেশনের মাদার টিংচার বিক্রি করতেন।

একসময় তাঁর কম্পানি এই কথা জেনে যায়। তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করা হয়। এই সূত্রেই নরেন মিত্র আর তাঁর স্ত্রী'র মধ্যে ঝামেলা হয়। এবং তাঁদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়।

নরেন মিত্র নিজের কম্পানিকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ এবং আর কখনও এই কাজ করবেন না এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে রেহাই পান। দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে তিনি ওই পার্সোনালাইজড পারফিউমের ব্যবসা শুরু করেন। আস্তে আস্তে বাজার জমাতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এই লাইনে তাঁর প্রতিভা সত্যিই ভগবানদত্ত।

কিন্তু এর একটা প্রবলেম আছে।

নরেন মিত্তিরের কাছে এই ধরনের হাই ভ্যালু পারফিউমের অর্ডার তো সবসময় আসত না। অথচ ফ্যাক্টরি বসিয়ে রাখা যায় না, তার রানিং কস্ট আছে, লোকজনের মাইনে আছে। তাই নরেন্দ্রনাথ আবার সেই পুরোনো ব্যবসায় ফিরে গেলেন। এবার আর মাদার টিংচার না, পুরোপুরিই নকলি পারফিউমের ব্যবসায় নেমে পড়লেন।

নরেন মিত্রর ওয়ার্কশপে নামীদামি সব বিদেশি পারফিউমের হুবহু নকল বানানো হতো। আর সেসব নকলি পারফিউম বিক্রির জন্যই একজন এজেন্টকে ধরেছিলেন, নাম বিপিন হালদার। কারণ হালদাররা দু-পুরুষ ধরে কলকাতার এই নকল পারফিউম মার্কেটের বেতাজ বাদশা।

নরেন মিত্র নকলি পারফিউম বানিয়ে বিপিনকে সাপ্লাই করতেন। বিপিন কাবাড়িওয়ালাদের থেকে ফেলে দেওয়া বিদেশি পারফিউমের বোতল কিনে আনত কিলো দরে। তারপর সেগুলো ধুয়ে মুছে সাফসুতরো করে নরেন মিত্রর সাপ্লাই দেওয়া নকলি সুগন্ধি ভরে সিল করে দোকান থেকে আসল বলে বিক্রি করত।

আমি ওইদিন যে ওনার বাড়ি গেছিলাম সে কথা সত্যি। গেছিলাম নরেন মিত্রকে বোঝাতে যাতে তিনি এই ব্যবসা ছেড়ে দেন। কারণ এতে আমার ক্লায়েন্টদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মিস্টার মিত্র বেমালুম অস্বীকার করেন। তখন আমি তাঁকে আমার সংগৃহীত কিছু প্রমাণ দেখাই। তারপর দুজনের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। আমি শেষবারের মতো ওঁকে সতর্ক করে চলে আসি।

পরদিন জানতে পারি যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মারা গেছেন। আমাকে আমাদের ডিরেক্টর্সরা দ্রুত দিল্লি ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। এদিকে আবার আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে যোগাযোগ করে আমাকে বলা হয় কলকাতা না ছাড়তে। তারপর এই আপনারা এসে উপস্থিত হলেন।'

কোথাও কোনও কথা নেই, প্রফেসর মুখার্জি ভারি খুশি হয়ে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ সরকারমশাই। বলছি যে, এই রহস্যভেদে একজন প্রাক্তন সিবিআই অফিসার হিসেবে আপনার সাহায্য পাব নাকি?'

জয়ন্ত সরকার চওড়া হেসে বললেন, 'সার্টেনলি প্রফেসর।'

* * *

মানুষটার মাথাটা ঝুঁকে ছিল ল্যাপটপের ওপর। কী বোর্ডে একের পর এক কমান্ড ঝড়ের গতিতে টাইপ করছিল সে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে কালো অক্ষরমালার দল নেমে আসছে ঝর্ণার মতো।

ক্রমেই তার কপালের ভাঁজ বেড়ে চলেছিল। ওয়েবদুনিয়ার মহারথী সে, তাকেও ঘোল খাইয়ে দেবে কলকাতা সি আই ডি-র সাইবার ক্রাইম এক্সপার্টরা?

চোয়াল শক্ত হয়ে এল। কিছুতেই না।

আরও কিছুক্ষণের প্রচেষ্টা। কয়েকটা অডিও ক্লিপ ডাউনলোড হল কোথা থেকে যেন। সেগুলো মন দিয়ে শুনলো সে। অবশেষে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। নিজেকেই বলল সে, পিপল ক্যান বি স্মার্ট, বাট আই অ্যাম স্মার্টার দ্যান দেম।

একটু পর ফোনটা তুলে নেয় সে, 'রহমত। কাজ আছে। গোপাল শিকদারের খোঁজ পেয়েছি। তবে খুনখারাপি একদম নয়। জাস্ট শিশিটা তুলে আনবে। ওকে?'

'ওকে ক্যাপ্টেন। লোকেশন?'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

* * *

অন্নপূর্ণা রিসর্টের দরজা দিয়ে মনুজেন্দ্র-র গাড়িটা ঢুকতেই দারোয়ান যেভাবে একটা টানটান সেলাম ঠুকল, সেটা দেখবার মতো। ম্যানেজার সাহেব হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন, কুলকুল করে ঘামছেন। মনুজেন্দ্র আর প্রফেসর মুখার্জি মাটিতে পা রাখতেই একটা দেঁতো হাসি হেসে বললেন, 'আসুন স্যার আসুন। আসতে অসুবিধা হয়নি তো?'

প্রফেসর মুখার্জি একটা অমায়িক হাসি উপহার দিলেন, 'না না, অসুবিধা কীসের। এমনিতে চমৎকার রাস্তা। তাছাড়া আজকাল জিপিএসের দৌলতে লোকে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে হিমালয়ের চূড়ো অব্দি চোখ বন্ধ করে পৌঁছে যাচ্ছে, আর এ তো সাধারণ রিসর্ট মাত্র।'

ম্যানেজার ঘাড় নুইয়ে যে হেঁ-হেঁ-টা করলেন, সেটা প্রফেসর মুখার্জির রসিকতায় না পুলিশি হুশিয়ারির গুঁতোয় সেটা বোঝা মুশকিল।

গাড়ি থেকে নেমে দুলকি চালে হাঁটতে শুরু করলেন প্রফেসর মুখার্জি। ছোটখাটো জায়গার মধ্যে রিসর্টটা মন্দ সাজায়নি। বেশ খোলামেলা। তার ওপর রিসর্টের একদম গা ঘেঁষে চলে গেছে রূপনারায়ণ নদী। তার স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বানানো ইনফিনিটি পুল। সেখানে এই বিকেলেও কেঁদো হনুমান সাইজের

একটা মানুষ আর দুখানা পাশ বালিশ সাইজের বাচ্চা সাঁতার কাটছে।

'কবে খুললেন রিসর্টটা?'

'এই তো বছর দুয়েক হল। আপনাদের আশীর্বাদে কিন্তু খারাপ চলছে না স্যার। উইকেন্ডে তো জায়গাই থাকে না। হে-হে, একদিন আসুন না মিসেসকে নিয়ে।' হাত কচলাতে থাকেন মধ্যবয়সি ম্যানেজার।

সে কথায় কান না দিয়ে প্রফেসর মুখার্জি জিগ্যেস করলেন, 'সিকিওরিটির পুরো বন্দোবস্ত আছে তো? চিড়িয়া ওড়েনি তো?'

'একদম স্যার। মনুজেন্দ্র স্যার যেমন বলেছিলেন তেমনই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের চোখ এড়িয়ে মাছি অবধি গলতে পারবে না স্যার। আর পুলিশের লোকজন তো প্লেন ড্রেসে আশেপাশে আছেই। তাছাড়া চিড়িয়ার তো রাতদিনই মদ আর গাঁজা চলছে। উড়ে যাবেনই বা কোথায়?'

একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা ছোট মাঠের মধ্যে গাড়ির পার্কিং-এর বন্দোবস্ত। কয়েকজন ড্রাইভার ইতিউতি বসে আড্ডা মারছে। কেউ কেউ নিজের সিট একেবারে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বসে মোবাইল দেখছে। একদম সামনে একটা নীল রঙের ইনোভা। তার সিটে বসে থাকা ড্রাইভারটি ওঁদের দিকে একঝলক দেখে ফের সামনে ধরে রাখা মোবাইলে মন দিল।

আরও একটু হেঁটে একটা কটেজ। দরজার সামনে প্লেন ড্রেসে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তারা মনুজেন্দ্রকে দেখেই হিলে খটাখট শব্দ তুলে সেলাম ঠুকল। মনুজেন্দ্র তার উত্তর দিয়ে ওপরে উঠল। পিছন পিছন প্রফেসর মুখার্জি।

দুজনে ঘরে ঢুকলেন। ঘর গাঁজার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। কটু গন্ধে বমি এসে গেল দুজনের। আর এই ধূম্রজালের মধ্যে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বসে আছে একটি অল্পবয়সি ছেলে। দুজনকে দেখেই সে একটা লামা টাইপ স্মাইল দিয়ে বলল, 'এই যে মিস্টার জেমস বন্ড অ্যান্ড কম্পানি, আমাকে ছেড়ে দেবেন কবে?'

দুজনে সুস্থির পায়ে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বেশ জমিয়ে বসলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে যতটা পারা যায় ততটা দেখে নিলেন ঘরটাকে।

ছোট ঘর, ঘরের মধ্যে নরম বিছানা, জামাকাপড় রাখার আলাদা ওয়াড্রোর্ভ, টিভি, ইন্টারকম, এসি সবই আছে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। আন্দাজ করা যায় তাতে গিজার লাগানো।

প্রফেসর মুখার্জি মিষ্টি হেসে বললেন, 'ছাড়া পাওয়ার জন্য তোমার এত ছটফট কীসের গোপাল? আছ তো খারাপ না। কল টিপলে জল, সুইচ টিপলে এসি, ফোন টিপলে খাবার, সঙ্গে নেশার হাজারো উপকরণ, তোমার কোন অভাবটা রেখেছি?'

'সে অবশ্য ঠিক। তবুও, আমার মতো কালচারাল অ্যাক্টিভিস্টদের কী আর বসে থাকলে চলে?'

'কালচারের চিন্তা কোরো না গোপাল। তোমাকে ছাড়া সে ভালই আছে।'

এবার একটু ফুঁসে উঠল গোপাল, 'চিন্তা কোরো না বললেই হল? জানেন আমার হাতে এখন কত কাজ? সামনের মাসে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কলেজ স্কোয়্যার

থেকে কফি হাউস অবধি একটা ঐতিহাসিক প্রোটেস্ট ওয়াক অর্গানাইজ করতে হবে, তারপর সাম্রাজ্যবাদের ক্যাপিটালিস্ট ডিসকোর্স, এই নিয়ে জেডাব্লু ম্যারিয়টে একটা সেমিনার আছে, 'জোনাকিদের হাতপাখা' লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদনা আছে। আপনাদের মতো রাষ্ট্রের দালালদের হাতে বন্দী থাকলে চলবে? এসব কি অন্যায় নয়?'

'সত্যি কথা বলব গোপাল?'

'আপনি মিথ্যে কথাও বলেন মিস্টার বস্ত? বিশ্বাস হয় না।'

'কথাটা বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ হে গোপাল, তোমার সঙ্গে খুব সম্ভবত অন্যায়ই হচ্ছে।'

'তাহলে? এও কি এই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নামিয়ে আনা নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নয়? এই জন্যই তো লিন বিয়াও বলেছিলেন...'

মনুজেন্দ্র'র কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় যে অনেক কষ্টে মেজাজ ঠিক রেখেছে সে। দাঁত চিপে জিগ্যেস করল, 'তা গোপালবাবু, তুমি এত জানো, এত বোঝো, তা এত নেশা করো কেন?'

'দেখুন ইনস্পেকটর, আমি আপনার মতো একজন ডায়ালেক্টিক্যালি ইমপিরিয়ালিস্ট রাষ্ট্রের টুল নই। আমি হচ্ছি প্রতিভাবান ক্রিয়েটিভ মানুষ। আর নেশা হচ্ছে আমার ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজের ডিকনস্ট্রাকটিভ প্যাথস।

মনুজেন্দ্র দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বটে?'

'দেখুন, ফিউচারিস্ট থেকে শুরু করে সুররিয়ালিস্ট, বিট জেনারেশন থেকে হাংরি মুভমেন্ট, নেশা হচ্ছে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে ক্রিয়েটিভ লুজ মোশনে উত্তীর্ণ হওয়ার রিচুয়ালিস্টিক পার্গেটিভ। র‍্যাবো থেকে আঁতোনা আর্তো, জঁ ককতো থেকে আমি, সমস্ত মেজাজি, খ্যাপাটে, প্রতিষ্ঠানবিরোধীদের নান্দনিক অ্যাবস্ট্রাকটিজমের থট প্রসেস বার বার ক্যালিব্রেট আর রিক্যালিব্রেট করতে নেশার দরকার—'

মনুজেন্দ্রর হাতটা কোমরের দিকে যাচ্ছিল। প্রফেসর মুখার্জি মনুজেন্দ্রর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'বড় ভালো বলেছ হে বাপু। কালচারের লাইনে আমিও এককালে ছিলাম। ছোটবেলায় লিটল ম্যাগাজিনে প্রচুর কবিতা লিখেছি। পার কবিতা আড়াইশো টাকা করে দিতে হতো যদিও। সে যাক গিয়ে। এবার কাজের কথাটা বলো তো বাপু, চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই মহাপ্রস্থানের পথে রওনা দিয়েছ। মদ, গাঁজা, চরস, স্ম্যাক, কিছুই তো বাকি নেই। তা হাসপাতালের ভর্তি হতে হল কেন?'

গোপাল একটা গাঁজাপোরা বিড়ি ধরাল। তারপর একটা লম্বা টান মেরে বলল, 'সেটা বলাটা একটু চাপ। আসলে সেদিন ঘরে একলা একলা বসে এডওয়ার্ড সাইদের প্রিভিলেজ ইন্টারসেকশনালিটির সঙ্গে লি শাও চি'র অ্যালিয়েনেশন অফ লেবার তত্ত্বের একটা আল্ট্রা মডার্ন সাবলাইম সিমিলি খুঁজে পেয়েছিলাম। পেয়ে ভাবলাম একটু স্নান করে আসি। তার আগের এক হপ্তা স্নান করিনি তো...'

দুজনেই নাক কুঁচকোলেন। গোপাল বোধহয় সামান্য রুষ্ট হল। আধশোয়া থেকে পুরো উঠে বসে উত্তেজিতস্বরে বলল, 'দেখুন, স্নান হচ্ছে একটা পোস্টমডার্ন নিও কলোনিয়ালিস্ট কুসংস্কার, একধরনের কমোডিটি ফেটিশিজম। তাই একজন

মুক্তচিন্তার সাবঅল্টার্ন টর্চবেয়ারার হিসেবে...'

মনুজেন্দ্র'র কোমরের কাছ থেকে একটা ক্লিক করে শব্দ। প্রফেসর মুখার্জি ঝাঁপিয়ে পড়ে মনুজেন্দ্রর হাতটা ধরে ফেললেন। তারপর গলাটা মিষ্টি করে বললেন, 'বেশ বেশ, স্নান করে এলে। তারপর?'

'তারপর আর কী। এসে নরেনবাবুর কাছ থেকে কেনা নতুন পারফিউমটা গায়ে দিলাম, আর তারপরেই মাথাটা কেমন বাঁই করে ঘুরে গেল, বুঝলেন।'

মনুজেন্দ্র ঠান্ডা গলায় বলল, 'নরেন মিত্তিরের এক বোতল পারফিউমের যা দাম তাতে তো একটা গরিব ফ্যামিলির এক মাসের খাই খরচা চলে যায়। তা তোমার ওই পোস্ট কলোনিয়াল নিও মডার্ন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্টের চিন্তাধারায় সেটা আটকায় না?'

গোপাল খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখুন, সেটা আমার পার্সোনাল চয়েস। ওপেন মার্কেট ইকোনমির ইগ্যালেটেরিয়ানিজমের সঙ্গে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের অপ্রেসিভ নেচার...'

প্রফেসর মুখার্জি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, যাকে বলে একেবারে জলবত্তরলং। সে যাই হোক। যে কথা বলছিলে, মাথা বাঁই করে ঘুরে গেল, আর তারপর তোমাকে বেল ভিউতে ভর্তি করে দিল, তাই তো? তা বাপু, সেই পারফিউমের বোতলটা আছে কোথায়?'

'ওই তো টেবিলের ওপর।'

প্রফেসর মুখার্জি লাট্টুর মত ঘুরে গেলেন। কোণে ড্রেসিং টেবিলের ওপর শোভা পাচ্ছে একটি ছোট নয়নাভিরাম শিশি। প্রফেসর মুখার্জি সেটি সাবধানে তুললেন। তারপর পকেট থেকে একটা জিপার লক লাগানো প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করে শিশিটাকে তার মধ্যে ভরে মনুজেন্দ্রর হাতে দিয়ে বললেন, 'এটাকে যে করে হোক আজ সন্ধের মধ্যে বটকৃষ্ণ পালের হাতে তুলে দাও। আমার থরো কেমিক্যাল অ্যানালিসিস চাই।'

গোপাল রুষ্টস্বরে বলল, 'এ কী। একে আমায় আটকে রেখেছেন—তার ওপর—'

প্রফেসর মুখার্জি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্যই তোমাকে এখানে আটকে রেখেছি গোপাল। একবার যদি ওরা তোমার লোকেশন জানতে পারে, তাহলে কিন্তু তোমাকে ধাপায়, নাকি সোজা নিমতলাঘাটে পাওয়া যাবে, তার কিন্তু কোনও গ্যারান্টি নেই।'

গোপাল কয়েবার ঢোঁক গিলে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'কেন? নিমতলাঘাটের কথা উঠছে কেন? আমি তো কিছু করিনি।'

'তুমি যে কিছু করোনি, সেটা আমরা জানি গোপাল। মুশকিল হচ্ছে নিজের অজান্তেই তুমি এমন একটা গোলমেলে কেসে ফেঁসে গেছো যার কোনও থই পাওয়া যাচ্ছে না। তার কুলকিনারা করা ইস্তক তোমাকে সুরক্ষিত রাখা আমাদের এখন খুব দরকার, বুঝলে ভায়া!'

জিভ দিয়ে একবার শুকনো ঠোঁট চাটল গোপাল, 'কীসের গোলমেলে কেস স্যার?'

একটা সিগারেট ধরালেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বললেন, 'একটা লোক, বুঝলে গোপাল, একটা ডেঞ্জারাস লোক খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে এমন কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে যার জন্য দু-দশটা খুন জখম তার কাছে কোনও ব্যাপারই না। সে অসম্ভব ধূর্ত, বেপরোয়া আর সাহসী। ইতিমধ্যেই সে দু-দুখানা খুন করে ফেলেছে। এবার তার হাত যদি গোপাল শিকদার অবধি পৌঁছোয়, তাহলে হয়তো নেক্সট শীতে তুমি ধাপার মাঠে সার হয়ে ফুলকপি ফলাচ্ছো।'

'বু-বুঝে গেছি স্যার। কিন্তু এরা যে কারা, আর আমিই বা কীভাবে এদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি সেইটে শুধু এই গোদা মাথায় ঢুকছে না।'

'মাথায় তো আমাদেরও ঢুকছে না ভায়া। ঢুকলে কী আর অত কষ্ট করি হে? শুধু বলি সাবধানে থাকো। হুটহাট করে এদিক-ওদিক যেও না। যা করা হয়েছে সে তোমার ভালোর জন্যই।'

এই বলে মনুজেন্দ্র'র দিকে ফিরে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'চলো হে, একবার তোমাদের অফিসে যাওয়া যাক।'

দুজনে আবার হাঁটতে হাঁটতে পার্কিং স্লটে এলেন। এখন গাড়ি অনেক কম। সব হোটেল রিসর্টেই বেলা বারোটা হচ্ছে চেক আউটের সময়। যারা উইকেন্ডে এসেছিলেন, তাঁরা বেরিয়ে গেছেন।

প্রফেসর মুখার্জি গাড়িতে উঠে বসলেন। নীল ইনোভাটা একই জায়গায় দাঁড়ানো। তার ড্রাইভার একই ভাবে মোবাইল ঘাঁটছে। প্রফেসর মুখার্জি সেদিকে তাকিয়ে মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'কী মনু, এত কাছে এসেছি যখন, কোলাঘাটের ইলিশ না খেয়ে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

* * *

তখন সন্ধে নেমে এসেছে। মনুজেন্দ্রর গাড়িটা তখন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে বেলেপোল পার করছিল। প্রফেসর মুখার্জি সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। হাইওয়ের ল্যাম্পপোস্টের আলো পিছলে যাচ্ছিল তাঁর মুখে। ভ্রূ দুটো ভয়ানকভাবে কুঁচকোনো। কী যেন গভীরভাবে ভাবছেন। মনুজেন্দ্র একবার আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত কী ভাবছেন স্যার?'

'গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা কিছু আমার চোখে পড়েছে মনু, যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেটা যে কী, কিছুতেই মাথায় আসছে না।'

'কী জিনিস বলুন তো?'

'কী যেন একটা অসঙ্গতি একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।'

'গোপালের কথাবার্তার মধ্যে কী? ছোকরাকে কিছু কোৎকা দেওয়ার ব্যবস্থা করব? এমনিতেই আমার হাতটা নিশপিশ করছে।'

'উঁহু!' অন্যমনে বললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'খটকাটা যে কোথায় সেটা যতক্ষণ না বুঝতে পারছি....'

বলতে-বলতেই তাঁর ফোন বেজে উঠল। যেন একটা চটকা ভেঙে উঠে বসলেন তিনি। বললেন, 'বলুন ভাগনেস্যার।'

'কাজ কিছু এগোল মামাবাবু?'

'অনেকটাই এগিয়েছে ভাগনেবাবু। গোপাল শিকদারের কাছ থেকে একটি জিনিস উদ্ধার করেছি। তোমার কাছেই আসছি। এর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস আমার চাই, আজকেই। তুমি পালমশাইকে রেডি থাকতে বলো।'

মনোজ চাকলাদার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কে খুনি জানা গেল কিছু? এদিকে আমার লাইফ তো হেল হয়ে যাচ্ছে। একদিকে বড়কর্তারা আমাকে জেরবার করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে অতিথিরা বড়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন বিদেশের পাসপোর্ট হোল্ডার, আবার একজন এক্স সিবিআই। আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?'

'মামা থাকতে ভাগনের চিন্তা কী? কাজ অনেকটাই এগিয়েছে, এই কেমিক্যাল অ্যানালিসিসটা হয়ে গেলে পিকচার অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বাই দ্য ওয়ে, মোবাইল ফোনের কল লিস্ট পাওয়া গেল?'

'এসে গেছে। এতে বেশ ইন্টারেসটিং কিছু আছে। এলে দেখাচ্ছি।'

'আসছি। আর ঘণ্টাখানেক লাগবে।'

মনুজেন্দ্র সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ পার করে আলিপুর থেকে ডানদিকে যাওয়ার বদলে সোজা গিয়ে রেড রোড ধরল। প্রফেসর সাহেব তখনও অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন একটা ভাবছিলেন। একটু পর খেয়াল হতে ধড়মড়িয়ে উঠে বললেন, 'এ কী, আমরা কোথায় যাচ্ছি মনু?'

মনুজেন্দ্র বলল, 'একটু চাঁদনি যাচ্ছি স্যার। মোবাইলের ব্যাক কভারটা খারাপ হয়ে গেছে, চেঞ্জ করতে হবে।'

হঠাৎ প্রফেসর মুখার্জি চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'রোককে, রোককে। গাড়ি সাইড করো মনু। এক্ষুনি।'

মনুজেন্দ্র গাড়ি সাইড করে বলল, 'কী হয়েছে স্যার? কিছু ভুলে ফেলে এসেছেন ওখানে? ম্যানেজারকে বলব পাঠিয়ে দিতে?'

প্রফেসর মুখার্জি উত্তেজিত, 'যে ছোকরা বিপিন হালদারকে শেষ দেখেছিল, তার নাম কী বললে যেন? মুন্না, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'মুন্নার সঙ্গে আমার কথা বলাও, এক্ষুনি।'

মনুজেন্দ্র ফোন বার করে ডায়াল করল। তারপর ফোনটা প্রফেসর মুখার্জির হাতে দিয়ে বলল, 'নিন, কথা বলুন।'

প্রফেসর মুখার্জি ফোনটা হাতে নিয়ে বললেন, 'মুন্না, বিপিনকে যে গাড়িতে উঠতে দেখেছিলে সেটা কোন মডেল, কী রঙ, মনে আছে?'

ওদিক থেকে আসা উত্তরটা শুনে প্রফেসর মুখার্জি উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'ঠিক বলছ, না আন্দাজে?'

কয়েক সেকেন্ড পর মুন্নার উত্তরটা শুনে ফোন কেটে দিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'মুন্না বিপিনকে একটা গাড়িতে উঠতে দেখেছিল। তুমি বলেছিলে ওখানে কোনও একটা এগরোলের দোকানে একটা সিসিটিভি ক্যামেরা আছে রাস্তার দিকে মুখ করা। ওটার ফুটেজ চেক করতে দিয়েছিলে?'

'দিয়েছিলাম স্যার। রিপোর্ট আজ পাওয়ার কথা। দাঁড়ান, ফোন করে নিই।'

মনুজেন্দ্র নিজের মোবাইল থেকে একটা কল করে দু-একটা কথা বলে ফোনটা তুলে দিলেন প্রফেসর মুখার্জির হাতে। প্রফেসর সাহেব ফোনটা হাতে নিয়ে আর হাই হ্যালোর মধ্যে গেলেন না, জিগ্যেস করলেন, 'গাড়িটার মডেল আর রঙ জানা গেল?'

উত্তর শুনেই প্রফেসর মুখার্জি উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'মনুজেন্দ্র, এক্ষুনি অন্নপূর্ণা রিসর্টে ফোন করে গোপাল শিকদারের খোঁজ নাও। একটা নীল রঙের ইনোভা দেখেছিলাম মনে আছে? যে করে হোক ওটাকে ট্রেস করো। ম্যানেজারকে বলো পার্কিং লট আর মেইন গেটের সিসিটিভি চেক করতে। যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে হাইওয়ের টোল ট্যাক্সগুলোকে অ্যালার্ট করো। হাইওয়েতে যারা পেট্রলিং করে তাদের ইনস্ট্রাকশন দাও অমুক নাম্বারের ইনোভা, নীল রঙের, যে করেই হোক ধরতে হবে।'

মনুজেন্দ্র হতভম্ব হয়ে গেছিল। সে বলল, 'কেন? হঠাৎ কী হল?'

'যেদিন আমরা প্রথম নরেন মিত্তিরের বাড়ি যাই সেদিন ড্রাইভার যোগেন্দ্র যাদবের মোবাইলটা লক্ষ্য করেছিলে?'

'না, কেন?'

'মোবাইলে একটা সিংহের মুখ আঁকা রংচটা ব্যাককভার লাগানো ছিল, মাথার দিকটা ভাঙা। আজ রিসর্টের পার্কিং লটে যে নীল রঙের ইনোভাটা ছিল, তার ড্রাইভার ঠিক ওই ব্যাককভার লাগানো মোবাইলটা হাতে নিয়ে খুটখাট করছিল।'

'সে তো সেম ব্যাককভার অনেক মোবাইলেই থাকতে পারে স্যার।'

'সে অবশ্যই পারে মনু। কিন্তু দুটো ব্যাককভার, একই রকম রংচটা, একই জায়গায় ভাঙা, এর প্রোব্যাবিলিটি কত পার্সেন্ট হতে পারে বলো দেখি? তাছাড়া একই জিনিস দু-জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, যে দুটো জায়গাই আমাদের ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত, এ তো যাকে বলে কো-ইন্সিডেনসের ঠাকুরদা মনু। আমি শিওর, ওই গাড়িতে যোগেন্দ্রই ছিল ছদ্মবেশে।'

মনুজেন্দ্র ফোন করতে যাচ্ছিল, প্রফেসর সাহেব তার হাতটা ধরে আটকালেন, 'নিজের ফোন থেকে একদম না মনু, আমার ফোন থেকেও না।'

বিস্মিত হল মনুজেন্দ্র, 'কেন?'

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে মনু। যোগেন্দ্র কী করে জানল যে অন্নপূর্ণা রিসর্টেই গোপালকে আটকে রাখা হয়েছে? এর তো কোনও রেকর্ডও নেই, যা কথাবার্তা হয়েছে ফোনে ফোনেই। তাহলে?'

'কী বলতে চাইছেন স্যার?'

'আমার দৃঢ় ধারণা আমাদের ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে মনু। আমাদের একটা অন্য ফোন চাই। এখুনি।'

একটা গাড়ি আসছিল রেড রোড ধরে। মনুজেন্দ্র হাত তুলে তাকে থামাল। ড্রাইভিং সিট থেকে এক সুবেশ প্রৌঢ় মুখ বের করে জিগ্যেস করলেন, 'এনি ইস্যুজ?'

মনুজেন্দ্র নিজের আই কার্ডটা একবার দেখিয়ে বলল, 'আপনার ফোনটা

একবার ব্যবহার করতে পারি? জাস্ট একটা কল করব।'

প্রৌঢ় বাইরে বেরিয়ে এসে স্মার্টলি বললেন, 'সার্টেনলি ইনস্পেকটর।'

গোটা তিনেক ফোন করল মনুজেন্দ্র। শেষেরটা হিন্দিতে এবং যথেষ্ট কড়াভাবে। খুব সম্ভবত পুলিশের কাউকেই। তারপর ফোনটা প্রভূত ধন্যবাদের সঙ্গে ফেরত দিয়ে প্রফেসর মুখার্জিকে বলল, 'আপনার সন্দেহই ঠিক প্রফেসর। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর কেউ একজন সন্ধের অন্ধকারে গোপালের রুমে ব্রেক ইন করে। গোপাল তখন গাঁজা টেনে ঘুমোচ্ছিল। সে কিছুই বোঝেনি। ঘর থেকে কিছু চুরিও যায়নি। সিকিওরিটি টের পায় রুটিন এনকোয়্যারি করতে গিয়ে। ততক্ষণে নীল ইনোভা পগারপার। আমি অবশ্য গাড়ির নাম্বার পেয়ে গেছি। হাইওয়ের পেট্রলিং টিমকে বলেও দিয়েছি ট্র্যাক করতে।'

'আরেকটা গাড়ি থামাবে মনু?'

'সে কী? কেন? আবার কাকে ফোন করবেন?'

'গাড়ির নাম্বার প্লেট যে ফলস সে নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর যোগেন্দ্র যে হাইওয়েই ধরবে, তুমি জানলে কী করে? সে তো ভেতরের গ্রামগঞ্জের রাস্তা ধরেও কলকাতা ঢুকতে পারে। তুমি বরং তোমার সাইবার এক্সপার্টদের বলো যোগেন্দ্রর ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করতে। এছাড়া উপায় নেই। আর এখন ভবানী ভবন চলো। মনোজের সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমরা কেস সলভ করার প্রায় মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।'

* * *

প্রফেসর মুখার্জি আর মনুজেন্দ্র যখন ভবানী ভবন পৌঁছল তখন প্রায় রাত আটটা। ওঁরা মনোজ চাকলাদারের কেবিনে ঢুকতেই এডিজি সাহেব উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'যোগেন্দ্রর মোবাইলের টাওয়ারের লোকেশন ট্র্যাক করতে পেরেছি মামাবাবু। সে গাড়িটা রাস্তার পাশে একটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে হেঁটে হেঁটে মেচেদা স্টেশনে গেছে। সেখান থেকে লোক্যাল ট্রেন ধরে খড়্গপুর পৌঁছেছে। আমার ধারণা ও কোনও দূরপাল্লার ট্রেন ধরে রাজ্যের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'হতে পারে মনোজ। আবার নাও হতে পারে। হয়তো সে আমাদের ধোঁকা দিতে খড়্গপুর গেছে। ফিরতি ট্রেনে কলকাতা ফিরে আসতেই পারে। তোমরা তাকে শুধু ট্র্যাক করে যাও। আমি না বলা অবধি গ্রেপ্তার করবে না।'

'কিন্তু ও যে কলকাতায় আসবেই তার গ্যারান্টি কী স্যার?'

'বিস্তর গ্যারান্টি আছে হে। কারণ যে জিনিসের খোঁজে ও ঘুরছে, সে জিনিস এখনও তার হাতে আসেনি। তাকে কলকাতা ফিরতেই হবে।'

'কী সেই জিনিস মামাবাবু?'

গোপাল শিকদারের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনা শিশিটা পকেট থেকে বার করে মনোজ চাকলাদারের টেবিলের ওপর সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'পালমশাইকে এত্তেলা দাও এডিজি সাহেব। এ জিনিসের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস চাই। আর্জেন্ট। পারলে আজ রাতের মধ্যেই। আর খুব সাবধানে হ্যান্ডল

করতে বলবে। যদি আমার আশঙ্কা ঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে খুব সম্ভবত এটিই সেই মারণাস্ত্র, বা তার কাছাকাছি কিছু, যার সাহায্যে নরেন মিত্তির আর বিপিনের ভবলীলা সাঙ্গ করা হয়।'

এডিজি সাহেবের একজন সহকারী এসে শিশিটা নিয়ে গেল। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'একটা কাজ বলেছিলাম এডিজি সাহেব, আমাদের তিন অতিথি কবে কলকাতা এসেছেন জানা গেছে?'

'সেটা আশ্চর্যের বিষয় মামাবাবু। অলিভিয়া আর বলেন্দ্রনাথ যবে থেকে হোটেলে উঠেছেন, তার অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে কলকাতা এসেছেন। এই এক সপ্তাহ তাঁরা কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে।'

'আর জয়ন্ত সরকার?'

'উনি একেবারে ফ্লাইট থেকে নেমে হোটেলে উঠেছিলেন। আমরা ডেল্টা এজেন্সির কাছেও খোঁজ নিয়েছি। এখনও অবধি উনি যা-যা বলেছেন, সবই ঠিক বলেছেন।'

প্রফেসর মুখার্জির ভুরু কুঁচকে গেল। খানিকক্ষণ কী যেন একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ফোনের কললিস্টগুলো দেখতে পারি ভাগনেবাবু?'

'এই দেখুন,' বলে একগোছা প্রিন্টেড পেপার প্রফেসর সাহেবের দিকে এগিয়ে দিলেন মনোজ চাকলাদার, 'অলিভিয়া মিত্র আর বলেন্দ্রনাথের কল ডিটেইলস চেক করা যায়নি, কারণ তাঁদের সার্ভিস প্রোভাইডার বিদেশি। বাকি সবার এখানে আছে।'

প্রথমেই যোগেন্দ্র যাদবের কললিস্ট তুলে নিলেন প্রফেসর মুখার্জি। কতগুলো জায়গা আলাদা করে মার্ক করে রাখলেন। তারপর একে একে বাকিদের। শেষে নরেন মিত্তিরের কললিস্ট তুলে দেখতে দেখতে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল, 'মারা যাওয়ার বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই অলিভিয়া'র সঙ্গে নরেন মিত্তিরের ফোনে কথা চলছিল দেখছি। স্ট্রেঞ্জ।'

'সেটাই তো কথা মামাবাবু। দুজনের মধ্যে পুরোনো ভালোবাসা আবার কোনও কারণে জেগে উঠেছিল মনে হচ্ছে।'

'এদিকে রোজ রাতে সুলতানা আর নরেন্দ্রনাথ মিত্রর মধ্যে একাধিক ফোনাফুনি হতো দেখছি। এর মানে কী?'

মনোজ চাকলাদার ইতস্তত করলেন, তারপর ধীরে বললেন, 'মামাবাবু, সুলতানা আর নরেন্দ্রনাথের মধ্যে খুব সম্ভবত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাকে আপনি অসমবয়সী বন্ধুত্ব বলবেন বা অন্য কিছু, সে জানি না।'

প্রফেসর মুখার্জি সোজা হয়ে বসলেন, 'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

মনোজ চাকলাদার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি মাঝেমধ্যেই সবাই চলে গেলেও সুলতানা বিভিন্ন কাজের অছিলায় ওয়ার্কশপে থেকে যেত। আমরা নরেন মিত্তিরের বাড়ির দরজার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে দেখেছি যেদিন যেদিন সুলতানা থেকে যেত, সেদিন সেদিন নরেন্দ্রনাথের সিসিটিভি অফ থাকত। তারপর কী হতো সেটা বলাটা হয়তো ঠিক হবে না।'

তিনজনেই খানিকক্ষণ চুপ রইলেন। প্রফেসর মুখার্জি বিড়বিড় করলেন, 'তাহলে কি সেইদিনও সুলতানা রয়ে গেছিল সবাই চলে যাওয়ার পর? সেই জন্যেই কি

নরেন মিত্তিরের সিসিটিভি অফ ছিল?'

মনোজ চাকলাদার আর মনুজেন্দ্র দুজনেই চুপ রইলেন। প্রফেসর মুখার্জি ফের কললিস্ট চেক করতে লাগলেন, 'হুম। জয়ন্ত সরকারের কললিস্টের বেশ কিছু জায়গা মার্ক করা কেন?'

'জয়ন্ত সরকারের সঙ্গে এমন বেশ কিছু লোকের ফোনাফুনি হয়েছিল যারা, যাকে বলে দাগী আসামী, হিস্ট্রি শিটার। এরা বিভিন্ন বেআইনি কন্ট্রাব্যান্ড প্রোডাক্টের কারবার করে। সরকারমশাই এসব সোনার চাঁদদের সঙ্গে কেন আলাপ জমিয়েছিলেন সেটা ওঁকে জিগ্যেস করতে হবে। শুধু তাই নয়, জয়ন্ত সরকারের সঙ্গে দুবার বিপিন হালদারেরও কথা হয়েছিল। জয়ন্ত সরকার কী করে বিপিন হালদারকে চিনলেন, ফোনে কী কথা হয়েছিল সেটার কারণও জানতে হবে।'

'আমার মনে হয় তার হয়তো দরকার হবে না। সরকারমশাই এবং তাঁর এজেন্ডা একেবারে ক্লিন, অন্তত আমার কাছে। তুমি বরং এটা বলো যোগেন্দ্রর ফোনে বেশ কিছু এন্ট্রি আছে যা ট্রেস করা যাচ্ছে না, কেন?'

'ওগুলোই তো সাসপিশনের জায়গা। আইপি অ্যাড্রেস মাস্ক করে কল করা হয়েছিল, যাতে স্ক্রিনে নাম্বার না ওঠে, বা ট্রেস করা না যায়।'

খানিকক্ষণ কাগজগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'গুড। এবার উঠি তাহলে। মনু, আমাকে একবার জয়ন্ত সরকারের ওখানে ছেড়ে দেবে কাইন্ডলি?'

'কেন স্যার? আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ বাকি আছে নাকি?'

'আহা, এক্স সিবিআই বলে কথা। এঁদের সঙ্গে আলাপ করেও কত কিছু শেখা যায় বলো তো মনু?'

* * *

জয়ন্ত সরকার দরজা খুলে সহাস্যে বললেন, 'আসুন প্রফেসর সাহেব। আমার মন বলছিল আপনি একবার আসবেন।'

'সে কী সরকারমশাই! আপনি গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে জ্যোতিষচর্চাও করেন নাকি?'

'কথাটা মন্দ বলেননি। দুটোর মধ্যে তফাত নেই বললেই চলে। দুটোতেই ধৈর্য সহকারে পর্যবেক্ষণ করার আর যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করার ক্ষমতা লাগে। আর লাগে ইনফরমেশন প্রসেস করার ক্যালি। ব্যস। আর কী চাই।'

'কথাটা খারাপ বলেননি মিস্টার সরকার। সে যাই হোক। আজ আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি। ফেরাবেন না আশা করি।'

'সার্টেনলি। বলুন না।'

'অলিভিয়া মিত্র আর নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ডিভোর্স কেন হয়েছিল সেটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।'

'সে তো ডিটেইলসে বললাম সেদিন।'

'উঁহু, আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে আরও কিছু কেস আছে যেটা আপনি

চেপে যাচ্ছেন, বলছেন না।'

হাসলেন জয়ন্ত সরকার, 'আচ্ছা! কিন্তু তার বদলে কী পাব?'

'আজ রাতের বেলায় একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট পাব বলে আশায় আছি। যদি পাই, কাল আপনাকে একটা ম্যাজিক দেখাব, প্রমিস। আর আপনি কাল বিকেলের দিল্লির ফ্লাইট বুক করতে পারবেন।'

জয়ন্ত সরকার উঠে গিয়ে একটা ব্ল্যাক ডগের বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এলেন। দুটো লার্জ পেগ বানিয়ে একটা গ্লাস তুলে দিলেন প্রফেসর মুখার্জি হাতে।

'তাহলে শুনুন প্রফেসর মুখার্জি। আমরা যা জেনেছি, তার পুরোটাই আপনাকে জানাচ্ছি।'...

* * *

প্রফেসর সাহেব যখন হোটেল থেকে নেমে এলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে। দুজনেই সামান্য টলছেন। জয়ন্ত সরকার বললেন, 'তাহলে কাল বিকেলের দিল্লির ফ্লাইট বুক করতে পারি তো প্রফেসর?'

'একদম পারেন সরকার মশাই। চিন্তাহরণ মুখার্জির কথার নড়চড় হয় না। আসুন এবার একটু সিগারেট সেবা করুন দেখি।'

জয়ন্ত সরকার হাতজোড় করে বললেন, 'মাফ করবেন। সিগারেট ছাড়তে হয়েছে ডাক্তারের আদেশে। আপাতত এই দিয়ে কাজ চালাচ্ছি।' বলে পকেট থেকে একটা চৌকো স্ট্রিপ বার করে নিজের হাতে লাগিয়ে নিলেন।

প্রফেসর মুখার্জি সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বললেন, 'ওটা কী?'

'নিকোটিন প্যাচ। চামড়ায় সেঁটে থাকলে বডিতে ধীরে ধীরে নিকোটিন রিলিজ করে, শরীরকে নিকোটিনের অভাব বুঝতে দেয় না।'

প্রফেসর মুখার্জি নিকোটিন প্যাচের দিকে তাকিয়ে গোলগোল চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর হাতে ধরা সিগারেট পুড়ে যেতে লাগল। চোখ দুটো যেন পাথরের। প্রায় মিনিট খানেক পর অস্ফূটস্বরে বললেন, 'তাই তো! হোয়াই নট, হোয়াই নট?'

তড়িঘড়ি নিজের মোবাইল বার করলেন প্রফেসর মুখার্জি। একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। একটু পর ওদিক থেকে সাড়া এল, 'হ্যালো, হু ইস দিস?'

প্রফেসর মুখার্জি গলায় মধু ঢেলে বললেন, 'গুড ইভনিং ম্যাডাম, প্রফেসর চিন্তাহরণ মুখার্জি স্পিকিং। একটা জিনিস জানার ছিল বলে ফোন করলাম। বিরক্ত করলাম না তো?'

'এত রাতে ফোন করলে বিরক্ত হওয়ারই কথা। বলুন কী জানতে চান।'

'বলছি আপনি তো নেশা বিশেষজ্ঞ! এমন কোনও নেশার কথা জানে যা স্কিন দিয়ে অ্যাবজর্ব করা যায়? মানে ধরুন চিবোতে, গিলতে, স্মোক করতে, বা শুঁকতে হল না, ইঞ্জেকশনও নিতে হল না, জাস্ট গায়ে পারফিউমের মতো স্প্রে করলাম আর বেশ একটা ফুরফুরে নেশা হল, আছে এমন কিছু?'

মনে হল ফোনের ওপাশে যেন বোম ফাটল একটা। অলিভিয়া মিত্রর গলার

আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল বোধহয় রাস্তার ওপার থেকেও। ভদ্রমহিলা যেগুলো বলছিলেন, সেগুলো যে খুব সুখের বা আনন্দের কিছু নয় সেটা প্রফেসরের মুখ দেখেই মালুম হচ্ছিল।

লাভা উদগীরণ থামলে প্রফেসর মুখার্জি ফোনটা কাটলেন। তারপর জয়ন্তবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে বললেন, 'আসলে বড্ড গুণী মানুষ তো, তাই রাগটা একটু বেশি, বুঝলেন।'

জয়ন্তবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই প্রফেসর মুখার্জি অন্য কাকে যেন কল করা শুরু করে দিয়েছেন। চাপা স্বরে বললেন, 'মনোজ, মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। অলিভিয়া আর বলেন্দ্রনাথ যে যে হোটেলে উঠেছেন এখনই তাদের ম্যানেজারদের ফোন করো। আমার ধারণা খুব শিগগিরই এরা দুজনে হোটেল থেকে চেক আউট করার চেষ্টা করবে। তখনই যেন তোমার কাছে খবর আসে। টালবাহানা করে ওঁদের যেন আটকে রাখা হয় যতক্ষণ না তোমার টিম পৌঁছচ্ছে। দুজনকেই গ্রেফতার করবে। ইয়েস, দুজনকেই। সাবধান, দুজনের কাউকেই এমব্যাসিতে ফোন করতে দেবে না।'

'আপনি কি খুনিকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন মামাবাবু? তাহলে কী...'

'হ্যাঁ এডিজি সাহেব। কেসটা আমার সামনে এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মার্ডার ওয়েপনটা এক্স্যাক্টলি কী সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছি। হ্যাঁ, অলিভিয়া মিত্র'ই খুন করেছেন নরেন মিত্তিরকে। তাঁকে যথাযোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভাই বলেন্দ্রনাথ।'

'শিওর?'

'নাইনটি নাইন পার্সেন্ট। বাকি এক পার্সেন্টও নিশ্চিত হয়ে যাব সে মুহূর্তে দুই মক্কেল চেক আউট করে পালাবার চেষ্টা করবেন। এবং সে চেষ্টা তাঁরা করবেনই। বাই দ্য ওয়ে, যোগেন্দ্র যাদবের খোঁজ পাওয়া গেল?'

'হ্যাঁ মামাবাবু। তবে ওর নাম যোগেন্দ্র যাদব নয়, রহমত শেখ। দাগী হিস্ট্রি শিটার। এরকম ধুরন্ধর ক্রিমিনাল কলকাতা শহরে কমই আছে। কম্পিউটার চালাতেও দক্ষ। পারে না হেন কাজ নেই। সে এখন হাড়কাটা গলির মধ্যে তার পুরোনো আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। তবে আমাদের লোক প্লেন ড্রেসে চারিদিক ঘিরে রেখেছে। ওর পালাবার পথ নেই।'

'তাহলে আর কী। শ্রদ্ধেয় রহমত শেখকে সসম্মানে গ্রেপ্তার করে আজ রাতের মধ্যে নিজেদের হেফাজতে নাও। দেওর বউদি বেশি ত্যান্ডাই ম্যান্ডাই করলে রহমত শেখকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা শুনিয়ে দেবে। আশা করি তাতেই কাজ হবে।'

'ওক্কে স্যার। কিন্তু কীভাবে, কেন...'

'সব বলব ভাগনে। কাল সবাইকে, মানে নরেন মিত্তিরের দুই সহকর্মী, বটকৃষ্ণ পাল, মনুজেন্দ্র সবাইকে বেলা এগারোটা নাগাদ আমার বাড়িতে আসতে বলো। সেখানেই সব খোলসা করে বলব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়ন্ত সরকারও থাকবেন। তিনি না থাকলে এই কেস সলভই হতো না। কিন্তু শুধু সলভ করলেই তো হল না, খুনিদের যাতে আদালতে অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করা যায়, তার জন্য এখনও কিছু

প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। মনুজেন্দ্র অ্যান্ড হিস টিম সেটা ভালোভাবেই পারবে, আমার হেল্পের আর দরকার হবে না।'

'আমাদের মনু আবার রহমতকে থার্ড ডিগ্রি সহ আপ্যায়ন করার জন্য ভারি উতলা হয়ে উঠেছে মামাবাবু।'

'মনুকে একটু ধৈর্য ধরতে বলো। ও হাতের সুখ করে নেওয়ার চান্স পাবে।'

ফোনটা কেটে প্রফেসর মুখার্জি জয়ন্ত সরকারকে বললেন, 'কাল তাহলে এগারোটা নাগাদ আমার বাড়িতে দেখা হচ্ছে। মনুজেন্দ্র আপনাকে পিক করে নেবে, কেমন?'

বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন গেট ছেড়ে। একটা ফাঁকা চলতি ট্যাক্সিকে থামিয়ে উঠে পড়লেন। সেদিকে খানিক অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন জয়ন্ত সরকার। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'আজব পাবলিক তো!'

* * *

প্রফেসর মুখার্জি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা পনেরো বাজে। তাঁর ড্রয়িং রুম একেবারে ভর্তি। রাজকুমার, সুলতানা আর জয়ন্ত সরকার একটা সোফা ভাগাভাগি করে বসেছেন। মনোজ চাকলাদার, আর মনুজেন্দ্র দুটো সিঙ্গল সিটার সোফায়। ঘরের এক কোণায় একটা চেয়ারে বসে আছেন বটকৃষ্ণ পাল, মুখে একটা জর্দাপান।

প্রফেসর মুখার্জি শুরু করলেন,

'আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি প্রয়াত নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিপিন হালদারের মৃত্যু রহস্য নিয়ে কিছু আলোচনা করতে। আপনারা জানেন, কাল রাতে অলিভিয়া এবং বলেন্দ্রনাথ মিত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুজনে প্রাথমিকভাবে তাঁদের অপরাধ স্বীকারও করেছেন। এবার আমি কী করে ওঁদের চিহ্নিত করতে পারলাম, সেটাই বিশদে বলব।

আমরা জানি নরেন্দ্রনাথ একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান পারফিউম বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বহুদিন বিদেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তারপর কোনও একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই কর্মজীবনের ইতি ঘটে এবং তিনি কলকাতা ফিরে আসেন।

নরেন্দ্রনাথ একজন একলা মানুষ ছিলেন। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ডিভোর্স হয়ে যায়, এবং জানা যায় যে নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও তাঁর বাক্যালাপ ছিল না। তিনি দেশে ফিরে কাজের লোকদের সহায়তায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন এবং একটি অত্যাধুনিক পারফিউমারি গড়ে তোলেন যেখানে বহুমূল্য পার্সোনালাইজড পারফিউম তৈরি হতো। এই পারফিউম বিক্রির জন্য তিনি একজন এজেন্ট নিয়োগ করেন, নাম বিপিন হালদার। বিপিন হালদারের একটি পারফিউমের দোকান আছে নিউ মার্কেটে, নাম শ্রীগুরু কসমেটিকস।

আজ থেকে কয়েকদিন আগে নিজের বাড়িতে এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র খুন হন। মৃত্যুর কারণ বিষপ্রয়োগ। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিষটা

কী ভাবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে সেটা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারছিলেন না। তার ওপর সেদিন তাঁর দরজায় লাগানো সিসিটিভিও অফ ছিল। ফলে কে এসেছিল তার কোনও চিহ্ন ছিল না।

নরেন্দ্রনাথ যেদিন মারা যান তাঁর আগেরদিন তাঁর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছিলেন। তার পরের দিন দুপুরবেলা নরেন্দ্রনাথ বিপিনকে তাঁর বাড়িতে ডাকেন। তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়, কেউ জানে না। ঘণ্টা খানেক বাদে বিপিন বেরিয়ে যায়। সন্ধেবেলা তাঁর কর্মচারীরা সবাই চলে যায়। রাতের বেলা কেউ একজন আসে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে, এবং খুন করে যায়।

নরেন্দ্রনাথ যেদিন মারা যান, তার ঠিক দুদিনের মাথায় বিপিন হালদারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশ থেকে। ফরেনসিক রিপোর্টে জানা যায় তাকেও একই বিষপ্রয়োগে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই রাতেই শ্রীগুরু কসমেটিকস-এ হানা দিয়ে আততায়ীরা মিত্তিরমশাইয়ের কাছ থেকে কেনা সমস্ত পারফিউমের শিশি চুরি করে নিয়ে যায়। এখানেই শেষ না। যেসব কাস্টমারদের কাছে নরেন্দ্রনাথের বানানো লেটেস্ট পারফিউমের শিশি পৌঁছেছিল সেগুলোও এক এক করে চুরি যায়। শুধু একজনকে বাদ দিয়ে।

সব দেখেশুনে আমরা বুঝতে পারি যে একটি অত্যন্ত টেকনিক্যালি সফিস্টিকেটেড এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির র‍্যাকেট এই সব কিছুর পেছনে আছে। শুধু যেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না, সেটা হচ্ছে যে এই খুন আর চুরি কেন হচ্ছে, এর মোটিভ কী।

এবার এই মোটিভ জানতে গেলে নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে আরও ভালো করে চিনতে হয়, তাঁর জীবনের ইতিহাস জানতে হয়। অথচ আমাদের সামনে তেমন কোনও পথ ছিল না।

এইসময় আমাদের যোগাযোগ শ্রীজয়ন্ত সরকারের সঙ্গে। এখানে বলে রাখা ভালো, এই রহস্য উদঘাটন করতে শ্রীসরকার আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। ইনি একজন প্রাক্তন সিবিআই কর্তা, এবং বর্তমানে একটি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির উচ্চপদে আসীন।

সরকারমশাই কলকাতা এসেছিলেন একটা অন্য তদন্তে। তার সঙ্গেও নরেন্দ্রনাথ মিত্র জড়িত ছিলেন। সেটা হচ্ছে নকল পারফিউমের ব্যবসা। আর জয়ন্তবাবুর সূত্রেই জানতে পারি, পূর্বভারত, তথা গোটা দেশে সেরা নকলি পারফিউমের সাপ্লায়ার আর কেউ নন, আমাদের নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বয়ং!

সামনে এগোবার আগে নকল পারফিউমের ব্যাপারটা আপনাদের সবাইকে একটু খোলসা করে বলি। এমন নয় যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রর আগে পারফিউমের নকল হতো না। দিব্যি হতো, এখনও হয়, পরেও হবে। কিন্তু মিত্তির মশাই এই আর্টকে একেবারে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছিলেন।

প্রতিটি পারফিউমেরই সুগন্ধের তিনটি স্টেজ থাকে, টপ নোট বা হেড নোট, মিডল নোট বা হার্ট নোট আর বেস নোট। টপ নোট হচ্ছে পারফিউমের প্রথম যে লেয়ারটা আপনার নাকে আসে, সেইটা। এটা বেশিক্ষণ থাকে না। এর পরের লেয়ারটা হচ্ছে মিডল নোট। এটাই পারফিউমের আসল অংশ, যাকে বলে বডি অফ দ্য সেন্ট। এই লেয়ার বেশ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। আর এর পর যেটা পড়ে থাকে

তাকে বলে বেস নোট বা ড্রাই ডাউন নোট। এ প্রায় একদিনের কাছাকাছি স্থায়ী হয়।

একটা জেনুইন পারফিউমের সেন্ট সময়ের সঙ্গে ইভলভ করে, তার কারণ এই তিনটি নোটের কমপ্লেক্স কমপোজিশন। যিনি এই তিনটে সার্থকভাবে মেশাতে পারেন, তিনিই একজন সফল সুগন্ধি প্রস্তুতকারক।

নকল পারফিউমের মূল মন্ত্র হচ্ছে টপ নোট কপি করা। বাকিটা সস্তা কেমিক্যালের গোঁজামিল দেওয়া হয়। তাই একে তো তার গন্ধের মধ্যে ওই ইন্ট্রিকেট কমপ্লেক্স ব্যাপারটা থাকে না, দ্বিতীয়ত টপ নোট উবে গেলেই তার দৈন্যদশা প্রকট হয়ে পড়ে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র সত্যিই একজন প্রতিভাবান কেমিস্ট ছিলেন। তিনি এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যাতে নকল পারফিউমেরও সবক'টি নোট, তাদের কমপ্লেক্সিটি, স্ট্রাকচার সব নিঁখুত থাকে। অথচ দাম আসল পারফিউমের প্রায় এক দশমাংশ।

আমাদের কাছে থাকা সূত্র অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথকে এই দু-নম্বরি ব্যবসায় আনেন ওঁর স্ত্রী অলিভিয়া। অলিভিয়া একজন অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। ওঁর চেনা জানাও কম নয়। প্রথমে আপত্তি করলেও নরেন মিত্তির ধীরে ধীরে এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। আর এই দুনম্বরি ব্যবসায় ওঁদের সাহায্য করতেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ভাই বলেন্দ্রনাথ মিত্র।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের বিশেষ বনিবনা ছিল না। কিন্তু কোনও গতিকে অলিভিয়ার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। ব্যবসার কারণেই বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রচুর সাপের বিষ সাপ্লায়ারদের আলাপ আছে। ব্যবসাটা খুব যে পরিচ্ছন্ন নয় সে বুঝতেই পারছেন। যারা সাপের বিষ সাপ্লাই করে, তাদের অনেকে অন্যান্য অনেক শেডেড বিজনেসে সঙ্গেও যুক্ত থাকে। নরেন মিত্তির তাঁর ভাইয়ের মাধ্যমে নকলি পারফিউমের ব্যবসা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেন।

ব্যবসা ভালোই চলছিল। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ ও অলিভিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

বিদেশে থাকার সময় নরেন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করেন। সেটি হচ্ছে এমন একটি লিকুইড, যেটি চামড়ার মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়ে নেশার অনুভূতি জোগায়। মানে আপনাকে ধোঁয়া টানতে হবে না, কোনও পানীয় গলায় ঢালতে হবে না, ইঞ্জেকশন নিতে হবে না, কিছু শুঁকতে হবে না, এমনকী জিভে সাপের ছোবলও নিতে হবে না, জাস্ট পারফিউমের মতো গায়ে স্প্রে করে নিলেই হল, সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র নেশার অনুভূতি।

এই জিনিস বাজারে আসা মাত্র মাদক ব্যবসায়ীরা যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুফে নেবে সে বলা বাহুল্য। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলেন্দ্রনাথ তো আছেনই। তিনি তাঁর ব্যবসার ভার নিজের স্ত্রী'কে দিয়ে নিজে দুনিয়া জুড়ে সাপের বিষ আর অন্যান্য বিচিত্র সব মাদকদ্রব্য আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় মন দিয়েছেন।

কিন্তু একটা প্রবলেম ছিল। নরেন্দ্রনাথ যে ফর্মুলেশনটা বানিয়েছিলেন সেটা

নিকোটিনের একটা ডেরিভেটিভ। সেটার ডোসেজ, যা প্রয়োজনমতো একেবারে ঠিক, তার উপরে গেলেই ও জিনিস প্রাণঘাতী বিষ। অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক মাপে গেলে জিনিসটা সেবন করতে হবে। নেশাড়ুকে তো আর এই বলা চলে না যে বাপু, একবারের বেশি দুবার স্প্রে করলেই তুমি অক্কা পাবে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই কেমিক্যালটার প্রয়োগমাত্রা সুস্থির করতে পারছিলেন না। অথচ এটা ছাড়া প্রোডাক্টটা কোনও কাজের না। এই নিয়ে অলিভিয়ার সঙ্গে তাঁর ঝামেলা বাধল। আমি নিশ্চিত এই আবিষ্কারের পেছনে অলিভিয়ার কৃতিত্বও সমান সমান। হাজার হোক তিনি একজন বায়োকেমিস্ট, নেশার বস্তু বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ইন ফ্যাক্ট, আমার ধারণা এই প্রোডাক্টের মূল আইডিয়াটা ওঁর মাথা থেকেই এসেছে।

অলিভিয়ার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট ইস্যু আছে। তিনি রাগের মাথায় মস্ত ভুল করে বসলেন, তাঁদের বেআইনি ব্যবসার ব্যাপারটা নরেন্দ্রনাথের কম্পানিকে জানিয়ে দিলেন। নরেন্দ্রনাথও হয়তো সেটা জানতে পেরে যান। তিনি অলিভিয়াকে ডিভোর্স আর নিজের কম্পানিকে ক্ষতিপূরণ প্লাস মুচলেকা দিয়ে সব গুটিয়ে গাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

অথচ কিছু করতে হবে। নরেন মিত্তিরকে কম টাকা দিতে হয়নি ক্ষতিপূরণ হিসেবে। সেই টাকা উদ্ধার করতেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর নকলি পারফিউমের ব্যবসায় ফিরে গেলেন। সামনে একটা দুর্মূল্য, পার্সোনালাইজড, পারফিউম বেচার ধোঁকার টাটি বজায় রাখলেন।

নরেন মিত্তির কেন দিল্লি মুম্বাই ছেড়ে কলকাতাতেই এলেন তারও কারণ আছে। কলকাতা তাঁর জন্মস্থান তো বটেই, তা ছাড়াও কলকাতায় দামি বিদেশি সুগন্ধির চাহিদা আছে। অন্যান্য শহরের থেকে একটু বেশিই। শুধু উচ্চবিত্ত নয়, কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষও যথেষ্ট পরিমাণে সেন্ট পারফিউম কেনেন। কিন্তু বিদেশি সেন্ট কেনার চল থাকলে কী হবে, বেশিরভাগ ব্র্যান্ডেরই যা দাম সে দাম দিয়ে আসল সেন্ট কেনা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে।

এরই সুযোগ নেয় বেশ কিছু অসাধু কারবারি। কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলে বিদেশি দামি সুগন্ধির নকল তৈরি হয়। অভিজ্ঞ ব্যবহারকারী বা বহুদিনের সুগন্ধি বেচার অভিজ্ঞতা না থাকলে আসলের সঙ্গে সেইসব নকল পারফিউমের তফাত ধরা প্রায় অসম্ভব। বিপিন হালদার ক্রমেই এই ব্যবসার কিংপিন হয়ে উঠছিল। তাই তার হাতে বাড়ি সারানো, বাইক কেনা, বিয়ে করার মতো দ্রুত পয়সা জমছিল।

নরেন্দ্রনাথ কীভাবে বিপিনকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলা মুশকিল। তবে মোডাস অপারেন্ডি ছিল এইরকম, তিনি নকলি পারফিউম বানিয়ে বিপিনকে সাপ্লাই করতেন। আর বিপিন কাবাড়িওয়ালাদের থেকে ফেলে দেওয়া বিদেশি পারফিউমের বোতল কিনে আনত কিলো দরে। তারপর সেগুলো ধুয়ে মুছে সাফসুতরো করে নরেন মিত্তিরের সাপ্লাই দেওয়া নকলি সুগন্ধি ভরে সিল করে দোকান থেকে আসল বলে বিক্রি করত। একদম আসলের দামে। প্রফিটের সিংহভাগ মিত্তিরমশাইয়ের পকেটে যেত, বাকিটা বিপিনের।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পর অলিভিয়া আতান্তরে পড়লেন।

নকলি পারফিউমের ব্যবসা বন্ধ। এক্সট্রা আমদানি বন্ধ। এবার বলেন্দ্রনাথও তাঁর বৌদিকে গঞ্জনা দিতে লাগলেন। ফলে দুজনের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হল।

দীর্ঘ আট বছর গোপন গবেষণার পর অলিভিয়া নরেন্দ্রনাথের আবিষ্কার করা ফর্মুলেশনটি স্টেবল করার একটা পদ্ধতি খুঁজে পেলেন। কিন্তু সেটা প্রয়োগ করে দেখার জন্য নরেন্দ্রনাথের সাহায্য চাই, শুধু ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়, তাঁর কাছেই আসল ফর্মুলেশনটি আছে। অলিভিয়ার কাছে লিকুইডের নমুনা ছিল বটে, কিন্তু তার অনেকটা গবেষণা করতে খরচা হয়ে গেছে, পড়ে আছে অল্পই। ফলে নরেন্দ্রনাথের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রথমেই তিনি খবরটা জানালেন বলেন্দ্রনাথকে। দুজনে ঠিক করলেন যে এবার ফের নরেন্দ্রনাথকে দলে টানা যাক। সেইমত অলিভিয়া নরেন্দ্রনাথকে ফোন করলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন। একে তিনি অলিভিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ভোলেননি। দ্বিতীয়ত নকল পারফিউম বিক্রি করা এক জিনিস, আর কেমিক্যাল মাদক বিক্রি করা আরেক জিনিস। পুলিশ প্রশাসনের হাতে পড়লে হয় যাবজ্জীবন, নয় ফাঁসি যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

এইবার অলিভিয়া আর বলেন্দ্রনাথ দুজনে মিলে একটা ফন্দি আঁটলেন। তাঁরা ঠিক করলেন কলকাতায় এসে নরেন্দ্রনাথকে ভয় দেখিয়ে বা যেভাবেই হোক দলে টানবেন।

বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে রহমত এর আগে থাকতেই যোগাযোগ ছিল। অথবা অলিভিয়া হয়তো ডার্ক ওয়েবের সমুদ্রে সাঁতার কেটে এই রত্নটির খোঁজখবর জোগাড় করেন। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো অলিভিয়া তাঁর প্রাক্তন স্বামীর মতোই একজন তুখোড় সাইবার বিশেষজ্ঞ। ফলে কে এই রত্নটির খোঁজ আগে পান সে ওঁরাই বলতে পারবেন।

যাই হোক, আঁটঘাট বেঁধে দুজনে আসরে নামলেন। মাস দুয়েক আগে নরেন মিত্তিরের আগের ড্রাইভার ভজহরিকে অকুস্থল থেকে সরালেন। সে বেচারি আজ বেঁচে আছে কিনা জানি না, বেঁচে থাকলে তারও একপ্রস্থ এজাহার নিতে হবে। এদিকে প্ল্যানমাফিক ভজহরির জায়গায় শ্রীমান রহমত যোগেন্দ্র যাদব পরিচয় দিয়ে নরেন্দ্রনাথের ড্রাইভারের কাজে ঢুকল। নরেন্দ্রনাথ বুঝতেও পারলেন না যে তিনি একটি ক্রিমিনাল মাইন্ডেড জীবন্ত সিসিটিভির হাতে বন্দি হয়ে গেলেন।

ক্রমেই নরেন মিত্তিরের বাড়ি আর ব্যবসার সব হালহকিকত, গতিবিধি সব দুজনের নখদর্পণে চলে এল। আজ থেকে দিন পনেরো আগে অলিভিয়া নরেন্দ্রনাথকে বললেন তিনি কলকাতা আসছেন, একবার নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান। নরেন্দ্রনাথ নিমরাজি হলেন।

আমার ধারণা, প্রথমে বলেন্দ্রনাথের প্ল্যান ছিল রহমতকে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ল্যাপটপ চুরি করা। তারপর অলিভিয়াই ওঁকে বোঝান যে নরেন মিত্তির শুধু একজন উঁচুদরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নন, ফার্স্ট ক্লাস সাইবার বিশেষজ্ঞও বটে। তাঁর ল্যাপটপের এনক্রিপশন এতই হাই স্ট্যান্ডার্ডের যে অলিভিয়ার মতো সাইবার এক্সপার্টদেরও ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন। তাই নরেন্দ্রনাথকে সরাসরি দলে টানাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

পরিকল্পনামাফিক সব ঠিকঠাক। অলিভিয়া আর বলেন্দ্রনাথ অকুস্থলে পৌঁছে গেছেন। রহমত, ওরফে যোগেন্দ্র একদম রেডি। এমন সময় আসরে প্রবেশ করলেন জয়ন্ত সরকার।

যেদিন অলিভিয়ার নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে যাওয়ার কথা, তার আগেরদিন জয়ন্ত সরকার নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি আগে থেকেই তদন্ত চালাচ্ছিলেন এই নকল পারফিউম বিক্রির ব্যাপারে। তাঁর তদন্তের কাঁটা গিয়ে নির্দেশ করল নরেন মিত্তিরকে।

জয়ন্ত সরকার নরেন্দ্রনাথকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। নরেন্দ্রনাথ সব অভিযোগ অস্বীকার করলেন। জয়ন্ত সরকার ফিরে এলেন।

নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন, একদিকে জয়ন্ত সরকার আরেকদিকে অলিভিয়া মিত্র, এই জোড়া সাঁড়াশি আক্রমণ তিনি সামলাতে পারবেন না। তিনি পরেরদিন বিপিনকে ডাকলেন, তাঁর কাছে থাকা সবক'টি পারফিউমের শিশি বিপিনের দোকানে চালান করলেন। তার মধ্যে একটি শিশিতে তাঁর সেই প্রাণঘাতী বিষও ছিল। বিপিনকে বললেন, অমুক শিশিটা যেন কাউকে না বিক্রি করা হয়।

পরেরদিন অলিভিয়া এলেন। ইতিমধ্যেই যোগেন্দ্র ওরফে রহমত অলিভিয়া আসার আগেই নিপুণহাতে সিসিটিভি অফ করে দিয়েছে। তখন বাড়িতে কেউ নেই। অলিভিয়া অনেক করে নরেন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনলেন না। তবে কথায় কথায় এটুকু জানালেন যে ওই প্রাণঘাতী সুগন্ধির এক শিশি স্যাম্পল হিসেবে তাঁর কাছে আছে। তবে তিনি কিছুতেই সেটা অলিভিয়ার হাতে তুলে দেবেন না।

আগেই বলেছি অলিভিয়ার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট ইস্যু আছে। তিনি সঙ্গে করে তাঁর কাছে থাকা সেই বিষাক্ত পারফিউম নিয়ে এসেছিলেন। রাগের মাথায় সেটা নরেন্দ্রনাথের ঘাড়ে স্প্রে করে দিলেন। তার আগে নিশ্চয়ই মাস্ক পরে নিয়েছিলেন নইলে তাঁরও অক্কা পাওয়ার কথা। নিদেনপক্ষে অসুস্থ তো হতেনই।

নরেন্দ্রনাথ মারা যেতে অলিভিয়ার সম্বিৎ ফিরে এল। ল্যাপটপ তো পাওয়া গেল, কিন্তু গবেষণা শেষ করতে অলিভিয়ার প্রয়োজন ওই ফর্মুলেশনের অন্তত একটি শিশি।

তিনি আর যোগেন্দ্র হাতে গ্লাভস পরে নরেন্দ্রনাথের শোওয়ার ঘর, স্টাডি, টয়লেট, সব আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলেন। বুঝতে পারলেন যে নরেন্দ্রনাথ সেগুলো সরিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোথায় সরাতে পারেন?

এইসময় রহমত অলিভিয়াকে জানাল দুপুরের দিকে বিপিন এসেছিল দেখা করতে। যাওয়ার সময় ব্যাগ ভর্তি করে কিছু নিয়ে যায়। অলিভিয়া অনুমান করলেন নরেন্দ্রনাথ পারফিউমের শিশিগুলো বিপিনের কাছে পাচার করেছেন।

অলিভিয়া সেই রাতেই নরেন মিত্তিরের ল্যাপটপ খুলে বসলেন। কিন্তু নিজের সমস্ত সাইবারজ্ঞান প্রয়োগ করেও ল্যাপটপের সিকিউরিটি ক্র্যাক করতে পারলেন না।

ফলে পরের দিন বিপিনকে পাকড়াও হতে হল। সামান্য কোঁতকা খেয়ে বিপিন গড়গড় করে বলে দিল গত কয়েকদিনে কে কে বিপিনের দোকান থেকে নরেন মিত্তিরের পারফিউম কিনেছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে বিপিন এমন একটা ভুল করেছিল, যেটা ফাইনালি আমাদের জন্য শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। সেটা হচ্ছে যে নরেন মিস্ত্রিরের বারণ সত্ত্বেও ওই বিশেষ শিশিটি সে জনৈক গোপাল শিকদারকে বিক্রি করে দেয়। আর ফাইনালি সেই আঁতেল নেশাড়ু গোপাল শিকদারই আমাদের মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়ায়।

সে যাই হোক, জিজ্ঞাসাবাদের শেষে বিপিন হালদারকে খুন হতেই হল, কারণ অপহরণকারীদের চিনে ফেলার পর তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

এরপর শুরু হলো ট্রেজার হান্ট। প্রথমে বিপিনের দোকান থেকে নরেন মিস্ত্রিরের ফ্যাক্টরি থেকে আসা সমস্ত পারফিউমের শিশি তুলে আনা হল। অলিভিয়া দেখলেন যে তার মধ্যে তাঁর উদ্দিষ্ট শিশিটি নেই। এরপর যারা যারা বিপিনের দোকান থেকে নরেন মিস্ত্রিরের পারফিউম কিনেছিল তাদের সব শিশি সিস্টেমেটিক্যালি চুরি করা হল। কোনও না কোনও গতিকে এদের গতিবিধির খোঁজ অলিভিয়া পেয়েই যাচ্ছিলেন, কারণ ওই যে বললাম, সাইবার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামীর সমকক্ষ না হলেও প্রায় তাঁর কাছাকাছিই প্রতিভাবান।

কিন্তু এত করেও অলিভিয়া তাঁর সাধের পারফিউমের শিশি উদ্ধার করতে পারলেন না। তাঁর শেষ পয়েন্টার এসে দাঁড়ালো গোপাল শিকদারের ওপর।

এদিকে গোপাল শিকদার একটি আদ্যন্ত নেশাখোর প্রাণী। খুব সম্ভবত সাপের চুমকুড়ি ছাড়া বাকি সব নেশাই সে করেছে, করে থাকে। কথায় বলে নিয়তি কেন বাধ্যতে। দৈবের নির্বন্ধাতিশয্যে ওই বিষাক্ত পারফিউমের শিশিটি গোপাল শিকদারেরই কপালে জুটল। সে এক প্রসন্ন দুপুরে গাঁজা খেয়ে, সাপ্তাহিক স্নানযাত্রা সেরে, ব্রেন এবং কিডনি খাটাবার জন্য সেই কালান্তক পারফিউম বগলে স্প্রে করল, এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, কিন্তু অক্কা পেল না। এর কারণ কী?

কথায় বলে স্নেহ জিনিসটা নাকি নিম্নগামী। সেরকমই নেশা জিনিসটা হল উর্ধ্বগামী। মানে আপনি যদি কোনও একটি নেশা করতে করতে দেখেন যে একটা পর্যায়ের পর সেই নেশায় আর তেমন মৌতাত আসছে না, তখন আপনি নেক্সট লেভেলের নেশায় শিফট করে যান। তখন কঠিন এবং কঠিনতর নেশাদ্রব্যের প্রতি আপনার আকর্ষণ, এবং নীচগোত্রীয় নেশাগুলির প্রতি কম করে হলেও এক ধরণের রেজিস্ট্যান্স জন্মায়।

খুব সম্ভবত সেই রেজিস্ট্যান্সই গোপাল শিকদারকে ওই প্রাণঘাতী পারফিউম স্প্রে করার পরেও একেবারে না মেরে জাস্ট অজ্ঞান করে রাখে।

আমাদের সৌভাগ্য যে গোপাল শিকদার হপ্তায় হপ্তায় একবার স্নান করত, আর একমাত্র স্নানের পরেই গায়ে পারফিউম লাগাত। ছোকরার রোজ স্নান করে বডিতে পারফিউম মাখার অভ্যেস থাকলে হয়তো আমরা তার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন পেতাম, কিন্তু রহস্য উদ্ধার হতো না।

আমি যে মুহূর্তে আন্দাজ করতে পারি যে গোপাল শিকদারের কাছে এই রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি থাকলেও থাকতে পারে, সে মুহূর্তে তাকে একটি রিসর্টে শিফট করা হয়, কড়া পাহারা সহ। আর তাকে জেরা করতে গিয়েই এই কেসের ব্রেক থ্রু পাই আমি। রহমতের একটা ছোট্ট ভুল তাকে ধরিয়ে দিল। আমি যোগেন্দ্রকে

জেরা করার সময় তার মোবাইলে যে ব্যাক কভার দেখেছিলাম, সেম ব্যাককভার দেখতে পাই রিসর্টের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ড্রাইভারের হাতে। সেই একই সিংহের মুখ আঁকা, মাথার দিকে অল্প ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই যোগেন্দ্রই ছদ্মবেশে ওখানে উপস্থিত হয়েছে। আর তার একটিই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, গোপাল শিকদারের কাছে থাকা পারফিউমের শিশিটা চুরি করা।

কিন্তু যোগেন্দ্র ওরফে রহমতকে ট্রেস করা গেলেও আমার ধন্দ কাটছিল না। কী সেই বহুমূল্য জিনিস, যার জন্য দু-দুখানা খুন হয়ে গেল?

ফাইনাল সলিউশন পেলাম কাল রাতে। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখি তিনি সিগারেট রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি হিসেবে নিকোটিনের প্যাচ ইউজ করছেন। বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল বটকৃষ্ণ পালের কথা। দুই ভিকটিমেরই গলায় ঘাড়ে নিকোটিনের ট্রেস পাওয়া যায়। অথচ তাঁরা কেউ খুব বেশি ধূমপান করতেন না। তাহলে কি নরেন্দ্রনাথ নিকোটিনের এমন কিছু ডেরিভেটিভ আবিষ্কার করেছিলেন যা দিয়ে মানুষ খুন করা যায়? আর যদি করে থাকেন, সে বিষয়ে কনফার্ম করার সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ কে? অবশ্যই তাঁর স্ত্রী অলিভিয়া মিত্র।

আমি অলিভিয়াকে তৎক্ষণাৎ ফোন করলাম। তাঁর রিয়্যাকশন শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম পাখি এবার ফাঁদে পড়েছে। জানতাম, কাল রাতেই অলিভিয়া আর বলেন্দ্রনাথ দেশ ছাড়ার চেষ্টা করবেন। কারণ তাঁরা বুঝে গেছেন যে আমি জেনে গেছি!

ব্যস, তারপর আর কি। দুইজনেই এখন পুলিশ কাস্টডিতে আছেন। বাকি কাজ সি আই ডি'র। আমার কাজ ফুরোলো, গল্পের নটে গাছটি মুড়োলো!'

প্রফেসরের কথা শেষ হতেই সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন। রাজকুমার অভিভূতস্বরে বলল, 'অসাধারণ স্যার, আউটস্ট্যান্ডিং।'

বটকৃষ্ণ পাল বিষাদের সঙ্গে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু নরেনবাবুর খুন হওয়াটা মেনে নিতে পারছি না। অমন প্রতিভাবান মানুষ লাখে একটা মেলে।'

প্রফেসর মুখার্জিও গলায় দুঃখ ঢেলে বললেন, 'সে আর বলতে! ভাবুন তো, নেশা করা যায় এমন একটা পারফিউম থাকলে কত সুবিধা হতো। স্যাটাস্যাট স্প্রে করছেন, ফটাফট হাই হয়ে যাচ্ছেন। খাওয়া, শোঁকা বা ফোঁকাফুঁকির কোনও ব্যাপারই নেই।'

মুখার্জি গিন্নি সবার জন্য চা আনছিলেন। শেষের কথাটা শুনে প্রফেসর সাহেবের দিকে রাগত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'মরণ!'



আত্মহত্যার অন্দরমহল

ওপরতলা থেকে নির্দেশ পাওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়েছিল মনুজেন্দ্র। তার বাড়ি থেকে দমদম এয়ারপোর্ট যেতে খুব কম করে হলেও এক ঘণ্টা লাগে। এখন বাজে সাড়ে ন'টা, ফ্লাইট নামবে সাড়ে এগারোটা নাগাদ। অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় হাতে রাখতে চায় মনুজেন্দ্র। প্রফেসর মুখার্জিকে রাজি করাতে এই সময়টা তার চাই।

প্রফেসর মুখার্জি তাঁর লেকটাউনের বাড়িতে ড্রয়িংরুমের সোফায় আধশোয়া হয়ে একটা ঢাউস বই পড়ছিলেন। গডস অ্যান্ড গডেসেস অফ অ্যাজটেক সিভিলাইজেশন। মনুজেন্দ্রকে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'আরে, এসো ব্রাদার, এসো। তারপর অনেক দিন পর হঠাৎ এই রাস্তায়? পথ ভুলে নাকি?'

মনুজেন্দ্র ডাহা গুল দিয়ে শুরু করল, 'আর লজ্জা দেবেন না স্যার। কাজ ছাড়া আসা হয় না ঠিকই। তবে আজ আর কাজ নয়, এমনিই এসেছি, আড্ডা মারতে। আসলে যাচ্ছিলাম এয়ারপোর্ট, এক হাই প্রোফাইল ব্যক্তিকে রিসিভ করে তাঁর বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে হবে। ফ্লাইট ডিলে হয়ে গেছে শুনে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'বটে?' ভারি আশ্চর্য হলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'সি আই ডি তাহলে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে সিকিউরিটি এসকর্টের কাজও করছে? এ তো ভারি অদ্ভুত কথা শোনালে হে! কেসটা কী খুলে বলো তো বাপু।'

কেসটা বিস্তারিত জানাল মনুজেন্দ্র।

'রমেশ সারভানন হচ্ছেন, দেশের একজন অন্যতম প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী। বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হিসেবে তাঁর সমকক্ষ বিজ্ঞানী দেশে কেন, বিদেশেও কমই আছে। অত্যন্ত মেধাবী এই ভদ্রলোক জন্মেছিলেন কলকাতাতেই, এক তামিল পরিবারে। বাঁধিয়ে রাখার মতো অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার। উচ্চ মাধ্যমিকের মারকাটারি রেজাল্ট করে চলে যান আই আই টি-তে, কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়বেন বলে। তারপর মাস্টার্স আর পি-এইচ ডি করতে সোজা বিদেশে পাড়ি। সবাই ভেবেছিল এবার উনি বিদেশেরই কোনও ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়ে অধ্যাপনায় যাবেন। কিন্তু রমেশ সারভানন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। তিনি বিদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি উপেক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন এবং দেশের সুপার কম্পিউটিং প্রোজেক্টে যোগ দেন। লোকে বলে আজ মহাকাশ গবেষণা বা মিলিটারি টেকনলোজিতে প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ভারতের এগিয়ে থাকার অন্যতম কারিগর এই রমেশ সারভানন। এখন তিনি চেষ্টা করছেন কীভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি আর মেশিন লার্নিং-এর সাহায্যে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায়।'

এহেন রমেশ সারভানন এসেছেন কলকাতায়। দু-দিন থেকে ব্যাঙ্কক যাবেন একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। এমনিতেই শত্রুদেশের ডিফেন্স সায়েন্টিস্টদের ওপর হামলা নতুন কোনও কথা না, আর ভারতের শত্রুসংখ্যাও কম নয়। তাই রমেশ সারভানন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে একটা সিকিউরিটির কভার পেয়ে থাকেন। এই কদিন কলকাতা পুলিশকে তাঁর দেখভাল করতে হবে। সেই নিয়ে একটা টিম গঠন করা হয়েছে আর কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই টিমে মনুজেন্দ্রকেও শামিল করা হয়েছে।

মনুজেন্দ্রর জন্য অন্দরমহল থেকে ব্ল্যাক কফি আর কুকিজ এল। প্রফেসরসাহেব কফি খান না, তাঁর পছন্দ দার্জিলিং টি। তিনি চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তা এই হাই প্রোফাইল বিজ্ঞানীটির কে কে আছেন কলকাতায়?'

'কেউ নেই। মা-বাবা মারা গেছেন বহুদিন হল। এক ভাই ছিলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন। বছর কয়েক আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। রমেশ সারভানন অকৃতদার। তাঁর ভাই সুরেশ, যিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান, তিনি বিয়ে করেছিলেন। সুরেশ আর তাঁর স্ত্রীর নিজের কীসের একটা ব্যবসা আছে। ভদ্রমহিলা কালেভদ্রে আসেন, কয়েকদিন থাকেন আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যান।'

'বাড়িতে তাহলে থাকে কে? কেয়ারটেকার গোছের কেউ নেই?'

'পরিষ্কার জানি না। আজ কথা হলে জানতে পারব। যাবেন নাকি?'

শেষের প্রস্তাবটা এতই আকস্মিক যে প্রফেসর মুখার্জি হকচকিয়ে গেলেন, 'কোথায় যাব?'

'এই রমেশবাবু সঙ্গে একটু আলাপ করতে?'

'মানে? এ কি রথের মেলা, নাকি পাড়ার মাচা ফাংশন, যে দেখতে যাব?'

'আহা, তা নয়।' হাঁ-হাঁ করে ওঠে মনুজেন্দ্র, 'আপনি একটু সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, এই আর কি। আপনার ব্যাপারে মনোজ স্যার অলরেডি আলোচনা করে ক্লিয়ারেন্স নিয়েই রেখেছেন।'

'সে কী? কেন?' প্রফেসর মুখার্জি আরও বিস্মিত!

এইবার এতক্ষণে ব্যাপারটা খোলসা করে জানায় মনুজেন্দ্র।

সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে খবর আছে যে, এই সফরে রমেশ সরভাননের ওপর একটা অ্যাটাক হতে পারে। সেটা কলকাতাতে, না ব্যাঙ্ককে জানা যাচ্ছে না। তাই স্থানীয় স্তরে কলকাতা পুলিশ আর সি আই ডি-কেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নইলে প্রফেসর সাহেব ঠিকই বলেছেন, এসব কাজ সি আই ডি-র নয়।

মনোজ চাকলাদার, এডিজি সি আই ডি-র ইচ্ছে, আজ যখন রমেশ সারভাননকে ওঁর বাড়িতে ছাড়তে যাওয়া হবে, তখন যেন প্রফেসর সাহেব সঙ্গে থাকেন। আর কিছু না, যদি কোথাও কোনও অসঙ্গতি তাঁর নজরে আসে তো যেন মনুজেন্দ্রকে জানান তিনি।

প্রফেসর মুখার্জি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তোমার কথাবার্তা ক্রমেই বাংলা ক্রাইম থ্রিলারের মতোই অবাস্তব শোনাচ্ছে ভায়া। কলকাতা পুলিশ যথেষ্ট দক্ষ আর

পেশাদার আরক্ষাবাহিনী। তারা যখন কারও সিকিউরিটির দায়িত্ব নিয়েছে আর তার ওপর সেখানে সি আই ডি-ও আছে, সেখানে আমার মতো একজন আদ্যন্ত সেলস মার্কেটিং-এর প্রফেসর গিয়ে কোন ভেরেন্ডাটা ভাজবে শুনি? না হে বাপু, তোমাদের এডিজি সাহেবের মাথাটা বোধহয় একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। আমি ওসব ধ্যাষ্টামোর মধ্যে নেই।'

কিন্তু প্রফেসর মুখার্জির কোনও ওজর আপত্তিই টিকল না। হাজার হোক ওপরওয়ালার নির্দেশ। মনুজেন্দ্র প্রায় জোর করেই প্রফেসর সাহেবকে গাড়িতে তুলে রওনা দিল এয়ারপোর্টের দিকে।

* * *

রমেশ সারভাননের সঙ্গে প্রফেসর মুখার্জির প্রথম মোলাকাতটা খুব একটা সুখের হল না। ভদ্রলোক এমনিতেই একটু রুক্ষ মেজাজের। প্রফেসর মুখার্জির পরিচয় শুনে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'যেখানে কলকাতা পুলিশ আর সি আই ডি আমার সিকিউরিটির দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে হু হিজ হি? হোয়াট ইজ হিজ রোল হিয়ার? হি সার্টেনলি ডাসনট লুক লাইক আ পোলিস অর সিকিউরিটি পার্সোনেল।'

মনুজেন্দ্রর চোয়াল শক্ত হল। সে ভাবলেশহীন সুরে বলল 'হি হ্যাস দ্য ডিরেক্টিভস অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স ফ্রম টপ লেভেল স্যার।'

'অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টপ লেভেল?'

'এডিজি সি আই ডি অ্যান্ড কমিশনার অফ পোলিস, স্যার।'

শ্রাগ করলেন রমেশ সারভানন। তারপর হাতের ছড়িটা উঁচিয়ে প্রফেসর মুখার্জির দিকে তাক করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই প্রফেসর মুখার্জি সামান্য হেসে বললেন, 'হাই রমেশ, মাই নেম ইজ সি মুখার্জি। আই অ্যাম আ প্রফেসর অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন অ্যাপয়েন্টেড বাই এডিজি সি আই ডি টু লুক আফটার ইওর সিকিউরিটি। হোপ ইউ উইল কো-অপারেট উইথ আস।'

'রমেশ' শুনে থমকে গেলেন রমেশ সারভানন। তিনি স্যার শুনতে অভ্যস্ত। একবার খর চোখে প্রফেসর মুখার্জিকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আই সি। বাংলার পুলিশ আর নিজেদের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না? প্রফেসর অ্যাপয়েন্ট করতে হচ্ছে? তা আপনি কোন সাবজেক্ট-এর প্রফেসর শুনি?'

মনুজেন্দ্র একটু অসহিষ্ণুস্বরে বললেন, 'আমরা কি আলোচনাটা গাড়িতে যেতে যেতে করতে পারি না স্যার?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রমেশ সারভানন, 'ওকে, লেটস প্রসিড। আর প্রফেসরসাব, আপনি একটু আমার গাড়িতে আসুন তো। কোন কোন সাবজেক্ট পড়ান একটু খোঁজখবর নিই।'

মনুজেন্দ্র তার গাড়িতে উঠে পড়ল। প্রফেসর মুখার্জিকে বগলদাবা করে রমেশ সারভানন তাঁর জন্যে আনা কলকাতা পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়লেন। দুটো পুলিশের জিপ তাঁদের ফলো করতে লাগল।

* * *

রমেশ সরভাননের বাড়ি পৌঁছতে বাজল প্রায় একটা। গাড়ি থেকে নেমে মনুজেন্দ্র দেখল প্রফেসর মুখার্জি আর বিজ্ঞানীপ্রবরের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে। দুজনেই হেসে হেসে কথা বলছেন। রমেশবাবু ব্যাগ থেকে চাবি বার করে মনুজেন্দ্রর হাতে দিলেন। কলকাতা পুলিশ আর সি আই ডি-র একটা ছোট যৌথবাহিনী আধুনিক যন্ত্রপাতি আর স্নিফার ডগ সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দখল নিল। তারা চেক করে দেখবে বাড়িতে কোথাও কেউ বিস্ফোরকজাতীয় কিছু লুকিয়ে রেখে গেছে কি না।

অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন লেক থানার ওসি অজয় শাসমল। ইয়াং অফিসার, দেখতে বেশ সুদর্শন। মনুজেন্দ্রকে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন, 'কী খবর দাদা, সব ওকে? আসার পথে কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

মনুজেন্দ্র বেজার মুখে বললেন 'না, তেমন কিছু হয়নি। তবে অত্যন্ত খড়ুস টাইপের লোক। প্রফেসর মুখার্জিকে ইনভলভ করা হয়েছে শুনে মুখ বেঁকিয়ে যেটা মিন করলেন তার অর্থ হচ্ছে যে পুলিশ-টুলিশ কোনও কম্মের না, আমরা অপদার্থ ঢ্যাঁড়স ইত্যাদি ইত্যাদি।'

শাসমল হেসে ফেললেন। তারপর রমেশ সারভানন আর প্রফেসর মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে না। দিব্যি তো হাসিমুখে আড্ডা দিচ্ছেন।'

মনুজেন্দ্র মুখটাকে ব্যাজার করে বলল, 'কী জানি, প্রফেসরসাহেব কোন মন্ত্রে বুড়োকে ঠান্ডা করলেন।'

একটু পরে পুলিশের টিম বেরিয়ে এসে অজয় শাসমলকে অল ক্লিয়ার রিপোর্ট দিল। রমেশ সারভানন প্রফেসর মুখার্জির কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'আসুন, এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

* * *

মনুজেন্দ্র আর অজয় ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখছিলেন। প্রফেসর মুখার্জি আর রমেশবাবু সোফায় বসে গল্প করছেন। বাকি পুলিশের টিম বাড়ির বাইরে নিজেদের পজিশন নিয়ে নিয়েছে।

দোতলা বাড়ি। নীচে বসার জায়গা, কিচেন, লাইব্রেরি আর কমন টয়লেট। ওপরে চারটে শোবার ঘর, সবক'টার সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথরুম আছে। সাদামাটা ছিমছাম অন্দরসজ্জা। বসার জায়গায় এল শেপের সোফা। উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা আটচল্লিশ ইঞ্চির টিভি। দেওয়ালে এক বৃদ্ধ দম্পতির ছবি ঝুলছে, অনুমান করা যায় এঁরা রমেশ সারভাননের বাবা-মা।

'বাবা মারা যান আমার গ্র্যাজুয়েশনের সময়। একটা হার্ট অ্যাটাক, সব শেষ।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় অবধি পাওয়া যায়নি। ভাই সুরেশ তখন প্লাস টু দেবে। মা খুব শকড হয়েছিলেন ঘটনাটাতে। তারপর তিনিও আর বছর তিনেকের বেশি বাঁচেননি। আমি তখন বিদেশে একটা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করার চান্স পেয়েছি। ভাইকে বললাম, তুইও চল আমার সঙ্গে। কিন্তু গেল না। ওর মাথায় তখন ব্যবসা করার ভূত চেপেছে।

আমার মামা-মামি থাকতেন অস্ট্রেলিয়াতে। ওঁদের ফার্নিচারের ব্যবসা ছিল। ছেলেমেয়ে নেই। তাঁরা সুরেশকে নিয়ে গেলেন ওখানে। ব্যস, আমিও ঝাড়া হাত-পা। প্রথমে ইউ এস এ, তারপর কানাডা। তারপর দেশে ফিরে ব্যাঙ্গালোর। বাকিটা তো জানেনেই।'

'আর আপনার ভাই? তিনি এখনও অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন?' প্রফেসর মুখার্জি জেনেশুনে ন্যাকা সাজলেন।

বিষন্নমুখে মাথা নাড়লেন রমেশ সারভানন, 'নেই। অস্ট্রেলিয়াতে থাকার সময়েই সুরেশ বিয়ে করে। মেয়েটি আমাদেরই স্বজাতি, নাম রামিয়া সুন্দররাজন। তারপর ওরা আজ থেকে বছর চারেক আগে কলকাতা ফিরে আসে। ভেবেছিল এখানে একটা বুটিক ফার্নিচারের আউটলেট খুলবে। কিন্তু এখানে ওরা শিফট করার পরই হঠাৎই সুরেশ মারা যায়, হার্ট অ্যাটাকে। রামিয়াও খুব ভেঙে পড়েছিল। তারপর ও অস্ট্রেলিয়া চলে যায়।' রমেশ সারভাননের চোখ ছল ছল করে এল, মনে হল কেঁদে ফেলবেন।

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল মনুজেন্দ্র, এই একটু আগেই লোকটার মুখে কী তীব্র অশ্রদ্ধা আর ঔদ্ধত্য দেখেছে সে। আবার এখন মনে হচ্ছে টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত ভারতীয়। মনেই হচ্ছে না, এই সেই দুর্মুখ উদ্ধত বিজ্ঞানী রমেশ সারভানন।

'বাড়ি কী সেই থেকে ফাঁকা পড়ে আছে?'

'না, না। তা কেন। আমি তো বছরে দু-একবার আসি। রামিয়া-ও আসে বছরে একবার করে। হাজার হোক, প্রপার্টিতে ওরও ভাগ আছে। এই তো মাস দুয়েক আগেই এসেছিল। আমি অবশ্য তখন ইজরায়েলে, একটা ডিফেন্স অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত, তাই দেখা হয়নি।

'তবে আজকাল অনেকেই বলেছেন বাড়িটা বিক্রি করে দিতে। সাউথ ক্যালকাটায় লেকের পাশে এমন জমি, ভ্যালুয়েশন বোঝেনই তো। অনেকেরই নজর আছে এই বাড়ির ওপর। কিন্তু আমি বা সুরেশ, কেউই বেচার কথা ভাবিনি। আসলে কী বলুন তো, মা বাবার স্মৃতি তো, ঝট করে বিক্রি করতে মন চায় না। তাছাড়া আমি বিয়ে করিনি। রামিয়ারও কোনও বাচ্চাকাচ্চা নেই। এত টাকা নিয়ে আমাদের হবেটা কী?'

'তাহলে বাড়ির দেখাশোনা কে করেন?'

'কেন, শঙ্কর কাকা আছেন তো, এই বাড়ির কেয়ার টেকার।'

মনুজেন্দ্র আর প্রফেসর মুখার্জির মধ্যে চোখাচোখি হল।

'শঙ্কর সাধু, আমাদের শঙ্কর আঙ্কেল, বাবার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে

আছেন। আমি আর সুরেশ বলতে গেলে ওঁর হাতেই মানুষ। বাড়ির একটা চাবি ওঁর কাছেই থাকে। আমার বা রামিয়ার আসার কথা হলে ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখেন। শঙ্কর আঙ্কেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এলেন বলে।'

'বাট ইউ হ্যাভন্ট মেনশনড হিজ নেম টু আস স্যার,' উদ্বিগ্ন মুখে বললেন অজয় শাসমল, 'আমরা কিন্তু আপনার জন্য কলকাতা পুলিশের ক্লিয়ারেন্স আছে এমন একজন হাউস কিপার অ্যাপয়েন্ট করেছি। দ্যাট পার্সন উইল বি হিয়ার এনি মোমেন্ট।'

'নট নিডেড অফিসার। শঙ্কর আঙ্কেল ছাড়া এই বাড়ির হাউস কিপিং-এর জন্য আমার কাউকে দরকার নেই।'

'বাট স্যার...'

'আই ইনসিস্ট অফিসার,' রমেশ সারভাননের গলায় স্পষ্টতই উত্তেজনা, গলার শিরা ফুলে উঠেছে 'ইফ ইউ নিড সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ফর হিম প্লিজ গেট দ্যাট ডান। কিন্তু আমার অন্য হাউস কিপার চাই না।'

অজয় শাসমল দ্রুত বাইরে গেলেন, বোধহয় তাঁর টিমকে আপডেট দিতে।

রমেশ সারভানন নিজেই উঠে গেলেন কফি বানাতে, 'কম্পিউটিং ছাড়া আর একটি কাজই আমি ভালো পারি, কফি বানাতে। নীলগিরির সেরা কফি সঙ্গে করে এনেছি, খেয়ে দেখুন কেমন লাগে।'

আবার সেই মিষ্টভাষী অতিথিপরায়ণ ভদ্রলোক। কে বলবে একটু আগেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন!

মনুজেন্দ্র ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পটালেন কী করে?'

প্রফেসর মুখার্জি নির্বিকার সুরে বললেন, 'সেলসে বিশ বছর চাকরি করেছি হে। লোক পটানোটা আমার স্পেশাল স্কিলের মধ্যেই পড়ে।'

'কথা বলে কী বুঝলেন?'

'প্রতিভাবান সন্দেহ নেই। তবে স্বভাবে পাগলাটে। খুব সম্ভবত বাইপোলার ডিজঅর্ডারের পেশেন্ট। বোধহয় ব্লাড প্রেশারও আছে। ঘনঘন মুড চেঞ্জ হয়, লন্ডনের ওয়েদারের মতো।'

চার কাপ কফি নিয়ে এলেন রমেশ সারভানন। সঙ্গে কিছু কুকিজ। ট্রে-টা সামনে রেখে বললেন, 'কফিটা খেয়ে দেখুন। এ জিনিস কলকাতায় পাবেন না। কুকিজটাও কেরালার এক স্পেশাল বেকারি থেকে সঙ্গে করে এনেছি।'

চতুর্থ কাপটা অজয় শাসমলের। তিনি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পিছনে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। খুব সম্ভবত ইনিই শঙ্কর সাধু। তিনি এসেই হাউমাউ করে উঠলেন, 'রমেশ বাবা, এ কেমন হুজ্জোত বলো দেখি। এত বছর ধরে এই বাড়ির সেবা করেছি, কই কোনওদিন পুলিশ-টুলিশের হ্যাঙ্গামায় জড়াতে হয়নি। আজ এসব কী হচ্ছে বাবা?'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতোই শঙ্কর সাধুর ভয়তরাস উড়িয়ে দিলেন রমেশ সারভানন, 'চিন্তা কোরো না কাকা। এসব রুটিন চেক আপ। আমি ওদের

বলে দেব, তোমাকে আর যেন না বিরক্ত করে। তারপর তোমার খবর বলো। মেয়ে-জামাই কেমন আছে? আর তোমার ওই আরথ্রাইটিসের ব্যথাটা?'

এর পর দুপক্ষের কিছু সুখ-দুঃখের কথা হল। তার বেশিরভাগই বাকিরা বুঝলেন না। শঙ্কর সাধু কিছুক্ষণ পর চোখ মুছে উঠে গেলেন কিচেনের দিকে। বাকিরাও উঠে পড়লেন। পুলিশের লোকজন তাদের পজিশন নিয়ে নিয়েছে। কাল বিকেলে রমেশ সারভানন কলকাতা এয়ারপোর্ট যাবেন ব্যাঙ্ককের ফ্লাইট ধরতে। ততক্ষণ অবধি তাদের ডিউটি।

নীলগিরির কফির কথায় কেরালার সিনিক বিউটির কথা এল। সেখান থেকে আড্ডার মোড় ঘুরে গেল বনজঙ্গল আর গাছপালার দিকে। কথায় কথায় রমেশবাবু বললেন, 'আমাদের বাড়ির পেছনে একটা ছোট বাগান আছে। আমার মায়ের নিজের হাতে করা বাগান, এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। আমি আর রামিয়া, আমরা দুজনেরই খুব বাগান করার শখ। দেখবেন নাকি?'

কিচেন থেকে শঙ্কর সাধু চেঁচিয়ে বললেন, 'বাগান কিন্তু পরিষ্কার করা হয়নি রমেশবাবা। ঝোপঝাড়ে জঙ্গল হয়ে আছে একেবারে।'

ভুরু কুঁচকে গেল রমেশ সারভাননের, 'কেন? বাগান তো রেগুলার পরিষ্কার রাখার কথা কাকা।'

শঙ্কর সাধু বেরিয়ে এলেন, 'মাস দুয়েক আগে রামিয়া মা এসেছিল না! সঙ্গে করে বেশ কিছু নতুন নতুন গাছের চারা এনেছিল। কিছু নিজে পুঁতল। কিছু আমি পুঁতলাম। আমাকে বলল, কাকা, এইবার তুমি আর এই বাগানে একদম ঢুকবে না। দাদার জন্য কিছু সারপ্রাইজ রেখে যাচ্ছি, ধাঁধাই বলতে পারো। দেখি দাদা এই গাছগুলো চিনতে পারে কি না। আমিও সেই থেকে আর এই বাগানে ঢুকিনি।'

কথাটা শুনে কোমরে হাত দিয়ে একচোট খুব হেসে নিলেন রমেশ সারভানন। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'বটে, রামিয়ার এত সাহস হয়েছে যে আমাকে গাছের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে? দেখছি কী নতুন গাছ এনেছেন ম্যাডাম।'

* * *

পরেরদিন প্রফেসর মুখার্জির ঘুম ভাঙল স্ত্রীর ধাক্কাধাক্কিতে, 'ওগো ওঠো, মনোজ চারবার ফোন করে ফেলল আমাকে, তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছে। দেখো তো, কোথায় আবার কী হল।'

মুখার্জিসাহেব চশমা পরে মোবাইল ফোনটা তুললেন, সতেরোটা মিসড কল! সাতটা মনোজের, দশটা মনুজেন্দ্রর!

বুকটা ধ্বক করে উঠল মুখার্জিসাহেবের। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। লাস্ট মিসড কলটা মনুজেন্দ্ররই। তাকেই প্রথম ফোনটা লাগালেন প্রফেসর মুখার্জি। একবার রিং হতেই ফোন তুলল সে। কোনও হাই হ্যালো গুড মর্নিং ইত্যাদি ফর্মালিটিজের মধ্যে গেল না, শুধু প্রচণ্ড টেনসড স্বরে বলল, 'রমেশ সারভানন

কমিটেড সুইসাইড লাস্ট নাইট। আপনি শিগগিরি ওঁর বাড়িতে চলে আসুন।' বলেই ফোন কেটে দিল সে।

প্রফেসর মুখার্জি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর প্রায় লাফিয়ে নামলেন খাট থেকে। বাথরুমের দিকে দৌড়তে দৌড়তে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা হাঁক ছাড়লেন, 'রমা, এমারজেন্সি সিচুয়েশন। আমার জন্য ব্রেকফাস্ট বানাতে যেও না, আমি রাস্তায় কিছু একটা খেয়ে নেব।'

* * *

রমেশ সারভাননের বাড়ির সামনে পৌঁছে মুখার্জিসাহেব দেখলেন পুলিশে কম্যান্ডোতে এলাকা পুরো ছয়লাপ। পুরো এরিয়াটা কর্ডন করে রাখা আছে। কৌতূহলী জনতার ভিড় উপচে পড়ছে সেখানে।

প্রফেসর মুখার্জিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে অজয় শাসমল দৌড়ে এলেন, 'কী কাণ্ড দেখুন দেখি স্যার। আমরা তো জাস্ট হতভম্ব হয়ে গেছি। কী করে যে কী হল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কী হয়েছেটা কী?'

'ওই কেয়ারটেকার ভদ্রলোক, শঙ্কর সাধু না কী নাম, সকালে এসে কলিং বেল টিপে দেখেন কেউ দরজা খুলছে না। অনেকবার ডাকাডাকি করেও কেউ দরজা খুলছে না দেখে পাহারায় থাকা পুলিশের দল দরজা খুলে দেখে রমেশবাবু তাঁর শোবার ঘরে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছেন।'

প্রফেসর মুখার্জি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে মনুজেন্দ্র গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল। মুখার্জিসাহেবকে দেখে বলল, 'উই আর পাজলড লাইক এনিথিং। জাস্ট ভাবতে পারছি না।'

মুখার্জি সাহেব বললেন,' ডেডবডি কোথায়?'

'একটু আগেই পোস্ট-মর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে।'

'ভেতরে কে কে আছেন?'

'পুলিশ কমিশনার বিশাল গোয়েল আর মনোজস্যার।'

'যাব?'

'যান। তবে কিছু টাচ করবেন না। এভিডেন্স নষ্ট হতে পারে।'

প্রফেসর মুখার্জি থমকে গেলেন, 'এভিডেন্স? এভিডেন্সের কথা উঠছে কেন? তোমরা কি এটাকে খুন বলে সন্দেহ করছ?'

'সন্দেহ করাই আমাদের পেশা স্যার।'

মুখার্জি সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। ভেতরে ঢুকে দেখলেন আরক্ষাবাহিনীর দুই বড়কর্তা সতর্কভাবে এক কোণে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন। প্রফেসর মুখার্জিকে দেখে মনোজ চাকলাদার এগিয়ে এসে বললেন, 'আমরা বরং বাইরে কোথাও বসি চলুন। এখানে বেশি লোক হলে অনেক

এভিডেন্স মুছে যেতে পারে। ফিঙ্গার প্রিন্ট আর ফরেনসিক এক্সপার্টরা এল বলে।'

মনুজেন্দ্রকে করা প্রশ্নটাই রিপিট করলেন প্রফেসর মুখার্জি।

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন কমিশনার বিশাল গোয়েল। তাঁর টিমের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে একজন এতবড় বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করলেন, সেটা তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, 'দেখুন প্রফেসর মুখার্জি, আমাদের কাছে ক্লিয়ার ইনটেল ছিল ওঁর ওপর একটা অ্যাটাক হবে। আর হবে ওঁর এই কলকাতা ব্যাঙ্কক ট্রিপের মধ্যেই। সেখানে হঠাৎ করে যদি তিনি সেই টাইম পিরিয়ডেই আত্মহত্যা করে বসেন, তাহলে সেটা হজম করা একটু কষ্টকর হয়ে পড়ে, তাই না?'

প্রফেসর মুখার্জি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'পোস্ট-মর্টেম আর ফরেনসিক রিপোর্ট, এগুলো কবে পাওয়া যাবে?'

'এত বড় হাই প্রোফাইল কেস, আশা করছি দিন তিনেকের মধ্যেই রিপোর্টের ব্যবস্থা করতে পারব।'

কথা বলতে বলতে চারজনেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। ততক্ষণে ফরেন্সিক টিম এসে গেছে। প্রফেসর মুখার্জি গুটিগুটি নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন।

* * *

দু-দিন পরের কথা। মনোজ চাকলাদারের কেবিনে বসে কথা বলছিলেন, বিশাল গোয়েল আর প্রফেসর মুখার্জি। মনুজেন্দ্র এক কোণে পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে।

সব রিপোর্ট চলে এসেছে, তার কপি রুটিনমাফিক দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে নিয়মিত তাগাদা আসছে কেসটার একটার ক্লোজারের জন্য।

'তাহলে কেসটা কী দাঁড়াল মিস্টার চাকলাদার? কনফার্মড সুইসাইড?'

'ইয়েস মিস্টার গোয়েল। সমস্ত রিপোর্ট ইন্ডিকেট করছে সুইসাইড ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। কোথাও কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। বডিতে কোনও উন্ড বা ইঞ্জেকশনের দাগ নেই। ইন ফ্যাক্ট সারা বাড়িতে শঙ্কর সাধু আর রমেশ সারভানন ছাড়া অন্য কোনও ফিঙ্গার প্রিন্টই নেই।'

'অপরাধী যদি হাইলি ট্রেইনড অ্যাসাসিন হয়? ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা অন্য ট্রেস ক্লিন-আপে সর্বোচ্চ স্তরের পারদর্শী হয়?'

'তারও কোনও চান্স নেই। ভিসেরাতে পয়জন বা অন্য কিছুর ট্রেস পাওয়া যায়নি। গানশট না অন্য উন্ডের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকী আমরা রেডিও-অ্যাকটিভ পয়জনিং-এর দিকটাও চেক করেছি। কিন্তু খুনের কোনও চেষ্টার প্রমাণ নেই।'

'কেসটা তাহলে কী দাঁড়াল?' আগের প্রশ্নটাই রিপিট করলেন কমিশনার সাহেব।

'কেসটা এই যে আমাদের কারো কিছু করার নেই। মিস্টার রমেশ সারভানন সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে সিলিং ফ্যানে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। একেবারে প্রুভেন ফ্যাক্ট। অন্য কিছু হওয়ার কোনও চান্সই নেই।'

'কিন্তু কেন?' মুখার্জি গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'একটা লোক আগের দিন দুপুর অবধি সুস্থ স্বাভাবিকভাবে খোশমেজাজে কথা বলেছে, আমাকে...অজয় শাসমলকে...মনুজেন্দ্রকে কফি করে খাইয়েছেন, ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছেন, আর রাতের মধ্যে এমন কি ঘটে গেল যে একেবারে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লেন? একটু অস্বাভাবিক লাগছে না?'

'না প্রফেসর মুখার্জি। মোটেও অস্বাভাবিক নয়।' উত্তর দিলেন কমিশনার সাহেব, 'এরকম কেস পুলিশের কাছে রোজই গাদাগুচ্ছের আসে। দিব্যি হাসিখুশি লোক সকালে বাজারে গিয়ে দরদাম করে পাঁঠার মাংস কিনেছে, দুপুরে বৌয়ের সঙ্গে সামান্য ঝগড়া করে রেললাইনে গলা দিল। বা ইয়ং টিনএজার মেয়ে, হইহই করে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ একটু বকেছে বলে অ্যাসিড খেয়ে নিল। এ তো হামেশাই হচ্ছে। আর এঁর তো একটা মেন্টাল সমস্যা ছিলই।'

'মেন্টাল সমস্যা। কীরকম?'

মনোজ চাকলাদার যোগ দিলেন, 'রমেশ সারভানন অ্যাকিউট বাইপোলার ডিজঅর্ডারের পেশেন্ট ছিলেন। থেকে থেকে ট্রিগার্ড হয়ে যেতেন। বিশেষ করে কেউ তাঁর মতের সামান্যতম বিরোধিতা করলেই রাগে পাগলের মতো বিহেভ করতেন। এই নিয়ে ওঁর কর্মস্থলেও অনেক অশান্তি হয়েছে। মাস ছয়েক আগে তো এক জুনিয়র সায়েন্টিস্টের টুঁটি টিপে ধরেছিলেন কী একটা বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের জন্য। এই নিয়ে ডিপার্টমেন্ট এনকোয়্যারিও বসেছিল ওঁর এগেইন্সটে। নেহাত দ্য গ্রেট রমেশ সারভানন বলেই সেবার কোনওমতে বেঁচে যান। আমরা ওঁর ফিজিশিয়ান আর অন্যান্য নিউরোলজি স্পেশালিস্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের মতে সেই রাতে হয়ত কোনওভাবে ট্রিগার্ড হয়ে গিয়ে...'

কথাটা চারজনের মধ্যে অর্ধসমাপ্ত জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো ঝুলে রইল।

মাথা নাড়লেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এগ্রিড এডিজি স্যার। কিন্তু সবক্ষেত্রেই একটা ট্রিগার থাকে। নিজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েও ঘোড়াটা টেপার আগে আঙুলটা একটু থমকায়। সেই থমকানি পেরিয়ে ঘোড়াটা টিপতে একটা জোরদার কারণ লাগে। এখানে ওই কারণটা খুঁজে বার করে দেখা দরকার না?'

ভাগনে হলে কী হবে, প্রকাশ্যে সি আই ডি-র এডিজিকে কখনোই নাম ধরে সম্বোধন করেন না প্রফেসর মুখার্জি। এই শিষ্টতাটুকু দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভাগনেও মেনে চলেন। তিনি গম্ভীরমুখে বললেন, 'সে আপনি বার করতে চাইলে বার করুন। কিন্তু করে লাভ কী?'

'আহা, সবকিছু লাভ-লোকসানের কথা ভেবে করা যায় নাকি স্যার? ধরে নিন একটা কৌতূহল মেটাতে চাইছি। এডিজি সাহেব, আপনারা কি রিপোর্ট ফাইনাল করে ফেলেছেন?'

'নট ইয়েট প্রফেসর মুখার্জি। কিন্তু যা প্রেশার আসছে তাতে আজকালের মধ্যেই একটা ক্লোজার করতেই হবে।'

'আজকালটাকে কি তিন-চার দিন বাড়ানো যায়?'

তিনজোড়া সপ্রশ্ন চোখ চেয়ে রইল প্রফেসর মুখার্জির দিকে।

'আমি একটু নিজের মতো করে ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে চাই। অবশ্য তাতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে। যদি নেক্সট তিন-চারদিনের মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে বার না করতে পারি, তাহলে কেস ক্লোজ করে দেবেন। ওকে?'

বিশাল গোয়েল আর মনোজ চাকলাদার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর মনোজ চাকলাদার বললেন, 'ওয়েল প্রফেসর মুখার্জি, আপনি যদি নিজের মতো করে কিছু খোঁজখবর করতে চান তো করতে পারেন। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আনঅফিশিয়ালি, দ্যটস গো'স উইদাউট সেয়িং। কী বলেন মিস্টার গোয়েল?'

মাথা নাড়লেন কমিশনার সাহেব, 'প্রফেসর মুখার্জি আগেও বেশ কিছু ভেলকি দেখিয়েছেন। আমার কোনও আপত্তি নেই। দরকার পড়লে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে।'

'গুড। তবে চার নয়, তিন। তিনদিনের বেশি সময় দিতে পারছি না প্রফেসর মুখার্জি। তিনদিনের মধ্যে কিছু খুঁজে পেলে ভালো, নইলে এই কেস ক্লোজড। মনুজেন্দ্র, তুমি একটু হেল্প করো প্রফেসর সাহেবকে। তোমাদের তো শুনেছি জমে ভালো।'

মনুজেন্দ্র হেসে ফেলল। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'ফরেন্সিক আর বাকি যা যা রিপোর্ট আছে তার একটা কপি পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই। আর কিছু?'

'রমেশ সারভাননের ল্যাপটপ, ফোন, ট্যাব এসব পরীক্ষা করার অনুমতি চাই।'

'সরি, উনি দেশের ডিফেন্স সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্ত ছিলেন প্রফেসর মুখার্জি। ওঁর ল্যাপটপ, ফোন বা ট্যাবে দেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এমন কোনও ডেটা থাকবেই। ফলে সেসব আপনাকে আপনাকে দেখতে দিতে পারি না।'

'যদি পুলিশের তদন্তকারী টিমের সামনেই দেখি?'

মাথা নিচু করে কী যেন একটা ভাবলেন কমিশনার সাহেব, তারপর বললেন, 'ওকে, ডান। আমি বলে দিচ্ছি। আর?'

'রমেশ সারভানন মারা যাওয়ার তিন-চার দিন আগে থেকে মারা যাওয়ার দিন পর্যন্ত সমস্ত কলের ডিটেইলস চাই। আপনাদের নির্দেশ ছাড়া সার্ভিস প্রোভাইডার ও জিনিস দেবে না।'

'পেয়ে যাবেন। অলরেডি আমাদের টিম রমেশ সারভাননের মোবাইল, ল্যাপটপ, কল লিস্ট সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। কিছুই পাওয়া যায়নি। তবুও আপনি যখন চাইছেন দেখতে, দেখুন। আমাদের আপত্তি নেই। আর কিছু?'

'শঙ্কর সাধু আর ওই দিন পুলিশ টিমের যাঁরা যাঁরা পাহারায় ছিলেন, তাঁদের

সঙ্গে, পার্সোনাল ফিজিশিয়ানের সঙ্গে আর সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই, বিশেষ করে যার গলা টিপে ধরেছিলেন।'

'ডিটেইলস মনুজেন্দ্রর কাছে আছে। পেয়ে যাবেন।'

'ব্যস, এতেই চলবে আপাতত। থ্যাঙ্কিউ।'

* * *

'আপনি কতদিন ধরে এদের বাড়ির কাজ করেন শঙ্কর বাবু?'

কথা হচ্ছিল শঙ্কর সাধুর কালীঘাটের একতলা ভদ্রাসনে বসে। সাদামাটা ছিমছাম বাড়ি। খোলা উঠোন ঘিরে তিনটি শোওয়ার ঘর। একটি ঘর কিচেন আর ডাইনিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাড়িতে আপাতত শঙ্করবাবু আর ওঁর স্ত্রী থাকেন। একটি মাত্র ছেলে, বিদেশে থাকে। কন্ট্রাকচুয়াল লেবারের কাজ করে। নাম কার্তিক।

'আজ্ঞে, আশি সাল থেকে। রমেশবাবার বাবা গোবিন্দন সারভানন আমাকে কাজ বহাল করেন উনিশশো একাশি সাল নাগাদ। আমার বয়েস তখন পঁচিশ, রমেশ বাবার বয়েস দশের কাছাকাছি, সুরেশবাবা আরও ছোট। সেই থেকে আমি সারভানন পরিবারের নুন খাই স্যার। গোবিন্দন স্যার মারা গেছেন আমার কোলে মাথা রেখে। ভানুমতী আম্মা আমার নিজের মায়ের সমান দিদি ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর আমিও হবিষ্যি করেছি স্যার। আম্মা মারা যাওয়ার আগে আমার হাত ধরে বলে গেলেন, শঙ্কর, তুই ছেলে দুটোকে দেখিস, ওদের তো আর কেউ রইল না। সেই আমাকে যে সুরেশবাবা আর রমেশবাবা দুজনেরই মৃত্যু দেখতে হবে....' কান্নায় ভেঙে পড়লেন শঙ্কর সাধু।

প্রফেসর মুখার্জি ভদ্রলোককে খানিক সামলে ওঠার সময় দিলেন। তারপর নিস্পৃহস্বরে বললেন, 'সেদিন আমরা কফি খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর কী কী হল এক এক করে বলে যান তো।'

চোখের জল মুছে বলতে শুরু করলেন সারভানন পরিবারের সদস্য শঙ্কর সাধু।

সেইদিন সবাই চলে যাওয়ার পর শঙ্কর সাধু রান্নাঘরে ঢুকে যান রাতের খাবার বানাতে। রমেশ সারভানন পোশাক পরিবর্তন করে নেমে এসে শঙ্কর আঙ্কেলের সঙ্গে কিছু সাংসারিক কথাবার্তা বলেন। তারপর আগাছা কাটার বড় কাঁচি নিয়ে নেমে যান বাগান পরিষ্কার করতে।

ঘণ্টা দুয়েক পর যখন তিনি ফিরে আসেন তখন প্রায় চারটে বাজে। রমেশবাবা ঘেমে একেবারে জবজবে হয়ে গেছেন। শঙ্কর সাধুর খাবার বানানো শেষ। তিনি বাগানে উঁকি মেরে দেখলেন, বাগান প্রায় সাফ হয়ে এসেছে, একদম বাউন্ডারির শেষে বেড়ার দিকের অংশ ছাড়া। রমেশবাবা হেসে বললেন, 'রামিয়া খুব চালাক হয়েছে বুঝেছ। অস্ট্রেলিয়া থেকে এমন এমন গাছ এনে লাগিয়েছে যার আদ্ধেক আমি চিনিই না। গুগল লেন্স থেকে ফটো তুলে চিনতে হচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে

শালা গুগলও ফেল মেরে যাচ্ছে এমন রেয়ার গাছ জুটিয়েছে হতচ্ছাড়ি। এসব কোত্থেকে জোটালো কে জানে। দাঁড়াও, ওকে ফোন করি।' বলে রামিয়া মাকে কল করলেন। অস্ট্রেলিয়াতে তখন বোধহয় অনেক রাত। দুজনায় খুব হাসি ঠাট্টা হল। তারপর রমেশবাবা আমাকে বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও কাকা।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'এই ধরুন বিকেল চারটে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। আমি ওঁর ওষুধ গুছিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে এলাম।'

'তখনও অবধি রমেশবাবুর আচার-আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেছিলেন?'

'না স্যার। মা কালীর কিরে। রমেশবাবা একদম সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন।'

'আর এই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষটা রাতের মধ্যেই আত্মহত্যা করে ফেললেন?'

শঙ্কর সাধুর চোখ আবার জলে ভরে এল, 'আমি কী করে বলব স্যার? রমেশবাবা যে পাগলামির ঝোঁকে...'

'পাগলামির ঝোঁকে?' সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'রমেশবাবু পাগল ছিলেন নাকি? কে বলল আপনাকে?'

অপ্রস্তুত হন শঙ্কর, 'আসলে রমেশবাবার তো ছোটবেলা থেকেই একটা মাথার ব্যামো ছিল। থেকে থেকে রেগে যেতেন, জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি করতেন। মাঝে মাঝে তো মারধোরও...' বলতে বলতে থেমে গেলেন শঙ্কর সাধু।

'কাকে মারধোর করতেন রমেশ সারভানন?' ঝুঁকে এলেন প্রফেসর মুখার্জি।

'আজ্ঞে,' আমতা আমতা করছেন শংকর সাধু।

'সত্যি কথাটা না বললে কিন্তু আমরা সঠিক তদন্তের পথে এগোতে পারব না শঙ্করবাবু।'

'আজ্ঞে, রেগে গেলেই নিজের মা-বাবা, আর সুরেশবাবাকে বেধড়ক পেটাতেন রমেশবাবা।' ইতস্তত করে বলেই ফেলেন সারভানন পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী শঙ্কর সাধু, 'তারপর অনেক ওষুধপত্র ডাক্তার দেখিয়ে রমেশবাবাকে ঠিক করা হয়। তবে ডাক্তারবাবু বলেই দিয়েছিলেন, এই রোগ কোনওদিনও সারবে না। ওষুধ খেলে খানিক সামলানো যাবে, এই যা।'

'কোন ডাক্তার? জানো?'

'সে তো অনেক দিন আগের কথা বাবু। কোন ডাক্তার মনে নেই। গড়িয়াহাটায় বসতেন এইটুকু মনে আছে। তবে মাঝে নাকি বেড়েছিল খবর পেয়েছিলাম। আপিসে কার নাকি গলা টিপে ধরেছিলেন। পরে বম্বের কোন ডাক্তারকে দেখিয়ে নাকি একটু সুস্থ ছিলেন শুনেছি।'

'কোন ডাক্তার?'

'সে জানি না। সুরেশবাবা হয়তো বলতে পারত। এখন রামিয়া মা বলতে পারবে হয়তো।'

* * *

রামিয়া সুন্দররাজন ওরফে সারভাননকে দেখতে একদমই তামিলদের মতো নয়। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। তার ওপর মহিলা যাকে বলেন, চোখধাঁধানো সুন্দরী আর তেমন স্মার্ট। চেহারার মধ্যে একটা বিদেশি ছাপ আছে। খুব সম্ভবত অস্ট্রেলিয়াতে সারাজীবন কাটানোর ফল। ভাসুরের মৃত্যুর খবর পাওয়ামাত্র ফ্লাইট বুক করেন। এসে পৌঁছেছে গতকাল গভীর রাতে।

রমেশ সারভাননের মৃত্যু যে ওঁকে নাড়িয়ে দিয়েছে সেটা দেখেই মালুম হচ্ছিল। বিধ্বস্ত চেহারা, চোখ কোটরে বসে গেছে, চুল অবিন্যস্ত।

'মনে হচ্ছে দ্বিতীয়বার পিতৃহারা হলাম,' ছলছল চোখে বললেন রামিয়া, 'এই পৃথিবীতে আমার বলতে আর কেউ রইল না। মা বাবা মারা গেছেন সে কবেকার কথা। সুরেশের কথা তো জানেনই। দাদাও...'

রামিয়া ভেঙে পড়েছেন দেখে একটু সময় নিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'আপনারা কি অনেক দিন ধরেই অস্ট্রেলিয়াতে আছেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাবা খুব ছোটবেলায় চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যান। তারপর ওখানেই বিয়ে করেন। আমার মা অস্ট্রেলিয়ান। আমার জন্মকর্ম সবই ওদেশে।'

ফর্সা রঙ আর বিদেশি ছাপের কারণ বোঝা গেল। পরের প্রশ্ন করল মনুজেন্দ্র, 'আপনাদের শুনেছি ওদেশে বিশাল ব্যবসা। কীসের ব্যবসা বলা যাবে?'

'সিওর। আমরা বেসিক্যালি টিম্বার মার্চেন্ট। ব্যবসাটা বাবাই শুরু করেন, আমি আরও বড় করেছি। আমাদের স্টারমার্ক গ্রুপের যথেষ্ট সুনাম আছে। গোটা সাউথ-ইস্ট এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন দেশে আমাদের টিম্বার যায়।'

'সুরেশবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হল কীভাবে?'

'সুরেশের মামা-মামির ফার্নিচারের ব্যবসা ছিল। সুরেশ ওঁদের হেল্প করত। আমরা ওঁদের টিম্বার সাপ্লাই দিতাম। সেই থেকে আলাপ। বিয়ের প্রস্তাব ওর মামা-মামিই এনেছিলেন। সুরেশ আর আমার কারোরই অমত ছিল না।'

'আপনারা তো কলকাতাতেও ছিলেন কিছুদিন।'

'হ্যাঁ, বিয়ের পর আমি আর সুরেশ কলকাতা শিফট করে যাই। তখন দাদাও এখানে থাকতেন। আমাদের প্ল্যান ছিল কলকাতায় এলিট ক্লাসের জন্য একটা বুটিক ফার্নিচারের আউটলেট খুলব। যদিও তার দরকার ছিল না। আমাদের যা সঞ্চয় আছে বাকি জীবনটা এমনিই কেটে যাবে। কিন্তু হাজার হোক আমরা দুজনেই ব্যবসায়ী। চুপচাপ বসে থাকা ধাতে নেই।

কিন্তু তার আগেই সুরেশ হঠাৎই এক রাতে হার্ট অ্যাটাকে...' বলতে বলতে গলা ধরে এলো রামিয়ার।

'এ কবেকার কথা?

'বছর ছয়েক হবে। ২০১০-এ ডিসেম্বরের এন্ডে। তারপর আমি অস্ট্রেলিয়া

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তাই জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।'

[illegible] 'দেখুন, [illegible] ভদ্রলোক। এই নিয়ে কিছু বলাটা ভালো দেখায় না। তবে যদি [illegible] [illegible] আছে বলে শুনিনি। [illegible] ছিলেন। [illegible] বলতেন। তাই এই বিষয়ে [illegible] পারব না।'

'আপনি এখন অস্ট্রেলিয়াতে কী করেন?'

'ওই একই ব্যবসা করছি। এখন তো দুটো ব্যবসাই আমাকেই সামলাতে হয়।'

'সে কী? আপনারা যখন কলকাতা আসেন তখন ব্যবসা চলছিল?'

'হ্যাঁ। আমাদের বিয়ের পর দুটো ব্যবসা মার্জ করে দিই। মুরুগান বলে কলকাতারই একটি ছেলে সুরেশের ব্যবসার ম্যানেজার ছিল। আমরা তাকেই বলে এসেছিলাম ব্যবসাটার দেখাশোনা করতে। আমি ফিরে গিয়ে আবার ব্যবসার ভার নিজের হাতে তুলে নিই। কিছু তো একটা করতে হবে। নইলে বাঁচব কী নিয়ে বলুন।' বিষণ্ণ হাসলেন রামিয়া।

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।' সহানুভূতি প্রকাশ করলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কলকাতার ছেলে বললেন? বাড়ি কোথায় এই মুরুগানের?'

'আসল বাড়ি কালীঘাট, না হাজরা কোথায় একটা। এখন প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে নিজের ফ্ল্যাট কিনেছে।'

'আচ্ছা। আর একটা কথা, আপনার ভাসুর যখন কলকাতা আসতেন, বা আপনারা যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন আপনাদের অসুখ-বিসুখ হলে কাকে দেখাতেন?'

'ডক্টর বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি। গড়িয়াহাটে চেম্বার।'

'হুম। বুঝলাম, আপনি আছেন ক'দিন আর?'

'আর দিন তিনেক। ওদিকে অনেকগুলো কাজ আটকে আছে, আমি না গেলেই নয়।'

'বাড়িটার কী হবে কিছু ভেবেছেন?'

'এখনও ঠিক করিনি। আমি বা দাদা এ বাড়ি বেচার কথা ভাবিইনি কোনওদিন। কিন্তু এখন বোধহয় ভাবতে হবে। আমার তো আর কেউ রইল না দেশে, আর আসা হবে কি না জানি না। বেকার বেকার ফেলে রেখে কী লাভ। বেচে একটা অংশ শঙ্কর আঙ্কেলকে দিয়ে বাকিটা দিয়ে ভাবছি দাদার স্মৃতিতে একটা স্টুডেন্ট স্কলারশিপ চালু করব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

প্রফেসর মুখার্জি, মনুজেন্দ্র উঠে পড়ল। অনেক কাজ বাকি আছে।

* * *

সরকারি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বটকৃষ্ণ পাল প্রফেসর মুখার্জিকে দেখেই দু-হাত কপালে প্রণামের ভঙ্গিতে ঠেকালেন, 'জয় গৌর নিতাই। যবে থেকে এডিজি স্যার বলেছেন আপনি আসতে পারেন, অপেক্ষা করে আছি কবে দেখা হবে স্যার।'

হেসে ফেললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কেন? এত অধীর আগ্রহের কারণটা কী?'

'আমি দেখতে চাই এই সাদামাটা আত্মহত্যার কেস থেকে প্রফেসর মুখার্জি ম্যাজিশিয়ানের টুপির মধ্যে থেকে খরগোশ বার করার মতো কোনও ক্রিমিনালকে

টেনে বার করে আনেন।'

হেসে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর হাসি থামলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সিওর এটা একটা আত্মহত্যার কেস?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার। নো বুলেট। নো পয়জন। নো ব্লাডশেড। একদম ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার কেস স্যার।'

'ভিসেরাতে কী কী পেয়েছেন?'

'কিছু খাবারের অবশেষ আর ওষুধ। সেও নর্ম্যাল ওষুধ, রমেশ সারভানন যা খেতেন। আমরা মিলিয়ে নিয়েছি স্যার।'

'আর কিছু? নজরে পড়ার মতো অস্বাভাবিক কিছু?'

'তেমন কিছু না। নাকে রক্ত জমেছিল, যেটা গলায় দড়ি দিলে অনেক সময়েই হতে পারে। ব্রঙ্কিয়াল ট্র্যাক্ট একটু অস্বাভাবিক ফুলে গেছিল আর হাতের চেটো একটু লালচে হয়েছিল। সম্ভবত কোনও অ্যালার্জির ফল।'

'সম্ভবত কোনও অ্যালার্জি বলতে?'

'ওখানে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু রোঁয়া পেয়েছি। লাউ গাছের পাতায় বা শুঁয়োপোকার গায়ে যেমন রোঁয়া থাকে, তেমন।'

'সেগুলো পরীক্ষা করে দেখেননি?'

'না স্যার। লাউপাতা বা শুঁয়োপোকা দিয়ে আজ অবধি কাউকে খুন করতে দেখিনি বা শুনিনি বলে...'

'অ, আই সি। আর কোনও অ্যানোম্যালি? ব্লাডে কোনও টক্সিক সাবস্ট্যান্স?'

'নাথিং স্যার। হাতের কাছে খুব অল্প মাত্রায় কিছু পেপটাইড পেয়েছি বটে। তবে তার পরিমাণ এতই কম যে অগ্রাহ্য করা চলে।'

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম পালমশাই, তাহলে ওই পেপটাইডটা কী বস্তু একবার পরীক্ষা করে দেখতাম। আপনি বলছেন ভদ্রলোকের হাতের চেটো লালচে হয়ে গেছিল, ব্রঙ্কিয়াল ট্র্যাক্ট ফুলে গেছিল, ডেফিনিটলি কোনও অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের ফল। সেটা তো ওই রোঁয়া রোঁয়া বস্তুটা থেকেও হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে স্যার। কিন্তু তা দিয়ে খুন করা অসম্ভব।'

'সেখানেই তো আমার আপত্তি পালমশাই। আপনি কেবলমাত্র সম্ভাব্য খুনের লক্ষ্মণগুলোই খুঁজছিলেন। তাই আপনার মতে মৃত্যুর কারণ হতে পারে না এমন সব তথ্যগুলো আপনি অগ্রাহ্য করেছেন। আপনি সত্যিটা খুঁজছিলেন না।'

'আই এগ্রি স্যার,' মরিয়া হয়ে ওঠেন পালমশাই, 'কিন্তু এটা তো একটা সিম্পলস্য সিম্পল সুইসাইড কেস। কোথাও কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। কোনও পয়জন বা বুলেট বা রেডিওঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্সের উল্লেখ নেই। সেখানে একটা সামান্য অ্যালার্জি নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কেন?'

শ্রাগ করলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কে জানে, হয়তো আপনার কথাই সত্যি। চলি তাহলে, একবার ভবানী ভবন যেতে হবে, ওই খরগোশের খোঁজেই।'

বেরোতে বেরোতে মনুজেন্দ্রর ফোন, 'আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি স্যার, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।'

'আজকাল অনেকেই আমার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কেন বলো তো মনু? ওদিকে বটকৃষ্ণ পাল, তারপর এই তুমি, ব্যাপারটা কী?'

'রমেশবাবুর একেবারে পাশের বাড়িটা হচ্ছে অনুপম ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে বাংলার শিক্ষক। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বোধহয় খুব একটা সদ্ভাব ছিল না। ইনি আজ থানায় গেছিলেন অজয় শাসমলের সঙ্গে দেখা করতে, রমেশবাবুর আত্মহত্যা নিয়ে কিছু কথা বলতে। অজয় সোজা আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছে।'

'বটে? একেবারে পুলিশের কাছে যখন পৌঁছে গেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও আর্জেন্ট কথাই হবে। বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের কোম্পানি দুপুরবেলা ব্রাহ্মণসেবার কী ব্যবস্থা রাখে মনু? গড়িয়াহাটের 'বাঙাল হেঁসেল'-এর সর্ষে ইলিশ খেয়েছ কখনও?'

* * *

ব্রাহ্মণসেবা যথোপযুক্ত হলেও কী হবে, প্রফেসর মুখার্জিকে কিন্তু হতাশ হতে হল। যে খবরের আশায় এদিকে এসেছিলেন, তার কিছুই হল না।

অনুপম ঘোষের বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। হাইট পাঁচ ফুট, রোগা ফর্সা চেহারা, মাথায় মস্ত বড় টাক আর চোখেমুখে একটা কুটিল ধূর্ততার ভাব। দুজনকে আপ্যায়ন করে বসালেন। চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, 'আপনারাই রমেশের আত্মহত্যার কেসটা দেখছেন, না?'

উত্তরটা মনুজেন্দ্রই দিল, 'আত্মহত্যা, না হত্যা বলা মুশকিল। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস বলাই ভালো। এবার বলুন অজয়কে কী জানাতে গেছিলেন।'

চুকচুক করলেন ঘোষবাবু, 'সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, লগন চাঁদা ছেলে ছিল রমেশ। কিন্তু হলে কী হবে, ষষ্ঠে বসে আছে বক্রী বুধ। বুধই আবার সিংহলগ্নের মারক গ্রহ। অস্বাভাবিক মৃত্যু তো কপালে লিখে নিয়েই এসেছিল ছেলেটা।'

'মিস্টার ঘোষ, আমরা কিন্তু এখানে রমেশ সারভাননের কুষ্ঠি বিচার করতে আসিনি। কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা বলুন।' একটু অসহিষ্ণু শোনায় মনুজেন্দ্রর গলা।

'সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি। আসলে কী জানেন তো, বড় অভিশপ্ত জীবন ছেলেটার। মাথায় গন্ডগোল হলে যা হয়। রাগারাগি, জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি, ভাইয়ের গলা টিপে ধরা, কী করেনি ছোটবেলায়! বহু কষ্টে ওর বাপ ওকে ডাক্তার দেখিয়ে, থেরাপি করিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনে। এমনকী একটা সময় তো ওর মা ওকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দিত না।'

মনুজেন্দ্র আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে থামালেন প্রফেসরসাহেব, 'এবার যদি কাজের কথাটা বলেন ঘোষমশাই।'

'আমার কী মনে হয় জানেন? এর পেছনে একটা পারলৌকিক রহস্য আছে। কোনও প্রেতযোনিপ্রাপ্ত অতৃপ্ত আত্মার শিকার হয়েছে রমেশ।'

দুজনেই এত অবাক হয়ে গেলেন যে অনেকক্ষণ কিছু বলতেই পারলেন না। তারপর মনুজেন্দ্র খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

'আসলে পরিবারটার ইতিহাস তো খুব একটা স্বচ্ছ নয়। রমেশের যে মাথার রোগ ছিল সে তো জেনেছেন নিশ্চয়ই। ওর বাপ-মাকে সেই নিয়ে ছোটবেলায় কম হ্যাপা পোহাতে হয়নি। শেষে গড়িয়াহাটের ডাক্তার চ্যাটার্জিকে দেখিয়ে সুস্থ ছিল ছেলেটা। তারপর ধরুন সুরেশের হার্ট অ্যাটাক। একদম সাজোয়ান ছেলে, অস্ট্রেলিয়া থেকে এল বউয়ের সঙ্গে সংসার করবে বলে, এক হপ্তার মধ্যে হার্ট অ্যাটাক। কী বলব বলুন?'

ভুরু কুঁচকোলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আপনি বাংলার শিক্ষক ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'না, কিছু না। এবার বলুন। আপনি এতে ভূত কোথায় খুঁজে পেলেন?'

একটু সামনে ঝুঁকে গলা নামিয়ে অনুপমবাবু বললেন, 'সেই রাতে আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখি বুঝলেন। সেটা বলব বলেই ওসি সাহেবের কাছে যাওয়া।

আমার দোতলার জানলা থেকে ওদের বাড়ির অনেকটাই দেখা যায়। সেদিন সন্ধেবেলা জানলায় বসে হাওয়া খাচ্ছি, দেখি শঙ্কর বেরিয়ে গেল। তারপর রমেশকে দেখলাম একটা পাজামা আর টি-শার্ট পরে বাগানে ঢুকতে। হাতে মোবাইল। থেকে থেকে নিচু হয়ে মোবাইলের টর্চ জ্বেলে কীসব দেখছে।

এই করে করে একদম শেষে পাঁচিলের কাছে একটা জায়গা দেখে দাঁড়াল। নিচু হয়ে কী একটা পরীক্ষা করল মনে হল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘরের মধ্যে চলে গেল।

একটু পর দেখি ওদের দোতলা জুড়ে রমেশ ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখলাম, মানে জানলার শার্সি দিয়ে যতটুকু দেখা যায় আর কি। ভূতগ্রস্ত পাগলের মতো ছোটাছুটি! একবার এই ঘর, আর একবার ওই ঘর। আর তার সঙ্গে প্রবল হাঁচির শব্দ। সে প্রায় বোম ফাটার মতো আওয়াজ। আমি তো ভাবলাম, আবার বুঝি মাথার ব্যামোটা ফিরে এল। একবার গিয়ে দেখি। তারপর আবার ভাবলাম, আমারও তো বয়েস কম হল না, এখন যদি আমার গলা টিপে ধরে তাহলেই গেছি আর কি!

একটু পর অবশ্য ছোটাছুটি বন্ধ হল। আর সাড়াশব্দ নেই। আমিও সরে এলুম। পরদিন সকালে শুনি এই অবস্থা।'

টানটান হয়ে উঠে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এটা আগে বলেননি কেন?'

হাত উল্টোলেন অনুপম ঘোষ, 'কাকে বলব? কেউ জিগ্যেস করলে তো বলব। আগ বাড়িয়ে পুলিশকে জানিয়ে আমার লাভ?'

মনুজেন্দ্র আর প্রফেসর মুখার্জি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর মুখার্জিসাহেব বললেন, 'আজ তাহলে গেছিলেন কেন ওসি সাহেবের কাছে।'

গলাটা আরও খাদে নামালেন অনুপম ঘোষ, 'সেই থেকে পাড়ায় ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে স্যার। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় এমন বেশ কিছু বেড়াল মারা গেছে। সেদিন একটা কুকুর কী করে যেন ওদের পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়েছিল। তারপর সারা রাত তার কান্নায় কেউ ঘুমোতে পারিনি। সকালে শুনলাম লেকের পাশে কোথায় নাকি বডি পাওয়া গেছে।'

উঠে পড়লেন দুজনে। মনুজেন্দ্র নিজের ভিজিটিং কার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি নজর রাখতে থাকুন মিস্টার ঘোষ। নতুন কিছু দেখতে পেলে জানাবেন আমাকে।'

বাইরে বেরিয়ে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'ঘাঘু লোক।'

'কেন?'

'তার কারণ আছে। এবার এক কাজ করো তো বাপু, গাড়িটা একটু গড়িয়াহাটের দিকে নিয়ে চলো। একজনের সঙ্গে দেখা করা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে।

'কে?'

'ডাক্তার বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, সারভাননদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন।'

ডক্টর বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির চেম্বার ফার্ন রোডে, গড়িয়াহাট মার্কেটের পিছন দিকটায়। বেশ প্রাচীন বাড়ি, খুব সম্ভবত গড়িয়াহাট পত্তনের প্রথমদিকে বানানো। উঁচু উঁচু সিলিং, মোটা দেওয়াল আর পুরোনো আসবাবপত্র মিলিয়ে বাড়িটার মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য আছে।

ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বার বাড়ির একতলায়। দোতলায় ওঁর ভদ্রাসন। প্রফেসর মুখার্জি আর মনুজেন্দ্র যখন পৌঁছলেন, তখন প্রায় সাতটা। ডাক্তারবাবুর চেম্বার বন্ধ করার সময়। শেষ রোগীটি বেরিয়ে যাওয়া মাত্র দুজনে চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

ডক্টর চ্যাটার্জির বয়েস হয়েছে। প্রফেসর মুখার্জি অনুমান করলেন, আশির কম কিছুতেই নয়। গায়ের রঙটি কাশীর পাকা পেয়ারার মতো। মাথার চুল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চোখে মোটা চশমা আর মুখে একটি স্মিত হাসি। কিছু কিছু ডাক্তারবাবু আছেন, যাঁদের দেখলেই মনে বেশ একটা ভরসা জাগে। ইনি হচ্ছেন সেই গোত্রের ডাক্তার।

দুজনকে দেখে ডাক্তারবাবু অল্প হেসে বললেন, 'আমার চেম্বারে পুলিশ যে? স্মরণকালের মধ্যে কোনও মানুষ খুন করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

প্রফেসর আর মনুজেন্দ্র দুজনেই হেসে ফেললেন। মনুজেন্দ্র নিজেদের পরিচয় দিল। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'না, না, আপনি ভুল ভাববেন না ডক্টর চ্যাটার্জি। আমরা একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'প্লিজ শ্যুট।'

'আপনি রমেশ সারভানন, সুরেশ সারভানন এঁদের চেনেন নিশ্চয়ই? লেকের ওখানে বাড়ি। বাবার নাম গোবিন্দন সারভানন।'

'চিনি বই কি। আমিই তো ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ছিলাম।'

'সুরেশ সারভাননের হার্ট অ্যাটাকের সময় কি আপনিই দেখেছিলেন ওঁকে?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট ডেথ সার্টিফিকেটও আমিই লিখি। কেন বলুন তো?'

'ওয়েল ডক্টর চ্যাটার্জি, সুরেশ সারভাননের দাদা রমেশ সারভানন আজ থেকে দু'দিন আগে সুইসাইড করেছেন।'

'হোয়াট?' চেয়ার থেকে প্রায় উঠে পড়লেন ডক্টর চ্যাটার্জি, 'কী বলছেন কী?'

মনুজেন্দ্র ছোট করে পুরো ব্যাপারটা বলল। ডক্টর চ্যাটার্জি চুক চুক করতে করতে মাথা নাড়লেন, 'ভেরি আনফরচুনেট কেস। ভাবতেই পারছি না। কত ছোট থেকে দেখেছি ওদের। দুটো ভাই-ই যে এভাবে...

'কয়েকটা প্রশ্ন ছিল ডক্টর চ্যাটার্জি।'

'বলুন।'

'রমেশ সারভাননের মানসিক রোগটা কী ছিল একটু খুলে বলবেন?'

'অ্যাকিউট বাইপোলার ডিজঅর্ডার। হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, ঘন ঘন মুড স্যুইং, হঠাৎ অ্যাংজাইটি, হঠাৎ করে ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া, এসব হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। রমেশ ওয়াজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট চাইল্ড টু হ্যান্ডল। ভেরি ট্যালেন্টেড, বাট আ প্রবলেম চাইল্ড। বহু কষ্টে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে, থেরাপির মাধ্যমে ওকে আমি খানিকটা সুস্থ করে তুলি। তবে জানতাম এ সাময়িক। তাই একটু বড় হওয়ার পর আমি ওর মা বাবাকে বলি কোনও স্পেশালিস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে।'

'আই সি। আর সুরেশ সারভানন মারা গেলেন কী করে?'

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। রাত একটা নাগাদ বুকে পেইন ওঠে। ওর স্ত্রী আমাকে ফোন করেন। আমি যাই। গিয়ে দেখি সব শেষ। ওর স্ত্রী কাঁদছে। রমেশ বিধ্বস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশের কয়েকজন পাড়া প্রতিবেশী, বাড়ির কাজের লোক এরাও উপস্থিত ছিল। আমি সব চেক করে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে আসি।'

'হুম। আচ্ছা, সুরেশ সারভানন যখন বিয়ে করে কলকাতায় আসেন, তখন কি তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন? নাকি আগে?'

প্রশ্নটা শুনে মনুজেন্দ্র অবাক হলেও মুখে প্রকাশ করল না। ডক্টর চ্যাটার্জি একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রফেসর মুখার্জিকে দেখলেন। তারপর গম্ভীরমুখে বললেন, 'রামিয়া কলকাতায় আসার মাস পাঁচ-ছয়েক পর সুরেশ কলকাতায় আসে। ও অস্ট্রেলিয়াতে ব্যবসা গোটানোর কাজে আটকে গেছিল। এনিওয়ে, এবার আমাকে উঠতে হবে প্রফেসর মুখার্জি। প্লিজ এক্সকিউজ মি।'

দুজনে বেরিয়ে এলেন। মনুজেন্দ্র গাড়িটা গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নীচে পার্কিং করেছিল। দুজনে সেদিকে হাঁটতে লাগলেন। প্রফেসর মুখার্জিকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি হঠাৎ করে একটা পান-সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট কিনলেন। দেখাদেখি মনুজেন্দ্রও একটা সিগারেট ধরাল। জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার প্রফেসর মুখার্জি, এরকম চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন আপনাকে?'

'সুরেশ সারভাননের ডেথ সার্টিফিকেট চাই মনু।'

'সে কী? আপনি হঠাৎ সুরেশ সারভাননের হার্ট অ্যাটাক নিয়ে পড়লেন কেন?'

'কারণ আছে মনু?'

'সে তো আছেই। নইলে আর চাইবেনই বা কেন? বাই দ্য ওয়ে, সুরেশ সারভানন যে রামিয়ার পর কলকাতায় আসেন, সেটা আপনি ম্যাজিকের মতো আন্দাজ করলেন কী করে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'অনুপম ঘোষ অতি ধুরন্ধর চিজ হে। কথার প্যাঁচে কী করে ইনফর্মেশন দিতে হয় ভালোই জানেন। ওঁর কথাটা মনে করে দেখো, 'একদম সাজোয়ান ছেলে, অস্ট্রেলিয়া থেকে এল বউয়ের সঙ্গে সংসার করবে বলে—ডট ডট ডট। মানে বউ আগেই এসেছিল। সাজোয়ান ছেলে পরে এসেছে। একসঙ্গে এলে বলতেন, 'একদম সাজোয়ান ছেলে, অস্ট্রেলিয়া থেকে বউয়ের সঙ্গে এল সংসার করবে বলে। বুঝেছ?'

মনুজেন্দ্র নিচু হয়ে একটা বাও করল। প্রফেসর মুখার্জি সেটা দেখেও দেখলেন না। বললেন, 'শংকর সাধুকে জিগ্যেস করে কতগুলো ডেট আমাকে জানাও। এক, বিয়ের পর রামিয়া কবে কলকাতায় আসেন। দুই, সুরেশ সারভানন কবে আসেন। তিন, সুরেশ সারভাননের হার্ট অ্যাটাক কবে হয়।'

'সে তো এখুনি জিগ্যেস করতে পারি।'

মোবাইলটা বার করে শঙ্কর সাধুকে কল করল মনুজেন্দ্র। কিছুক্ষণ পর ফোন রেখে বলল, 'দু-হাজার দশ সালের জুন মাস নাগাদ রামিয়া কলকাতায় আসেন। সুরেশ আসেন ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। ডিসেম্বরের সেকেন্ড উইকে সুরেশ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।'

'এক্স্যাক্ট ডেট জানতে হবে মনু। এদের আসার এক্স্যাক্ট ডেট জানো।'

'হোয়াই স্যার?'

'আমি একটা খুব আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি মনু। সেটার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চাই। এবার ঝট করে গাড়িটা তোমাদের আপিসের দিকে চালাও তো বাপু। তোমাদের সাইবারবাবু আবার আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। বাই দা ওয়ে, আরেকটা খবর নাও তো মনু, রমেশ সারভাননের মৃত্যুর খবর শুনে রামিয়া যে ফ্লাইটে কলকাতায় আসেন, সেই ফ্লাইটে আমাদের চেনাজানা কেউ আছে কিনা?

* * *

সি আই ডি-র সাইবারবাবু সৌরভ মিত্রও কিন্তু কোনও আশার কথা শোনাতে পারলেন না অধ্যাপকমশাইকে। সি আই ডি-র সাইবার বিশেষজ্ঞরা আগেই রমেশ সারভাননের সমস্ত ডিজিটাল কমিউকেশন চেক করে দেখেছেন। কিন্তু কোনও থ্রেট, স্ক্যাম, স্ক্যান্ডাল বা অন্য কোনও সাসপিশাস অ্যাকটিভিটির কোনও চিহ্ন নেই। বিজ্ঞানীপ্রবরের সমস্ত অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন ফুটপ্রিন্ট ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার।

দৃশ্যতই হতাশ হলেন প্রফেসর মুখার্জি। উনি ভেবেছিলেন, সেই রাতে এমন কিছু ঘটেছিল, যা রমেশবাবুকে বাধ্য করেছিল আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে। ব্ল্যাকমেইল, হানি ট্র্যাপ অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু এখানে তো তেমন কিছুর ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না।

রমেশ সারভানন মারা যাওয়ার আগের শেষ তিনদিনের কল লিস্টও দেখছিলেন প্রফেসর মুখার্জি। বেশ কিছু বিদেশি ফোনে কল করেছিলেন রমেশ। প্রফেসর মুখার্জি জিগ্যেস করলেন, 'এই বিদেশি নম্বরগুলো কাদের, খোঁজ নেওয়া হয়েছে?'

'ইয়েস স্যার. সবই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আর রিসার্চারদের ফোন নম্বর। কিছু আছে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের।'

মারা যাওয়ার আগের দিন রামিয়ার সঙ্গে চারবার কথা হয়েছিল রমেশের। সেদিকে সৌরভ মিত্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই মিত্রমশাই বললেন, 'আমরা ওনার লাস্ট তিন মাসের কল ডিটেলস চেক করেছি। উনি প্রায়ই রামিয়া ম্যাডামকে ফোন করতেন।'

'তার ফ্রিকোয়েন্সি রিসেন্ট বেড়েছিল না কমেছিল?'

'গত এক মাস একটু বেশি ঘন ঘন ফোন করেছিলেন রমেশ।'

'হুম, ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, ওঁর ফোনে লাস্ট কী ছবি নেওয়া হয়েছিল দেখানো যাবে?'

মিত্তির মশাই মোবাইলের পিকচার গ্যালারি খুলে দেখালেন। কয়েকটা গাছের ছবি। সারভানন বাড়ির বাগানের। অন্ধকারে নেওয়া হলে কী হবে, ছবি কিন্তু চমৎকার উঠেছে। দামি ফোনের ক্যামেরা হলে যা হয়।

ছবিগুলো নিজের ফোনে ট্রান্সফার করালেন প্রফেসর মুখার্জি। এমনিতে এসব আইনে আটকায় বটে, তবে মাসছয়েক আগেই একটা সাইবার ফ্রডের কেসে দুজনের মধ্যে আলাপ হয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে গেছে। এরপর প্রফেসরসাহেব রমেশবাবুর বাড়ি থেকে সিজ করা সমস্ত আইটেমের লিস্টটা চাইলেন। তারপর সেটা খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উঠে পড়লেন। মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'বোধহয় বুনো হাঁসের পেছনেই ছুটছি মনু। এক কাজ করো, এই সিজার লিস্টটা আমাকে এক কপি জেরক্স করে দাও দেখি। আমি বাড়ি যাই এখন। ভেবে দেখি কেসটায় কোনও মেরিট আছে কি না। এনিওয়ে, কালই তো তোমার এডিজি সাহেবের দেওয়া টাইমলাইন শেষ হচ্ছে।'

যাওয়ার আগে একবার এডিজি সাহেবের ঘরে ঢুঁ মেরে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। ভাগ্নেমশাইকে একটা কাজের কথা বলতে হবে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

* * *

পরের দিন সকালে কলেজে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। আজ বেশ কয়েকটা ইম্পরট্যান্ট ক্লাস নিতে হবে। কিন্তু সারাদিন মন পড়ে আছে কেসের দিকে।

মনুজেন্দ্রর ফোন এল দুপুর নাগাদ। খুব উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'সব ডিটেলস পেয়ে গেছি স্যার, বলব?'

'নেকি অউর পুছ পুছ?''

'সুরেশ আর রামিয়ার বিয়ে হয় দু-হাজার দশ সালের একুশে মে। রমেশ উপস্থিত ছিলেন। ইন্ডিয়ান এমবাসির অনেক ডিগ্নেটারিসরাও উপস্থিত ছিলেন।

রামিয়া কলকাতা আসেন ১ জুন, সঙ্গে রমেশ সারভানন। তিনি তখন কলকাতায় পোস্টেড। সুরেশ সারভানন আসেন ২৮ নভেম্বর। ১০ ডিসেম্বর সুরেশ সারভানন হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।'

'এক্সেলেন্ট মনু। এবার তুমি ওই ২০১০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সুরেশ সারভানন কোনও হসপিটাল বা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা খোঁজ নাও তো।'

'কেন? এখানে আবার হসপিটাল কোথা থেকে এল?'

'সুরেশ সারভাননের আগে থাকতে কোনও হার্টের রোগ ছিল কি না, বা তার আগে অসুস্থ হয়েছিলেন কি না জানতে চাই।'

'সে তো ডাক্তার চ্যাটার্জিকে জিগ্যেস করলেই হয়।'

'না হে, আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে উনি এই বিষয়ে আর মুখ খুলবেন না। তুমি খোঁজটা নাও না বাপু।'

'ওকে স্যার।'

ফোন রাখতে না রাখতেই আবার ফোন। উনি হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে উত্তেজিত স্বর ভেসে এল দোর্দণ্ডপ্রতাপ এডিজি সাহেবের, 'খবর আছে মামাবাবু।'

'বলুন ভাগনেবাবু।'

'কয়েকটা ছোট খবর, কয়েকটা বড়। কোনগুলো আগে দেব?'

'আগে ছোটগুলো দিন।'

'শঙ্কর সাধুর সঙ্গে ছেলের তুমুল ঝামেলা চলছে। কী নিয়ে বোঝা যাচ্ছে না।'

'বটে? আর?'

'সেই ছেলে আর রমেশ সারভাননের মধ্যে রমেশ মারা যাওয়ার আগে বেশ কিছু কথাবার্তা হয়। তার ট্রান্সস্ক্রিপ্ট পাইনি, তবে খুব প্লেজেন্ট কথা হয়েছিল বলে তো মনে হয় না।'

ভুরু কুঁচকে গেল প্রফেসর মুখার্জির, 'আর কোনও খবর?'

'রামিয়া কি আপনাকে মুরুগান বলে কারো কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ, সে নাকি ওদের অস্ট্রেলিয়ার বিজনেস সামলায়। কলকাতার ছেলে।'

'এইবার রমেশের সুইসাইড খবর শুনে যে ফ্লাইটে রামিয়া এসেছে, সেই একই ফ্লাইটে মুরুগানও এসেছে।'

'মাই গুডনেস! ইটস এ বিগ নিউস ভাগনেবাবু!'

'অবশ্যই। আমাদের টিম মুরুগানকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে। আর কোনও নির্দেশ মামাবাবু?'

'অবশ্যই। উই নিড টু মিট দিস মুরুগান ফেলো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবিল। একটা কাজ করে দিতে পারবে স্যার?'

'ইয়েস মামা স্যার। বলুন।'

'এই মুরুগান ছোকরা কী করে অস্ট্রেলিয়াতে, কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আছে, সব ডিটেলস চাই। রমেশ সারভানন দেশের সেরা বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু রহস্যের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিশ্চয়ই এটুকু করবে?'

'সার্টেনলি মামাবাবু স্যার।'

প্রফেসর মুখার্জি আবার ক্লাস নিতে ঢুকে গেলেন। সামনে সেমিস্টার এক্সজাম, যে করেই হোক সিলেবাস শেষ করতে হবে।

পরের ফোন এল বিকেল শেষ হওয়ার মুখে। মনুজেন্দ্র ফোন তুলেই উত্তেজিত স্বরে বলল, 'একটা দুরন্ত খবর পেয়েছি স্যার।'

'বলো।'

'আপনার আদেশমতো সুরেশ সারভানন ওই সময় কোনও হসপিটাল বা নার্সিং হোমে ভরতি হয়েছিলেন কি না তার খোঁজ নিয়েছিলাম। না, সুরেশ সারভানন নামের কেউ কোথাও ভরতি হননি। কিন্তু উনি মারা যাওয়ার পর, ২০১০-এর ২২ ডিসেম্বর জনৈক মিস আর সারভানন সল্ট লেকের আমরিতে ভর্তি হন। তারপর ২৫ ডিসেম্বর তাঁকে রিলিজ করে দেওয়া হয়।'

'আচ্ছা! কি হয়েছিল মিস আর সারভাননের?'

'টারমিনেশন অফ প্রিম্যাচিয়র প্রেগন্যান্সি।'

'হোয়াট!'

'ইয়েস স্যার, তাও দু-মাসের মাথায়।'

'মাই গুডনেস! কি বলছ কি মনুজেন্দ্র? তুমি সিওর ইনি মিসেস রামিয়া সারভানন?'

'ডিটেলস চেয়েছি স্যার। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাব। তবে আমি প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট সিওর।'

'কি করে এত সিওর হচ্ছো?"

'কারণ মিসেস রামিয়া সারভাননকে রেফার করেছিলেন ডাক্তার বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি। আর তাঁকে রিলিজ করিয়ে নিয়ে যান জনৈক মিস্টার রমেশ সারভানন।'

'তোমার স্যার জানেন?'

'স্যার তো পাশেই বসে আছেন। ফোনটা দেব?'

'দাও।'

একটু পর ফোনের ওপার থেকে এডিজি সাহেবের সওয়াল ভেসে এল, 'এ তো বিশাল বড় কেচ্ছা মামাবাবু।'

'সে তো শুনলাম।'

'শুধু তাই নয়, আরও খবর আছে শুনুন। আমরা অস্ট্রেলিয়ার ইন্ডিয়ান এমব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। সব এমব্যাসিতেই কিছু স্পাই থাকে জানেন নিশ্চয়ই। একদম তুরান্ত খবর পেয়ে গেলাম। রামিয়া সারভানন কয়েক মাস ধরে লিভ ইন করছেন তাঁর বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে। ইয়েস, দ্যাট গ্রেট মুরুগান।'

'মাই গুডনেস। এ তো কেঁচো খুড়তে কেউটে নয়, একেবারে কিং কোবরা বেরোচ্ছে ভাগনেবাবু!'

'সে আর বলতে, কেস তো খুবই গণ্ডগোলের মামাবাবু। একটা কেচ্ছা যে জড়িয়ে আছে ফ্যামিলিটাকে নিয়ে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে রমেশ সারভাননের সুইসাইডের কী সম্পর্ক সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'একটু ধৈর্য ধরো ভাগনেবাবু। মুরুগানের খোঁজ পেলে?'

'আজ রাতের মধ্যে পেয়ে যাব মামাবাবু। আমাদের লোকজন ওর মোবাইল টাওয়ারের লোকেশান ট্র্যাক করে যাচ্ছে।'

'পাওয়ামাত্র জানাবে আমাকে। আর তোমার লোক যেন চব্বিশ ঘণ্টা ওয়াচে রাখে লোকটাকে।'

'জো হুকুম, স্যার।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল প্রফেসর মুখার্জির। সারাটা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছেন। কোথাও কিছু একটা গন্ডগোলের ইঙ্গিত তিনি পাচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে সামনে আসছে না।

স্নান সেরে নিজের স্টাডিতে এসে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি। নিজের কাবার্ড থেকে পছন্দের শিভাস রিগ্যালের বোতলটা বার করলেন তিনি। একটা লার্জ পেগ ঢাললেন গ্লাসে, দু-টুকরো আইস কিউব দিলেন, তারপর একটা গোল্ড ফ্লেক কিং সাইজ ধরিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে নিজের ভাবনার গভীরে ডুবে গেলেন।

মাথার মধ্যে অনেকগুলো চিন্তার ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। প্রফেসর মুখার্জি একটা চাইকোভস্কির কম্পোজিশন চালিয়ে দিলেন।

সুরেশ সারভাননের হার্ট অ্যাটাকের মধ্যেও কি কোনও রহস্য আছে? রামিয়া সারভানন যে তার অবৈধ প্রেগন্যান্সি অ্যাবর্ট করবেন সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই কথাটা ডাক্তার চ্যাটার্জি আমাদের জানালেন না কেন? কে এই মুরুগান? সে সামনে আসছে না কেন? লিভ ইন করা তো কোনও অপরাধ নয়। তাছাড়া ছেলেটি স্বজাতিও বটে।

শঙ্কর সাধুর ছেলে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে। বাবার কাছে টাকা চাইছে। তার এই সময়ে দেশে ফিরে আসাটাও কি কোনও সূত্র?

কিন্তু যদি এটা আত্মহত্যা না হয়ে খুন হয়, তাহলে তার মোডাস অপারেন্ডি কি? কে বা কারা এর পেছনে? আর খুনটা হলই বা কী করে?

কীসের রোঁয়া ছিল রমেশ সারভাননের হাতে? সন্ধেবেলা বাগানে কী দেখে চমকে উঠেছিলেন তিনি? ছোটাছুটি করছিলেন কেন?

তা ছাড়াও আরও একটা অসঙ্গতি প্রবীণ অধ্যাপকের অবচেতনে ঘাই মারছে।

কিন্তু সেটা কী কিছুতেই ধরতে পারছেন না তিনি। তাই অস্বস্তিটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

কী মনে হতে মোবাইল ফোন তুলে নিলেন প্রফেসরসাহেব। দশটি ডিজিট ডায়াল করলেন যা ওঁর মস্তিষ্কের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে আছে। ওপাশে রিং হতে একটা ভারী গলা ভেসে এল, 'ডক্টর যশরাজ আগারওয়াল স্পিকিং।'

অল্প কথায় পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বললেন প্রফেসর মুখার্জি। শেষে বললেন, 'আপনি মিস্টার রমেশ সারভাননকে কোন ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলেন একটু বলতে পারবেন প্লিজ?'

'সরি, এইভাবে আমি কোনও পেশেন্টের চিকিৎসার ডিটেইলস আননোন পার্সনকে দিতে পারি না।'

'আর যদি সেটা দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু হয় তাহলে?

'সেক্ষেত্রে দিতে পারি বটে, বাট বিফোর দ্যাট আই নিড টু কনফার্ম ইওর আইডেন্টিটি।'

ডক্টর যশরাজকে মনোজ চাকলাদারের ফোন নাম্বার দিয়ে আনমনে খেতে বসলেন প্রফেসর। স্ত্রী খাবার বেড়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'কে কোথায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, ইনি চললেন তার ভূতের শ্রাদ্ধ করতে। বলি কী দিয়ে খাচ্ছ, দেখেছ একবার?'

প্রফেসর মুখার্জি উত্তর দিলেন না। চুপচাপ খেয়ে দেয়ে উঠে গেলেন।

একটু পরেই হোয়্যাটসঅ্যাপে টিংটিং করে একটা পিডিএফ ফাইল ঢুকল। রমেশ সারভাননের প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন ডক্টর আগারওয়াল।

প্রেসক্রিপশন দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে গেল প্রফেসর মুখার্জির। দ্রুত উঠে গিয়ে সিজার লিস্টের কপিটা নিয়ে এলেন। কিন্তু সেটা ভালোভাবে দেখার আগেই মনোজ চাকলাদারের ফোন। কল অ্যাকসেপ্ট করে ফোনটা কানে নিতেই যেন একটা বোমা ফেটে পড়ল প্রফেসর মুখার্জির কানের কাছে, 'বিশাল খবর মামাবাবু। ভাবতে পারবে না, কী জানতে পেরেছি।'

'কী?'

'মুরুগানই হচ্ছে শঙ্কর সাধুর ছেলে।'

'মানে?' হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'তার নাম কার্তিক ছিল না?'

'ছিল, লায়েক হওয়ার পর সুরেশ সারভানন তাকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যান তাঁর হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে। সেখানে ওদের ফ্যামিলির সবাই তামিল বলে নাম বদলে মুরুগান রাখে। আর মুরুগান এমনিতেই কার্তিকের আরেক নাম, এ তো আর আপনাকে বলতে হবে না।'

'তা ইনি আছেন কোথায়?'

'শঙ্কর সাধুর এক রিলেটিভের বাড়িতে। আমরা ট্র্যাক করতে পেরেছি।'

'কড়া নজরে রাখো। বলামাত্র সসম্মানে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে।'

আরও দু-একটা কথা বলে ফোন রেখে দিলেন প্রফেসর মুখার্জি। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি এসে মুখঝামটা দিয়ে বললেন, 'অনেক হয়েছে। এবার কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইডের ওষুধ খেয়ে আমায় উদ্ধার করলে কৃতার্থ হই।'

প্রফেসর মুখার্জি আনমনে বললেন, 'ওষুধটা একটু খুঁজে এনে দাও না প্লিজ। কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না।'

মুখার্জিগিন্নি উত্তপ্ত হলেন, 'কেন? সব কিছু আমাকে মুখের সামনে ধরে দিতে হবে কেন? নিজের ওষুধ গুছিয়ে রাখতে পারো না?'

কোথাও কিছু নেই, লাফিয়ে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি। বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'কী বললে আবার বলো।'

মুখার্জিগিন্নি চোখ পাকিয়ে প্রত্যুত্তর করলেন, 'বলবই তো! একশোবার বলব। আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? নিজের ওষুধটা নিজে গুছিয়ে রাখতে পারো না?'

কোথাও কিছু নেই, গিন্নিকে জড়িয়ে ধরে একপাক নেচে নিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর দ্রুত মোবাইল তুলে মনুজেন্দ্রকে ফোন করলেন। কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে মোবাইলটা খুলে বসলেন তিনি। রমেশ সারভাননের ক্যামেরায় তোলা শেষ ছবিগুলো গুগল লেন্সে ফেলে একের পর এক দেখতে লাগলেন।

* * *

সকাল সকাল ঘুম ভাঙল মনুজেন্দ্রর ফোনে, 'চিড়িয়া ধরা পড়েছে স্যার। ভোরবেলা ট্যাক্সি করে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন ম্যাডাম। গোলপার্কের কাছে আমাদের লোক আটকে লেক থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু ভদ্রমহিলা ইংরেজিতে হেবি তর্জন গর্জন করছেন। এমনিতেও উনি অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, কোনও সলিড গ্রাউন্ড ছাড়া বেশিক্ষণ আটকে রাখলে বিদেশমন্ত্রককে জবাবদিহি করতে হতে পারে।'

মুখার্জিসাহেব হেসে বললেন, 'চিন্তা কোরো না, ওঁকে চুপ করিয়ে রাখার মন্ত্র তোমার কানে কানে বলে দিচ্ছি মনু। কিন্তু তুমি এত সকালে চিড়িয়ার উড়ালের খবর পেলে কী করে?'

'দ্য গ্রেট অনুপম ঘোষ। ভদ্রলোক ভোর পাঁচটায় ফোন করে বললেন, রামিয়া নাকি তাঁদের বাগানের বেশ কিছু গাছ কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা ওঁর স্ট্রাইক করাতে আমাকে জানান। আমি সঙ্গে সঙ্গে লেক থানাকে বলি ওখান থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার সমস্ত রাস্তা ব্লক করতে। অজয় শাসমলের কাছে রামিয়া সারভাননের ছবি ছিলই। পুলিশের আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধা হয়নি।'

'বাহ। এবার দুজন পুলিশ পাঠাও মিস্টার মুরুগান ওরফে কার্তিক সাধুকে তুলে আনতে।'

'বলে দিয়েছি স্যার।'

'আর শঙ্কর সাধুকেও।'

'সে কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিও সমান দোষে দোষী। আর এডিজি সাহেবকে নিশ্চয়ই জানিয়েছ?'

'সে আর বলতে। উনি আর কমিশনার সাহেব অন দ্য ওয়ে। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন স্যার। নইলে ভদ্রমহিলা যেমন ক্রুদ্ধ পাইথনের মতো ফোঁস ফোঁস করছেন, সামলানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ান এমব্যাসি থেকে ফোন এলো বলে।'

'বললাম তো, সে নিয়ে চিন্তা কোরো না। রামিয়া ম্যাডামের কানে আমার দেওয়া গুরুমন্ত্রটি একবার উচ্চারণ করো। দেখবে ক্রুদ্ধ পাইথন কেমন নিরীহ কেন্নোর মতো গুটিয়ে গেছে।'

'কী মন্ত্র স্যার?'

'গিম্পি গিম্পি।'

* * *

'রামিয়া সারভানন প্ল্যানটা ফেঁদেছিলেন ভালোই। ভাসুরকে নিখুঁত প্ল্যান করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা গেল। অথচ ঘটনাটা যখন ঘটল তখন তিনি অস্ট্রেলিয়াতে বসে, কারও সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে, যদি এটা খুনই হবে তাহলে তার মোটিভ কী?'

আলাপ জমেছিল কমিশনার সাহেবের চেম্বারে। উপস্থিত ছিলেন মনোজ চাকলাদার, মনুজেন্দ্র, অজয় শাসমল আর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার। আসরের মধ্যমণি একজনই, দ্য গ্রেট চিন্তাহরণ মুখার্জি।

এখন আমরা মোটিভটা জানি। অন্তত আন্দাজ করতে পারি যে, কোন ঘটনা থেকে এর শুরু আর পুরো ব্যাপারটা কীভাবে এগিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব আমার যুক্তিসঙ্গত অনুমান। ঠিক কি না সে তদন্ত করার পরেই জানা যাবে।

রমেশ সারভানন ছিলেন অ্যাকিউট বাইপোলার ডিসঅর্ডারের পেশেন্ট। এই রোগের অনেক সিম্পটম আছে, যার অনেকগুলি আমরা রমেশ সারভাননের মধ্যে দেখেছি। তবে একটি অত্যন্ত ইম্পরট্যান্ট সিম্পটম যা চট করে বোঝা যায় না, সেটি হচ্ছে অত্যধিক মাত্রাতিরিক্ত যৌনতা, ইনস্যাটিয়েবল ডেজায়ার ফর সেক্স!

এদিকে রমেশ সারভানন বিয়ে করেননি। তিনি খুব একটা সংসারী মানুষ ছিলেন না। কাজই তাঁর ধ্যান জ্ঞান সবকিছু। জীবনের বেশিরভাগ সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। সেখানে সেক্স ব্যাপারটা দেশের মতো ট্যাবু নয়। তাই হয়তো পার্মানেন্ট সঙ্গিনীর অভাব বোধ করেননি। কিন্তু অসুবিধা হল যখন তিনি ইন্ডিয়ার টপ সায়েন্টিস্টদের একজন হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর সেক্সুয়াল এনকাউন্টারের ওপর রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ চাপল। কারণ সেই রন্ধ্রপথে হানি ট্র্যাপের কালনাগিনী প্রবেশ করতে পারে।

রমেশ সারভানন নিজেকে কাজের মধ্যে আরও ডুবিয়ে দিলেন, নিজের

যৌনতার কামড় উপেক্ষা করেই। তাঁর কিছুই করার ছিল না।

এই সময় ভাই সুরেশ সারভানন বিয়ে করলেন। বউ অপরূপ সুন্দরী। গায়ে বিদেশি রক্ত। রমেশ মোহিত হয়ে গেলেন। কিন্তু ভ্রাতৃবধুর দিকে কুনজর দেওয়া যে-কোনও সংস্কৃতিতেই গর্হিত অপরাধ।

সুরেশ আর রামিয়া খুব সম্ভবত বিয়ের আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, ওঁরা বিয়ে করে কলকাতা শিফট করবেন। সেই প্ল্যান মতো রামিয়া কলকাতা এলেন। রমেশও সঙ্গে এলেন। সুরেশ রয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়া। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ গুটিয়ে ফেলার জন্য।

রামিয়ার সম্ভবত কৃতী পুরুষদের প্রতি আলাদা আকর্ষণ ছিল। একই বাড়িতে একজন সুন্দরী মহিলাও আছেন। আর আছেন বহুদিন মহিলাসঙ্গ বঞ্চিত এক্সেসিভ সেক্সুয়াল আর্জি চেপে রাখা এক পুরুষ। ফলে যা হওয়ার তাই হল, দুজনে অবাধে মিলিত হতে লাগলেন। এবং কোনও পক্ষের অসাবধানতায় রামিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়লেন।

ওদিকে সুরেশ অনেক চেষ্টা করেও ব্যবসা পুরো গুটিয়ে ফেলতে পারলেন না। হয় মার্কেটে পড়ে থাকা পাওনা পুরো আদায় করতে পারেননি, বা ব্যবসা বিক্রি করতে গিয়ে উপযুক্ত দাম পাননি, কিছু একটা হবে। তিনি শঙ্কর সাধুর ছেলে কার্তিককে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ব্যবসার কাজে লাগিয়ে নেবেন বলে। ছোকরা কালে কালে ম্যানেজার হয়ে ওঠে। রমেশ তার নতুন নাম দিয়েছিলেন মুরুগান। ভদ্রলোকের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কার্তিক আর মুরুগান একই দেবতা।

সেই মুরুগান ওরফে কার্তিক তখন সুরেশ সারভাননকে বলল যে, ব্যবসাটা সেই দেখবে। যতদিন না উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া যায়।

সুরেশ সারভানন খুশি হয়ে কলকাতা এলেন। আর এসে আবিষ্কার করলেন যে, তার স্ত্রী দু-মাসের প্রেগন্যান্ট। আর এই অপকর্মটি আর কেউ না, করেছেন তার নিজের দাদা। যাকে তিনি ছোটবেলা থেকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতেন।

সেই রাতেই সুরেশের হার্ট অ্যাটাক হয়। কয়েক দিন পর ডাক্তার বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির রেফারেন্সে রামিয়া সারভানন অ্যাবরশন করানোর জন্য সল্ট লেকের আমরিতে ভরতি হন। ভরতি থেকে রিলিজ সবই করান রমেশ সারভানন। তারপর রামিয়া আর এ দেশে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি পত্রপাঠ অস্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়ে ব্যবসার দায়িত্ব নিলেন।

এতদিন ঠিক চলছিল। রামিয়া মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তখন রমেশও চলে আসতেন। দুজনে নিজেদের যৌন তৃপ্তি মিটিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যেতেন। আমার ধারণা, শঙ্কর সাধু সবই জানতেন। কিন্তু সাধু ফ্যামিলি দুই পুরুষ ধরে সারভানন ফ্যামিলির নুন খায়। তিনি মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন।

ঝামেলা শুরু হল কয়েক মাস আগে থেকে। রামিয়ার বোধহয় পার্মানেন্ট কম্পানিয়নশিপের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তিনি রমেশকে অ্যাপ্রোচ করতে পারতেন বিয়ের জন্য, কিন্তু করলেন না। কেই বা আর সাধ করে অ্যাকিউট বাইপোলার

ডিসঅর্ডারের রুগির সঙ্গে ঘর করতে চায়?

একসঙ্গে কাজ করতে করতে মুরুগান আর রামিয়ার মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এদিকে মুরুগান ওরফে কার্তিকও বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। তাকে শঙ্কর সাধুর ছেলে বলে চেনাই যায় না। দুজনে লিভ ইন করতে লাগলেন।

খবরটা রমেশ সারভাননের কানে পৌঁছতে তিনি ক্ষিপ্ত হলেন। একে তিনি প্রবল প্রতাপশালী পুরুষ। আর প্রবল পুরুষদের যৌন ঈর্ষাও বড় প্রবল হয়। তার ওপর বাড়ির কাজের লোকের ছেলের সঙ্গে বাড়ির বউ লিভ টুগেদার করবে? রমেশ সারভাননের রাগ বড় সাংঘাতিক। তিনি প্রতিনিয়ত দুজনকে ফোন করে হুমকি দিতে থাকলেন।

রামিয়া আর কার্তিক, দুজনেই জানতেন রমেশ কতটা প্রভাবশালী লোক। তাই দুজনে মিলে এই নারকীয় প্ল্যান ফাঁদেন। আর সঙ্গে টেনে নিলেন শঙ্কর সাধুকে। শঙ্কর সাধুর চোখে তখন সারাভাননের পুরো প্রপার্টির মালিক হওয়ার স্বপ্ন।

'রামিয়া সারভানন হচ্ছেন একজন টিম্বার মার্চেন্ট। কাঠের ব্যবসা। যে-কোনও কাঠের ব্যবসায়ীকেই স্থানীয় বনজঙ্গল ভালো চিনতে হয়। সেই সূত্রেই তিনি এই গাছটি, যার স্থানীয় নাম গিম্পি গিম্পি, তার খোঁজ পান।

অস্ট্রেলিয়া এক আশ্চর্য মহাদেশ। সবচাইতে হিংস্র এবং আগ্রাসী জন্তু-জানোয়ারদের বাস সেখানে। সে সবচাইতে বিষধর সাপ ইনল্যান্ড তাইপানই হোক বা ডিঙ্গো নামের হিংস্রতম কুকুর। এছাড়াও এমন অনেক অদ্ভুত প্রাণী আছে দেখে মনে হয় অন্য গ্রহের জীব!

সেই অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রদেশ কুইন্সল্যান্ড। তার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জঙ্গলে জন্মায় গিম্পি গিম্পি নামের এই খতরনাক গাছটি। গাছ নয় অবশ্য, গুল্ম বললেই চলে। বৈজ্ঞানিক নাম ডেন্ড্রকনাইড মরোয়েডস। লাউপাতার মতো বড় পাতা। শেপ অবশ্য পানের মতো। পাতা আর নরম কাণ্ড জুড়ে অজস্র সুচের মতো রোঁয়া। আর সে রোঁয়া একবার ছুঁলে আর রক্ষা নেই।

লোকে বলে, একবার ছুঁলে নাকি একসঙ্গে হাজার বোলতার কামড়, অ্যাসিডের জ্বালা আর ইলেকট্রিক শকের অনুভূতি হয়। ইংরেজিতে অনেকে বলে সুইসাইড প্ল্যান্ট। কারণ এর বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। এমন খতরনাক গাছ দুনিয়াতে দুটি নেই। জ্যান্ত গাছ তো বটেই, এমনকী এর শুকনো পাতাও সমানরকম ডেঞ্জারাস। আর এই বিষাক্ত রোঁয়া একবার দেহে ঢুকলে কমসে কম দু থেকে তিন বছর দেহে থেকে যায়।

রামিয়া সারভাননের শয়তানি প্ল্যানটা শুরু হল এখান থেকেই। তিনি মাসদুয়েক আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে বেশ কিছু গাছের বীজের সঙ্গে গিম্পি গিম্পির কিছু বীজও পুঁতে দিলেন নিজেদের বাগানে। শঙ্কর সাধুকে বাগানে ঢুকতে বারণ করে দিলেন। যাতে আগে সে এই ঘাতক গাছটির সংস্পর্শে না আসে। শঙ্কর সাধু পুরো ব্যাপারটা জানত, সে নিজেও এই পরিকল্পনার অংশ ছিল।

শঙ্কর সাধুর জন্য আরও একটি কাজ নির্দিষ্ট করা ছিল। আর তার জন্য

নির্দিষ্ট করা সেই কাজটি সে অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিল. রমেশ সারভাননের ওষুধ পালটে দেওয়া!

রামিয়া সারভানন বীজ পুঁতে গেলেন বর্ষার ঠিক আগে আগে। বর্ষার দুমাসে সেই শয়তানি গাছের চারা মাথা তুলে দাঁড়াল। দু-মাস পর রমেশ সারভানন এলেন। রামিয়া জানতেন বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভোগা ভাসুর কী ওষুধ খায়। সেই ওষুধের নাম আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ডক্টর আগরওয়াল। ওষুধের জেনেরিক নাম ডেসভেনলাফ্যাক্সিন, চলতি নাম ভেনিজ।

রামিয়া তার বদলে অ্যাটেরাল বলে একটি ওষুধ দিয়ে গেলেন শঙ্কর সাধুকে। দুটোই বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ওষুধ। কিন্তু অ্যাটেরালের একটি কড়া পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এর প্রভাবে লোকে হ্যালুসিনেট করে, আর সেরকম ট্রিগার থাকলে আত্মহত্যার প্রবণতা জন্মায়। শঙ্কর সাধুর ওপর নির্দেশ রইল সময় সুযোগ মতো রমেশ সারভাননের ওষুধ বদলে দেওয়ার।

ব্যস, রামিয়া সারভাননের সমস্ত প্ল্যান রেডি। রমেশ সারভানন এলেন। রামিয়ার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে গাছ চিনতে গিয়ে গিম্পি গিম্পি ছুঁলেন। আস্তে আস্তে যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। তিনি তার মধ্যেই ওষুধ খেলেন। ওই প্রবল যন্ত্রণায় খেয়াল করলেন না যে তাঁর ওষুধ পাল্টে গেছে। একটু পরে দুইয়ের প্রভাবে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। আর ছোট থেকেই আত্মহত্যাপ্রবণ বাইপোলার ডিসঅর্ডারের রোগীটি এবার সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে বসলেন।

এত অবধি সব ঠিক ছিল। রমেশ সারভানন আত্মহত্যা করেছেন। তখন অকুস্থলে কেউ ছিল না। শরীরে কোনও বিষের ডোজেস নেই, কোনও গানশট উন্ড নেই, নিডল পারফোরেশন নেই। কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। সুরেশ বা শঙ্করকে ইন্ডিকেট করার মতো কোথাও কিস্যু নেই। আ পারফেক্ট ক্রাইম।

কিন্তু ভুল হয়ে গেল দুটো জায়গায়।

এক, রমেশ সারভাননের মোবাইলে তোলা শেষ ছবিগুলো আমার হাতে চলে আসে। সেগুলো গুগল লেন্সে ফেলে দেখতে দেখতে চমকে উঠি একটি বিশিষ্ট গাছ দেখে। গিম্পি গিম্পির ব্যাপারে ভাসা ভাসা জানা ছিল। গুগল লেন্স জানিয়ে দেয় ওই প্রাণঘাতী গাছটি উপস্থিত আছে সারভাননদের বাগানে। আর অনুপম ঘোষের মুখে রমেশ সারভাননের শেষ মুহূর্তের যা বর্ণনা পাই তা হুবহু মিলে যায় গিম্পি গিম্পির অ্যাটাকের সিম্পটমের সঙ্গে। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে চার করতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি তুচ্ছ অসঙ্গতি ধরা পড়ে যাওয়া।

কাল রাতে আমার গিন্নি কথায় কথায় অভিযোগ করছিলেন যে আমি নিজের ওষুধ নিজে গুছিয়ে রাখি না। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় অনেকদিন ধরে টিকটিক করা অস্বস্তিটা হঠাৎ করে ক্লিয়ার হয়ে গেল।

শঙ্কর সাধুকে যখন জিগ্যেস করা হয়, সেদিন সে কী কী করেছিল। তখন তার বলা বিবরণের মধ্যে একটা ছিল রমেশবাবার ওষুধ গুছিয়ে রাখা। আর পরের

দিনই রামিয়া সারভানন জানালেন যে, রমেশের নিজের জিনিস ঘাঁটা বা গুছিয়ে রাখা নিয়ে ওসিডি ছিল। দুটো একসঙ্গে ট্রু হতে পারে না। হলে বুঝতে হবে কোথাও একটা গন্ডগোল আছে।

শঙ্কর সাধুর উচিত ছিল ওষুধ গুছিয়ে রাখার কথাটা না বলা। খুব সম্ভবত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে সেটা চেপে যাওয়ার কথা তার মনে হয়নি। আর সেখানেই দুজনে ধরা পড়ে গেল।

পাড়ার বিড়াল-কুকুর মারা যাওয়ার কথাটা নিশ্চয়ই শঙ্কর সাধুই তুলে দিয়েছিল রামিয়ার কানে। না দিলেও ওই খতরনাক গাছ বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। তাই রামিয়া সারভানন পাপের শেষ চিহ্নটি জ্বালিয়ে রওনা দিয়েছিলেন এয়ারপোর্টের দিকে। একবার দেশের বাইরে চলে গেলে ভদ্রমহিলাকে ধরা অসম্ভব হয়ে যেত। হল না সারভাননদের প্রতিবেশী অনুপম ঘোষের জন্য, যিনি প্রায় রাডার যন্ত্র বসিয়ে ফেলেছিলেন পাশের বাড়ির ওপর। আর আমাদের অজয় শাসমলের দ্রুত অ্যাকশন।'

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল গোটা কাহিনিটা। মুখার্জি সাহেব শেষ করতে প্রথম কথা বললেন কমিশনার গোয়েল, 'কিন্তু প্রফেসর সাব, ওই খতরনাক রোঁয়া অর হোয়াটএভার, সে তো যারা রমেশ সারভাননের বডি হ্যান্ডেল করেছে তাদেরও অ্যাফেক্ট করতে পারত। কই, আর কারও মধ্যে এর সিম্পটম দেখা যায়নি।'

'কারা বডি হ্যান্ডেল করেছে? পুলিশ আর ফরেনসিক। তারা খালি হাতে বডি নাড়াচাড়া করেনি, ডিসপোজেবল ল্যাটেক্স গ্লাভস ইউস করেছে। ফলে তারা এর সংস্পর্শে আসেনি। খালি হাতে কেউ ছুঁলে অবশ্য অনেক আগেই এই কেসের ফয়সলা হয়ে যেত।'

হাততালি দিয়ে উঠলেন কমিশনার গোয়েল, 'ব্রাভো প্রফেসর সাব, ব্রাভো। ইটস সার্টেনলি দ্য উইয়ার্ডেস্ট কেস আই হ্যাভ এভার সিন। প্লিজ অ্যাক্সেপ্ট মাই সিনসিয়ারেস্ট কমপ্লিমেন্টস।'

বাকিরাও হাততালি দিয়ে উঠলেন। সবাই উচ্ছ্বসিত। কলকাতা পুলিশের মুকুটে এই কেস এক নতুন পালক বই কি।

অভিনন্দন বার্তা ইত্যাদি শেষ হলে প্রফেসর মুখার্জি কমিশনার সাহেবের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। মনুজেন্দ্র তার গাড়িতে তুলে নিল গুরুকে। ফিসফিস করে জিগ্যেস করল 'কোথায় যাবেন স্যার?'

আকর্ণবিস্তৃত হাসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'সাউথের দিকে গুয়াংজাউ বলে কী একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ খুলেছে না মনু? খেয়েছ কখনও?'



অপহরণের আড়ালে

arajokota Xclusive

বিধান সরণী ধরে কালো রঙের এস ইউ ভিটা যাচ্ছিল বাগবাজারের দিকে। এখন বেলা একটা বাজে, রাস্তাঘাটে প্রচুর ভিড়। গাড়ি চলছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে।

গাড়ি চালাচ্ছিল মনুজেন্দ্র। পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম, চোখে গগলস। পাশে বসে প্রফেসর মুখার্জি। পরনে সাধারণ শার্ট ট্রাউজার। পায়ে একটা পা ঢাকা চামড়ার চপ্পল। তিনি অত্যন্ত বেসুরে 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে' গাইছিলেন।

গানের গুঁতোয় অতিষ্ঠ হয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হল মনুজেন্দ্র, 'কিছু মনে করবেন না স্যার। ঈশ্বর আপনাকে অনেক প্রতিভা দিয়েছেন। কিন্তু গানের ইয়েটা বোধহয় দেননি।'

'বটে?' বলে গান বন্ধ করে বেজার মুখে বসে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি।

মনুজেন্দ্র মুচকি হাসল। তারপর একটা বাসকে ওভারটেক করতে করতে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'তবে একটা কথা স্যার। কিছু মনে করবেন না, এসব পাতি কেসে আপনার মতো লোককে ইনভলভ করা কিন্তু ঠিক নয়।'

'কেসটা পাতি হলে মনোজ, মানে তোমাদের স্যার আমাকে বিরক্ত করত না মনু। তাছাড়া এটাও তো দেখতে হবে কার ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে। জগদিন্দ্রনারায়ণ মুখার্জির ফ্যামিলি কি আর হেঁজিপেঁজি ফ্যামিলি হে?'

মনুজেন্দ্র চুপ করে গেল। প্রফেসর মুখার্জি'র কথায় যুক্তি আছে বটে।

দিন চারেক হল স্যার জগদিন্দ্রনারায়ণ মুখার্জির নাতি ব্রতীন্দ্রনারায়ণকে কেউ রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেছে। স্যার জগদিন্দ্র অবশ্য মারা গেছেন বহু আগে। এখন সে বাড়িতে সপরিবারে বাস করেন তাঁর ছেলে দীপনারায়ণ। দীপনারায়ণ আত্মীয়স্বজন, ব্রতীনের বন্ধুবান্ধব, সব জায়গায় খোঁজ করে শেষে পুলিশে ডায়রি করেন, আর ফোন করেন তাঁর বাল্যবন্ধু, সি আই ডি'র ডিজি মনোজ চাকলাদারকে।

কেসটা প্রথমে লোকাল থানাই হ্যান্ডেল করছিল। কিন্তু বাগবাজারের মুখার্জিরা বনেদী পরিবার। বাগবাজারের মতো জায়গায় বিশাল বাড়ি, গ্যারেজে কম করে তিন তিন খানা দামি গাড়ি। এককালে সাহেবসুবোদের সঙ্গে মুখার্জিদের নিত্য ওঠাবসা ছিল। স্যার জগদিন্দ্রনারায়ণ এককালে নেপাল রাজদরবারে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের সদস্যও ছিলেন বেশ কয়েকবছর। প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ফলে ওপর মহল থেকে চাপ আসতে শুরু করল। পুলিশের কর্তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই কেস সি আই ডি'কে হ্যাণ্ডওভার করা হবে।

কোনও কেস পুলিশ থেকে সি আই ডি-র হাতে আসার কিছু পদ্ধতি আছে। সেসব চুকিয়ে এডিজি মনোজ চাকলাদার তদন্তের ভার মনুজেন্দ্রর কাঁধে তুলে দিলেন আর একটা ফোন করলেন তাঁর মামাবাবুকে।

দীপনারায়ণ মুখার্জি হচ্ছেন পরিবারের বর্তমান মালিক। বয়েস পঞ্চাশের আশেপাশে, লম্বা দোহারা চেহারা। কাঁচাপাকা চুল, সরু গোঁফ আর রিমলেস চশমায় ভদ্রলোকের মধ্যে একটা বেশ আভিজাত্যের ছাপ আছে। তবে এখন দুর্ভাবনায় উদ্বেগে ভদ্রলোককে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে।

দুজনকে আপ্যায়ন করে ঘরে বসালেন দীপনারায়ণই। প্রফেসর মুখার্জি লক্ষ্য করলেন অন্দরমহলের দরজার পর্দার ওপারে কোনও মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শাড়ি পরা পা দুটি দেখা যাচ্ছে। বুঝলেন, বনেদী পরিবারটির রেওয়াজও সেরকমই, এখনও এই পরিবারের মহিলারা চট করে পরপুরুষের সামনে আসেন না।

দীপনারায়ণ উদ্বিগ্নস্বরে বললেন, 'কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা কোজও খোঁজ পেলেন আমার ছেলের?'

প্রফেসর মুখার্জি শান্তস্বরে বললেন, 'চিন্তা করবেন না সাহেব। পুরো সি আই ডি ডিপার্টমেন্ট যখন কাজে নেমেছে, খুব শিগ্গিরিই একটা ভালো খবর পাবেনই।'

দীপনারায়ণ বললেন, 'আজ অবধি আমার ছেলে একটা রাতও বাড়ির বাইরে কাটায়নি। কোথায় আছে, কেমন আছে, কী খাচ্ছে...' শেষের দিকে গলা ধরে এলো ভদ্রলোকের।

মনুজেন্দ্র বলল, 'চিন্তা করবেন না মিস্টার মুখার্জি। আমরা তো আছিই। আমি মনুজেন্দ্র বর্মন, এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। আর ইনি প্রফেসর চিন্তাহরণ মুখার্জি, একটি এম বি এ কলেজে মার্কেটিং পড়ান। খুব ক্রিটিকাল কেস হলে আমাদের একটু সাহায্য করেন। '

প্রফেসর মুখার্জি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার ফর ইওর কাইন্ড ওয়ার্ডস।'

মনুজেন্দ্র পুলিশি প্রশ্নোত্তর শুরু করে দিল, 'প্রাথমিক তদন্ত তো স্থানীয় পুলিশ করেই গেছে।, সেই রিপোর্টও আমাদের কাছে আছে। তাই সেসবের মধ্যে আর যাচ্ছি না। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, আপনার কাছে কোনও মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসেনি এখনও?'

'না ইনস্পেকটর। কোনও ফোন কল, মেসেজ, কিচ্ছু আসেনি। আমি তো বুঝতেই পারছি না কারা এমন কাজ করল।'

'ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ওর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল বলে জানতেন? মানে যারা এ কাজ করতে পারে?'

'না ইনস্পেকটর। ইজ ফ্যাক্ট, ওর কোনওকালেই খুব বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না। আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই খুব ইন্ট্রোভার্ট। একটি মেয়ে আছে ভেরোনিকা বলে, তার সঙ্গেই ব্রতীনের একটু আধটু বন্ধুত্ব ছিল। এ ছাড়া ওর আর কোনও বন্ধুবান্ধবের নামই শুনিনি।'

প্রফেসর মুখার্জি এবং মনুজেন্দ্র দুজনেই ভুরু কুঁচকোলেন। পরের প্রশ্ন করলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আপনার কোনও শত্রু আছে যে এই কাজ করতে পারে?'

'না প্রফেসর মুখার্জি। সারাজীবন একটি বেসরকারি কম্পানিতে চাকরি করেছি।

চিরকালই ওপরওয়ালা এবং অন্যান্য কলিগদের সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। পাড়া-প্রতিবেশিরাও চিরকাল সুখে দুঃখে পাশে থেকেছেন। আমার কোনও শত্রু থাকতে পারে এ কথা ভাবতেই পারি না।'

প্রফেসর মুখার্জি অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললে, 'মনু, ব্রতীনের কলেজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ স্যার। ওর বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউ নেই। দীপনারায়ণবাবু যেমন বললেন, ওই ভেরোনিকা নামের মেয়েটির সঙ্গেই তার যা কিছু বন্ধুত্ব ছিল। সে অবশ্য বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। ভেরোনিকা সহ বাকি সমস্ত ব্যাচমেটদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করিয়েছি। অল ক্লিন।'

'অ্যাবডাকশনটা যেখানে হয়েছে সেখানে কোনও সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগানো ছিল না?'

'না স্যার। ঘটনাটা ঘটেছে একটা গলির মধ্যে। জায়গাটা এমনিতে নির্জন, তার ওপর সেদিন তেমন লোকও ছিল না ওখানে। যারা করেছে তারা রীতিমতো রেইকি করে, টাইম দেখে কাজটা করেছে।'

দীপনারায়ণ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ছেলে বেঁচে আছে তো ইনস্পেকটর?'

দীপনারায়ণের শেষ কথাটা শুনে দরজার কাছ থেকে একটা ডুকরে কান্নার আওয়াজ উঠল। প্রফেসর মুখার্জি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন শাড়ি পরা পা দুটি দ্রুত সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মনুজেন্দ্র বলল, 'আমরা কলকাতা আর সাউথ বেঙ্গলের সমস্ত থানা, হাসপাতাল, মর্গ এসব জায়গায় অ্যালার্ট জারি করে রেখেছি, কোনও আনআইডেন্টিফায়েড ডেডবডি দেখলেই যেন আমাদের খবর দেয়। আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ছেলের ডেডবডি পাওয়া গেলে আপনি টাইমেই খবর পাবেন।'

শেষ কথাটা শুনে দীপনারায়ণের কণ্ঠাটা বার দুয়েক ওঠানাম করল। প্রফেসর মুখার্জি যে দৃষ্টিতে মনুজেন্দ্রর দিকে তাকালেন তাতে সত্যযুগ হলে মনুজেন্দ্রর ভস্ম হয়ে যাওয়ার কথা।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'এছাড়া আর কিছু ঘটেছে এই দুদিনের মধ্যে? এমন কিছু যা আমাদের বলা উচিত বলে আপনার মনে হয়?'

দীপনারায়ণ খানিকক্ষণ মাথা টিপে ধরে রইলেন। বললেন, 'তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। ব্রতীন উধাও হওয়ার দিন থেকেই বাবার লাইব্রেরির একটা পার্টিকুলার বই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কোন বই?'

'বাবারই লেখা একটা বই, নাম কল অফ দ্য সিন্ধ। বাবা সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করেছেন বহুদিন। প্রচুর বইপত্র পড়তেন, এই বিষয়ে জ্ঞানীগুণী লোকজনের সঙ্গে পত্রালাপ ছিল। বইটা সেই নিয়েই লেখা। প্রকাশিত হয়েছিল ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে। এককালে খুব প্রশংসা পেয়েছিল সাহেবদের কাছে। অ্যানথ্রপোলজির অনেক পুরোনো পেপারেই বাবার বইয়ের রেফারেন্স পাবেন।'

'ওই বইটাই চুরি গেছে বলছেন?'

'দেখুন, চুরি গেছে নাকি মিসপ্লেসড হয়েছে বলা মুশকিল। তবে বইটা যে নেই সেটা শিওর।'

কথা হচ্ছিল জগদিন্দ্রনারায়ণের লাইব্রেরিতে বসেই। তবে লাইব্রেরি না বলে মিউজিয়াম বললেই বেশি ভালো হয়। কয়েকহাজার বই। দেওয়াল জুড়ে বড় বড় র‍্যাক। তার মধ্যে পোর্সিলিনের পুতুল, রূপোর বাসন, পেতলের বড় পিলসুজ, ধাতুর তৈরি বিচিত্র সব বৌদ্ধমূর্তি, প্রাচীন নাইটল্যাম্প, পোর্সেলিনের ভাস, বেলজিয়ান কাচের আয়না, পুরোনো আগ্নেয়াস্ত্র, নেপালি খুকরি, বিভিন্ন পানপাত্র, হাতির দাঁতের ছোটখাটো কারুকার্য, ছোরা-তলোয়ার, ছোট ছোট টেবিল ঘড়ি। দেওয়ালে ঝুলছে কিছু অ্যান্টিক ঘড়ি, তিন চারটে ছবি, কিছু টিবেটান থাঙ্কা এইসব।

প্রফেসর মুখার্জি একবার চারিদিকে চেয়ে বললেন, 'সবই তো দেখছি রেয়ার অ্যান্টিক জিনিস।'

দীপনারায়ণ বললেন, 'বাবার অ্যান্টিক সংগ্রহের বাতিক ছিল। আমি অবশ্য এসব তেমন বুঝি না। তবে ব্রতীন বুঝত। ছোটবেলা থেকেই এই কালেকশন নিয়ে তার প্রচুর ইন্টারেস্ট। প্রায়ই এখানে এসে বিভিন্ন আইটেম নিয়ে নাড়াঘাটা করত, বইগুলো পড়ত। এমনকী আমাকে একবার বলেছিল এই আর্টিফ্যাক্টসগুলোর হিস্ট্রি খুঁজে বার করবে ও। সে ছেলে যে কোথায় গেল...' দীপনারায়ণ কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

'হুম। আচ্ছা, আপনার বাবার এই সংগ্রহের এমন কিছু আছে যা অত্যন্ত দামি?'

দীপনারায়ণ গলাটা একবার পরিষ্কার করে বললেন, 'নাহ্। বছর পাঁচেক আগে এক ভ্যালুয়ারকে ডাকা হয়েছিল। তিনি মোটামুটি একটা হিসেব দিয়ে গেছিলেন। সেই অনুসারে এখানে এমন কিছুই নেই যা অত্যন্ত দামি বা রেয়ার অ্যান্টিক। যা আছে তেমন রেয়ার বই বা অ্যান্টিক কলকাতার অনেক পুরোনো বাড়ি বা অকশন হাউসেই পাবেন।

'বইও তো কম দেখছি না। তা এত বইয়ের মধ্যে ওই বইটাই চুরি গেছে বুঝলেন কী করে? নিশ্চয়ই এই লাইব্রেরি রোজ ব্যবহার করা হয় না যে আপনি লক্ষ্য করবেন কবে কোথায় কোন বই আছে বা নেই।'

'ঠিকই বলেছেন। তবে বাবার বইটা লাইব্রেরির র‍্যাকে নয়, ওই যে রিডিং টেবিলটা দেখছেন, ওর ড্রয়ারে রাখা থাকত। বাবার কড়া নির্দেশ ছিল, বইটা যেন কখনও ওখান থেকে সরানো না হয়। ব্রতীন যেদিন অ্যাবডাকটেড হয়, সেদিন দুপুরে কাজের মাসি ডাস্টিং করতে এসে আবিষ্কার করে যে বইটা নেই।'

'বইটার কোনও বিশেষত্ব আছে?'

'নাহ, পুরোনো বই যেমন হয়। শুধু প্রথম পাতার মাথার দিকে একটা সিঁদুরের ছাপ ছিল, প্লাস্টিকে মোড়া।'

'সিঁদুরে ছাপ প্লাস্টিকে মোড়া? সে কীরকম?'

'মানে কোনও মন্দির-টন্দিরের আশীর্বাদী সিঁদুরের ছাপ দেওয়া একটুকরো গোল

কাগজ। বেশ পুরোনো। সেটাকে একটুকরো ছোট প্লাস্টিকে মুড়ে প্রথম পাতার ওপর সাটানো ছিল। ওতে হাত দিলে বাবা অত্যন্ত রেগে যেতেন, তাই আমরা বইটাতে কেউ হাত দিতাম না।'

'আপনার বাবা কি খুব ধার্মিক ছিলেন?'

'প্রচণ্ড। ঠাকুর দেবতা পুজো মানত, এসব লেগেই থাকত। দেশের হেন কোনও বড় মন্দির নেই যেখানে বাবা যাননি।'

'হুম। আচ্ছা দীপবাবু, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

'আমি, আমার স্ত্রী নীলিমা, আমার ছেলে, আর কয়েকটি কাজের লোক, ব্যস এই।'

'কাজের লোক বলতে?'

'আমার ড্রাইভার, নাম দীনেশ। ইয়ং চটপটে চতুর ছেলে। বিয়েশাদি করেনি। রান্না করা আর সারাদিনের কাজের লোক বলতে মতির মা, আর ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য একটি ঠিকে কাজের মেয়ে।'

'দাদা বা ভাই বোন কেউ নেই আপনার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দীপনারায়ণ। 'এক ভাই আছে বটে। আমার থেকে বছর আটেকের ছোট। তবে কোথায় আছে জানি না। বেঁচে আছে কী না, তাও জানি না।'

কৌতূহলী হলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'মানে?'

'আমার বাবা জগদিন্দ্রনারায়ণের অনেক প্রতিভার সঙ্গে কিছু কিছু দোষও ছিল। এক তো উগ্র ব্রিটিশভক্ত ছিলেন। তাঁর মতে এদেশের যা ভালো হয়েছে সব সাহেবদের জন্যই। তার সঙ্গে ছিল অত্যন্ত নাক উঁচু মনোভাব। গরীব গুর্বো নিচু জাতের লোকেদের মানুষ বলেই মনে করতেন না। আচার আচরণ কথাবার্তা সবেতেই ব্রিটিশদের অন্ধভাবে নকল করতেন।

আমি আবার আমার বাবার ঠিক উলটো। সেটা অবশ্য আমাদের মা, প্রয়াতা নিবেদিতা মুখার্জির কল্যাণে। আমার মা প্রবল জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ইয়ং বয়সে সাম্যবাদী আন্দোলনের দিকেও ঝোঁকেন। বহুদিন প্রেসিডেন্সিতে ইকোনমিকস পড়িয়েছেন। খবরের কাগজে লেখালিখিও করতেন।

আমার ভাই ব্রজনারায়ণ বাবার দোষ গুণ সবই পুরোমাত্রায় পায়। নিজের ভাই বলে বলছি না, অঙ্কে এমন পরিষ্কার মাথা কমই দেখা যায়। কিন্তু ওই যে, রক্তের দোষ। বাবার জমিদারি মেজাজটি পুরোমাত্রায় পেয়েছিল সে। কথায় কথায় লোককে হেয় করা, অপমান করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নিয়ে আমার আর মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য লেগেই থাকতো। শেষে একদিন মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার পর সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তখন ভাইয়ের বয়েস একুশ, আমার উনত্রিশ। সেই থেকে গত বিশ বছরের ওপর তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই। মাঝেমধ্যে একটা করে পোস্টকার্ড পেতাম। বাবা মারা যাওয়ার পর তাও বন্ধ।'

'কী কাজ করেন আপনার ভাই?'

'শুনেছি সিস্টেম অ্যানালিস্ট। বিদেশে কোনও একটা কম্পানিতে কাজ করে। ব্যস, আমার পরিবার বলতে এই।'

ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ইন্টারেস্টিং।' তারপর মুখ তুলে বললেন, 'বাবা মারা যাওয়ার পর সব সম্পত্তি আপনিই পান?'

দীপনারায়ণ মাথা নাড়লেন, বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা সব উইল করে আমাকেই দিয়ে গেছেন। ভাইকে অবশ্য খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু মায়ের চাপে সে বেচারিকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি। তবে...'

'তবে কী?'

'আমার বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁর ওই বইটি, যেটি চুরি গেছে, আমাকে দিয়ে বলেন ভাই কখনও ফিরে এলে তাকে দিতে। বলতেন, ব্রজকে বোলো এই কল অফ দ্য সিন্ধ-এর কপিটি তাকে তার বাবার আশীর্বাদ। সে যেন এর সঠিক ব্যবহার করে। তবে ব্রজর হিস্ট্রি বা অ্যানথ্রপলজি নিয়ে কোনওদিনই কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না। তাই এই আশীর্বাদের কোনও মানে খুঁজে পাইনি।'

'হুম। ঠিক আছে দীপবাবু। আমার ফোন নাম্বারটা রাখুন। কোনও ডেভেলপমেন্ট হলে জানাবেন। আপাতত চলি। পরে আবার কথা হবে।'

* * *

মুখার্জি ভিলা থেকে বেরিয়ে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'ড্রাইভার, কাজের লোক, এদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করিয়েছ মনু?'

'ইয়েস স্যার। নো ক্লু। অল ক্লিন।'

'হুঁ, ড্রাইভার বা কাজের লোকের অবশ্য এতটা সাহস হওয়ার কথাও নয়। এবং বিশেষ করে যখন এই অপহরণের উদ্দেশ্যটাই বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ করো তো বাপু, ওই ভেরোনিকা মেয়েটির ফোন নাম্বার আছে নিশ্চয়ই তোমার কাছে। দেখো তো মেয়েটিকে ফোনে পাও কী না। একবার কথা বলতে চাই।'

'সে বলুন। তবে খুব ইনফ্লুয়েনসিয়াল ফ্যামিলির মেয়ে। বাপের দেদার টাকা। পলিটিক্যালি কানেকশনও আছে। একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবেন, কেমন?'

প্রফেসর মুখার্জি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আজ অবধি আমাকে কখনও বেহিসেবি কথাবার্তা বলতে শুনেছ মনু?'

মনুজেন্দ্র অপ্রস্তুত হল, 'আহা, তা বলছি না। এমনিতে মেয়ে খুবই স্মার্ট। দাঁড়ান, ওকে ফোন করি।

ভেরোনিকাকে ফোনে পাওয়া গেল। সে আপাতত একটা কাজে ভবানীপুরে আছে। ওঁরা চাইলে সে কাছাকাছি কোথাও চলে আসতে পারে।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'মাঝামাঝি কোথাও আসতে বলো। ধরো পার্ক স্ট্রিট-এর ফ্লুরিজ। আমরা যেতে যেতে ও পৌঁছে যাবে।'

প্রফেসর মুখার্জির অনুমানই ঠিক। ওঁরা পৌঁছে দেখলেন ভেরোনিকা আগে থেকেই ওঁদের জন্য ওয়েট করছে।

ভেরোনিকা ভারি মিষ্টি মেয়ে। ছোটখাটো গোলগাল। পরে আছে জিন্স আর টপ। ববকাট চুল আর রিমলেস চশমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ওঁরা ঢুকতেই সে হাত নাড়িয়ে ওঁদের ডেকে নিলো। তারপর বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যারস। টেল মি, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

বাকি কথা ইংরেজিতে হল। ভেরোনিকা ইংরেজি আর হিন্দিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারে।

ভেরোনিকা ওর বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। বাবার এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা আছে। প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়। ভেরোনিকাও বিদেশ গেছে অনেকবার। স্কুল লাইফ কেটেছে দার্জিলিং-এ। কলকাতার মেয়ে হলে কী হবে, ভেরোনিকার এই প্রথম কলকাতায় পড়তে আসা।

ব্রতীনের সঙ্গে ভেরোনিকার আলাপ কলেজের প্রথম দিন থেকেই। ব্রতীন খুব চাপা ইন্ট্রোভার্ট টাইপের ছেলে। ভেরোনিকাও কলকাতার পরিবেশে খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল না। দুজনের বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি।

ব্রতীন স্টুডেন্ট হিসেবে চমৎকার। কম্পিউটার সায়েন্সে আশ্চর্য মাথা। জটিল সমস্ত কোডিং অনায়াসে করে ফেলে। ভেরোনিকাকে পড়াশোনায় অনেক সাহায্য করে সে। ব্রতীন অনেকবারই ভেরোনিকার বাড়িতে গেছে। ভেরোনিকাও ব্রতীনের বাড়িতে গেছে কয়েকবার।

না, কলেজে ব্রতীনের কোনও শত্রু নেই। ব্রতীন খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে, কারো সঙ্গে কোনও ঝগড়া মারামারিতে জড়ায় না। ছাত্র রাজনীতিতেও তার কোনও উৎসাহ নেই। তার ধ্যানজ্ঞান শুধু প্রোগ্রামিং আর কোডিং। আর সিলেবাসের বাইরেও সাইবার ওয়ার্ল্ড নিয়ে তার অফুরন্ত উৎসাহ। দিনরাত ওতেই মজে থাকে সে। তার কাছ থেকে ভেরোনিকা কেন, ক্লাসের অনেকেই অনেক উপকার পেয়েছে।

ভেরোনিকার শখ বলতে পেইন্টিং। তার ইচ্ছে ছিল আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু বাবা মায়ের জোরাজুরিতে সে এই কোর্সে ভর্তি হয়েছে। তবে তার এতে খুব একটা উৎসাহ নেই। গ্র্যাজুয়েশনের পরেই সে ইউ এস চলে যাবে। সেখানে তার কাজিনস'রা আছে। ইচ্ছে আছে কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে মাস্টার্স করার।

ব্রতীনের সঙ্গে কেরিয়ার নিয়ে ভেরোনিকার অনেক কথা হয়। ব্রতীনের খুব ইচ্ছে বিদেশ গিয়ে মাস্টার্স করার। কিন্তু সে তার বাবা মা-র একমাত্র সন্তান, তাঁরা তাকে চোখে হারান। তাঁরা কিছুতেই তাকে বিদেশ যেতে দেবেন না। সেই নিয়ে ব্রতীন বেশ মনমরা হয়ে থাকে। ব্রতীন কোথাও ঘুরতে যায় না, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নাইট আউট করে না, পার্টিতে যায় না। রাত আটটার মধ্যে তাকে বাড়িতে ঢুকতেই হয়, মায়ের কড়া আদেশ।

ব্রতীনের জন্য ভেরোনিকাও উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নিজের বাবাকেও বলে রেখেছে সে, যদি দরকার হয় দীপ আঙ্কলের সঙ্গে বাবার কথা বলিয়ে দেবে সে। পুলিশের যখনই দরকার তখনই তাকে ফোন করতে পারে।

বিল মিটিয়ে দিয়ে তিনজনে কথা বলতে বলতে লোরেটো কলেজের সামনে এলেন। গাড়ি ওখানেই পার্ক করা ছিল। ভেরোনিকা ওর নিজের গাড়িতে উঠে ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেল।

মনুজেন্দ্র বলল, 'বলেছিলাম না, স্মার্ট মেয়ে।'

'সাহসীও বটে। নইলে কলকাতা শহরে এসে নিজে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করা চাট্টিখানি কথা নয়। বাই দ্য ওয়ে, গাড়ির নাম্বারটা নোট করেছ মনু?'

মনুজেন্দ্র বলল, 'সে করা আছে। আপনাকে পাঠিয়ে দেব?'

'থাক, তার আর দরকার হবে না। WB02F 2153 দেখে নিয়েছি।'

মনুজেন্দ্র একটা বাও করল, 'ধন্য আপনার মেমরি স্যার।'

প্রফেসর মুখার্জি একটা উদার হাসি হাসলেন। তারপর মনুজেন্দ্রর পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে বললেন, 'এবার ম্যাগনোলিয়া থেকে একটা আইসক্রিম খাওয়াও তো মনু। সকাল থেকে বহুত দৌড় করিয়েছ।'

* * *

'মামাবাবু, কী বুঝছেন কেসটা?' বাদামের বাটি থেকে একটা বাদাম তুলে হাতে নিয়ে কথাটা বললেন মনোজ চাকলাদার।

আড্ডাটা হচ্ছিল পরেরদিন সকালে, প্রফেসর মুখার্জির লেকটাউনের বাড়ির ড্রয়িংরুমে। মনোজ চাকলাদার সস্ত্রীক উপস্থিত। মনুজেন্দ্রও এসেছে ব্রেকফাস্টের আমন্ত্রণ পেয়ে।

'বলা মুশকিল ভাগ্নে। ছোকরার জন্য মুক্তিপণ চেয়ে কোনও ফোন আসেনি। ওদের বাড়িতে এমন কোনও রেয়ার অ্যান্টিক্যুইটিজ নেই যার জন্য লোকে ছোকরাকে তুলে নিয়ে যাবে। কারো সঙ্গে ব্রতীন বা দীপনারায়ণের, কোনও শত্রুতা নেই। এই অ্যাবডাকশনের মেইন মোটিভটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

'আর ওই বই চুরি?'

'দেখো বইটা চুরি গেছে না মিসপ্লেসড হয়েছে, সেটাই এখনও ঠিক হল না। চুরি গেলে চোর অমন গাদাগুচ্ছের আর্টিফ্যাক্টস না নিয়ে একটা বই নেবে কেন?'

মাথা নাড়ল মনুজেন্দ্র। কথাটায় যুক্তি আছে। মনোজ চাকলাদার গম্ভীরমুখে বললেন, 'তাহলে আপাতত কী করণীয়?'

'সাধারণ পুলিশি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছ তোমরা, যেমন নাকা চেকিং, হোটেল লজ ইত্যাদিতে খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি, রাইট?'

'ইয়েস স্যার। সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডে আমাদের যে যে কানেকশন আছে তাদেরও অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। চট করে ব্রতীনকে কেউ হাপিস করে দিতে পারবে না।'

'গুড। এখন কথা হচ্ছে যে...'

প্রফেসর সাহেবের কথা আর শোনা হল না, কারণ তার আগেই তাঁর মোবাইল ফোনটি বেজে উঠেছে। তিনি ফোনটা শুনে 'হ্যালো' বলে কিছুক্ষণ শুনলেন। তারপরই লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সে কী? কখন?'

মনুজেন্দ্র আর মনোজ চাকলাদার স্থির চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসর মুখার্জির দিকে।

প্রফেসর সাহেব ফোনটা রেখে রুদ্ধস্বরে বললেন, 'একটু আগে ব্রতীন বাড়ি ফিরে এসেছে।'

* * *

ব্রতীনকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে এখন সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। একটু আগে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। তিনি বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। এক সপ্তাহের সম্পূর্ণ বেডরেস্ট নিতে বলেছেন। দুদিন ধরে ব্রতীনকে কড়া সিডেটিভ দিয়ে রাখা হয়েছিল। তার ঘোর কাটতে এখনও সময় লাগবে।

দীপনারায়ণের স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে তিনজনে ব্রতীনের মুখোমুখি হলেন। তাকে প্রশ্ন করে যা জানা গেল সেটাকে গল্পের আকারে লিখলে ঠিক এই রকম শোনায়।

কলেজ স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে প্রেসিডেন্সির সামনে দাঁড়াতেই একটা ট্রাম পেয়ে গেছিল ব্রতীন। অনেকক্ষণ ওয়েট করেছে লোকটার জন্য। আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। বইটা এখনও তার ব্যাগেই আছে কী না সেটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিল সে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে এসে দাঁড়ালো।

লোকটা ব্রতীনকে কল করেছিল গত পরশু। ব্রতীন প্রথমে বোঝেনি লোকটার কী দাবি। ঠাকুর্দার লাইব্রেরি থেকে ঠাকুরদারই লেখা একটা বই তাকে এনে দিতে হবে, এই ছিল লোকটার বক্তব্য। বইটা নাকি লোকটার খুব দরকার, জেরক্স করেই ফেরত দিয়ে দেবে সে। তার বদলে মোটা টাকা পাবে ব্রতীন। তবে শর্ত একটাই, কথাটা ব্রতীন তার বাবাকে বলতে পারবে না।

টাকা জিনিসটার এখন ব্রতীনের খুব প্রয়োজন। ক'টা হাতখরচের টাকায় কীভাবেই বা চলে তার। তাছাড়া লোকটা তো আর বইটা নিয়ে চলে যাচ্ছে না, জেরক্স করেই ফেরত দিয়ে দেবে। এটাকে তো আর চুরি বলে না। তাই দোনোমোনো করে রাজি হয়ে গেছিল ব্রতীন। কেন বাবাকে বলা যাবে না, শুধু জেরক্স করার জন্য এত টাকা কে দেয়, এসব কূট প্রশ্ন তার মাথায় এসেছিল বটে, তবে সেসব সে পাত্তা দেয়নি। হাতে টাকা এলে অত কে বিচার করে? বইটা লাইব্রেরি থেকে নেবে, আবার বিকেলে যথাস্থানে ফেরত দিয়ে দেবে, এই তো ব্যাপার। সেই জন্য সে বাড়ির গাড়িও নেয়নি।

ব্রতীন ঠান্ডা মাথার ছেলে। তার সব কাজেই একটা ধীর স্থির ব্যাপার থাকে। ফলে ট্রামটা তার সামনে এসে পুরোপুরি দাঁড়াবার আগে সে মোটেও ট্রামে চড়ার চেষ্টা করল না। ট্রামে উঠে একদম শেষের দিকে জানলার পাশে একখানা ফাঁকা সিট দেখে বসল সে, তারপর পিঠের ব্যাগ থেকে নতুন কেনা বইটা বার করে পড়তে লাগল।

খানিকক্ষণ পর তার স্টপেজ আসতে নেমে পড়ল ব্রতীন। এখান থেকে তার বাসস্থান দশ পনের মিনিটের পথ। এটুকু হেঁটেই মেরে দেবে সে।

একটু পর ব্রতীনের একটা অস্বস্তি হতে লাগল। রাস্তাটা একটু নির্জন। মনে

হল কে যেন ওর পেছন পেছন হেঁটে আসছে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে।

ওর ঠিক পিছনে একটা লোক। বোধহয় ওর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটছিল। বয়েস পঞ্চাশের ওপরে। দড়কচা মারা চেহারা, মাথায় লম্বা জটা, ভাঙা গালে একমুখ দাড়ি। পরনে একটা নোংরা গেরুয়া আর চাদর, কাঁধে একটা ময়লা ঝোলা। ব্রতীনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু কাঁচুমাচু স্বরে বললো, 'একটা কথা বলবো ভাই?'

'কী?'

'দুপুর থেকে আজ কিছু জোটেনি। পেটের ভেতরটা কেমন যেন পাক দিয়ে উঠছে। কিছু খাওয়াবে ভাই?'

ব্রতীন বাগবাজারের বিখ্যাত মুখার্জিদের বাড়ির ছেলে। এককালে তাদের বাড়িতে নাকি রোজ পঞ্চাশ জনের পাত পড়ত। এখন অবশ্য সে বোলবোলাও নেই। না থাকলে কী হবে, মেজাজটা তো আছে। ব্রতীন গলা খাঁকরে বলল, 'কী খাবেন?'

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'যা খাওয়াবে তাই খাবো।'

ব্রতীন নিজের টিফিন বাক্সটা খুলে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এই নিন।'

লোকটার বোধহয় খুব খিদে পেয়েছিল। গোগ্রাসে ব্রতীনের দেওয়া রুটি তরকারি চিবোতে লাগল সে। সেদিকে দেখে মায়া হচ্ছিল ব্রতীনের। আহা রে, কতদিন হয়তো পেট ভরে খায়নি।

লোকটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা অস্বস্তি হতে লাগল ব্রতীনের। কীসের অস্বস্তি সেটা বলতে পারবে না সে। কী যেন একটা চেনা চেনা লাগছে, কী যেন একটা অসঙ্গতি তার চোখে পড়ছে! অথচ ধরতে পারছে না সে।

দু-মিনিটের মধ্যে ব্রতীনের টিফিনবাক্স সাফ। তারপর লোকটা একগাল হেসে বলল, 'সাধুসন্ন্যাসী খাইয়ে মস্ত পুণ্যি করলে বাবা। এই নাও, একটা প্রসাদী ফুল দিলাম। সঙ্গে রেখো, তোমার কল্যাণ হবে।'

ব্রতীন ফুলটা হাত পেতে নিল। এরকম ফুল আগে দেখেনি সে। কল্কে ফুলের মতো দেখতে, কিন্তু আরও অনেক সুন্দর গঠন, আর রংটাও চমৎকার গোলাপি রঙের।

ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'এ কী ফুল?'

লোকটা হেসে বলল, 'শুঁকে দেখো না।'

ব্রতীন ফুলটা নাকের কাছে নিয়ে যেতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল। ব্রতীন মুখ তুলে কী একটা বলতে যাবে, এমন সময় লোকটা একটা ভেজানো রুমাল ব্রতীনের মুখে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। ব্রতীন চেতনা হারাবার আগে বুঝল যে ওকে গাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কতগুলো লোক।

প্রফেসর মুখার্জি ব্রতীনের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, ব্রতীন, যখন তোমাকে অ্যাবডাক্ট করা হয়, তখন তোমার সঙ্গে কী কী ছিল?'

'আমার ল্যাপটপের ব্যাগ, ওয়ালেট আর রুমাল। ল্যাপটপের ব্যাগে আমার ল্যাপটপটা ছিল আর বইটা।'

'আর তারা তোমাকে যখন ছেড়ে দেয় তখন ব্যাগটা ফেরত দিয়েছিল?'

মাথা নাড়ল ব্রতীন, 'শুধু বইটা ফেরত দেয়নি। বাকি সবই ফেরত দিয়েছে।'

প্রফেসর মুখার্জি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'একটা দামি ল্যাপটপ হাতে পেয়েও ঝেড়ে দেয়নি, ছেড়ে দিয়েছে। এ তো ভারি সৎ এবং নির্লোভ অপহরণকারী বলতে হবে!'

মনুজেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'লোক তিনটে কেমন দেখতে বলতে পারবে? বা কোন জাতির লোক? মানে কোন ভাষায় কথা বলছিল, আচার আচরণ কীরকম এসব কিছু মনে আছে?'

ব্রতীন মাথা নাড়ল, 'সাধুবাবাকে ওই একবারের পর দ্বিতীয়বার আর দেখিইনি। বাকি লোকদুটোর বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। মুখ দেখতে পাইনি, কারণ সবসময়েই কাপড়ের মাস্ক পরে থাকত। আমার সামনে কথাবার্তা বলত না বললেই চলে। এক দুবার যা বলেছে, হিন্দিতে বলেছে।'

'যেখানে রাখা হয়েছিল সেই ঘরটার বর্ণনা দিতে পারবে ব্রতীন?'

'সেরকম বলার মতো কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, যে ফ্ল্যাটে আমায় আটকে রাখা হয়েছিল, সেটা দোতলায়। ওঠবার সময় সিঁড়ি আর ল্যাণ্ডিং গুনতে ভুল হয়নি তার। যে ঘরে আমায় রাখা হয়েছিল সে ঘরে একটা খাট আর চেয়ার টেবিল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঘরে একটাই জানলা ছিল যার শার্সিতে কালো কাগজ সাঁটা ছিল, জানালা খোলারও কোনও উপায় ছিল না। ঘরের দরজা সবসময় বন্ধ থাকত। বাথরুম যাওয়ার হলে দরজায় টোকা দিতে হতো। তখন ওই মুশকো দুটো লোকের কেউ না কেউ খুলে দিত।'

না, ব্রতীনের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়নি বটে, তবে যা খাবার তাকে দেওয়া হতো, খেলেই প্রচণ্ড ঘুম পেত। বেঁধে রাখার প্রয়োজনই হয়নি।

এই দুদিন কলকাতার কোন এলাকায় রাখা হয়েছিল সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা আছে?

ব্রতীন মাথা নেড়ে জানায়, সে ব্যাপারে তার কোনও ধারণাই নেই। কারণ একে সে সজ্ঞানে ছিল না। তার ওপর তাকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার এটুকু মনে আছে যে এই দুদিন আচ্ছন্নভাবের মধ্যেও সে বেশ কয়েকবার মাইকে আজান শুনেছে, আবার ঘনঘন ট্রেনের হুইসিলও শুনেছে।

একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত, তাকে কোনও একটি দু-কামরার ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছিল। বাথরুমে যাতায়াতের পথে সে দেখেছে যে দুটো ছাড়া আর ঘর নেই। আর একদিন সে যখন বাথরুমে যাচ্ছিল তখন সে পাশের ঘরে সেই সাধুবাবাকে দেখে, তিনটে ল্যাচপটপ নিয়ে বসে থাকতে। তখন অবশ্য তিনি প্যান্ট শার্ট পরে ছিলেন। তবে পিছন থেকে দেখলেও সাধুবাবাকে চিনতে তার অসুবিধা হয়নি। তিনি ল্যাপটপের ওপর ঝুঁকে কিছু একটা কাজ করছিলেন। অবশ্য ব্রতীন বেশিক্ষণ দেখার সময় পায়নি, যারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন তাকে ধমকে বাথরুমে যেতে বলে।

দলে কজন ছিল? ব্রতীনের মতে দলে টোটাল তিনজন ছিল, আর ওই

সাধুবাবাই তাদের লিডার। আর কাউকে সে আসতে দেখেনি, বা অন্য কারো গলার স্বর শোনেনি। তবে তারা লোক হিসেবে ভালো। তাকে কোনো মারধোর বা খারাপ ব্যবহার করেনি, উলটে ভালো ব্যবহার করেছে, যা চেয়েছে তাই খাইয়েছে, উপরন্তু বিরিয়ানিও। দুদিন পরে আজ ভোরবেলা তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে প্রিন্সেপ ঘাটে। এমনকি হাতে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে যাতে সে নিরাপদে বাড়ি যেতে পারে। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে এসেছে সে।

সব শুনে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'এ তো বড় আশ্চর্য কাহিনি বললে বাবা ব্রতীন। এমন সদয় অপহরণকারী তো চট করে দেখা যায় না। কী এডিজি সাহেব! তোমার কেস হিস্ট্রিতে এমন কিছু আছে নাকি?'

মনোজবাবু মাথা নাড়লেন, 'না মামাবাবু, আমি কখনো এমন শুনিনি। বিশেষ করে অপহৃতকে বিরিয়ানি খাওয়ানো হচ্ছে, আনবিলিভেবল।'

প্রফেসর মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ব্রতীন, বিরিয়ানিতে কি ডিম ছিল?'

মনোজ চাকলাদার হকচকিয়ে গেলেন। মনুজেন্দ্র তার স্যারের কানে কানে বলল, 'প্রফেসর সাহেবের সব ভালো, শুধু নোলাটা...'

ব্রতীন ঘাড় নেড়ে জানালো, ছিল। প্রফেসর সাহেবের পরের প্রশ্নটা আরও হকচকিয়ে দেওয়ার মতো, 'বিরিয়ানির সঙ্গে সাইড ডিশ কিছু ছিল না?'

মনোজ চাকলাদার হাসি চাপতে অন্য দিকে তাকালেন। ব্রতীন দুর্বলস্বরে বলল, 'মাটন স্টু বলে কিছু একটা ছিল।'

'বেশ রগরগে করে? গোলমরিচ দিয়ে?'

মনুজেন্দ্র বুঝতে পারছিল না, সে কী করবে। দীপনারায়ণের মুখ দেখেও বোঝা গেল তিনিও যারপরনাই বিস্মিত হয়েছেন।

ব্রতীন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'তা বাপু, তুমি বিরিয়ানি খেতে চাওয়ার কতক্ষণ পর বিরিয়ানি এসেছিল কিছু মনে আছে?'

ব্রতীন বলল, 'প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট পর।'

প্রফেসর মুখার্জি প্রসন্নস্বরে বললেন, 'ব্যস, ব্যস, এতেই হবে। আর কিছু মনে পড়ছে ব্রতীন? এমনকিছু যা তোমার মনে হচ্ছে যে আমাদের জানা উচিত?'

ব্রতীন খুব দুর্বলস্বরে বলল, 'না। আসলে আমার মাথাটা খুব একটা কাজ করছে না তো!' প্রফেসর মুখার্জি শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, ঠিক আছে। তোমাকে এতটা কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করো না।'

এই বলে তিনি দীপনারায়ণের দিকে চাইলেন। বললেন 'আপনার বাবার লাইব্রেরিটা একটু দেখা যেতে পারে?'

* * *

লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রথমেই যে টেবিলের ড্রয়ারে চুরি যাওয়া বইটা ছিল, তার কাছে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর লাইব্রেরির সবগুলো বই দেখলেন খুব মনোযোগ দিয়ে। মনুজেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার টিম ফরেনসিক পরীক্ষা

করে গেছেন মনু? বইগুলোতে হাত দিলে অসুবিধা নেই তো?'

মনুজেন্দ্র মাথা নাড়ল, 'না স্যার, অসুবিধা নেই।'

প্রফেসর মুখার্জি বইগুলো উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। প্রচুর বই লাইব্রেরিতে, কম করে চার পাঁচ হাজার তো হবেই। বেশিরভাগই সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস এসব বিষয়ের বই। তাছাড়া সাহিত্য, সিনেমা, আর্ট, এসব বিষয়েও প্রচুর বই আছে। বোঝা গেল যে জগদিন্দ্রনারায়ণের অনেক বিষয়েই রুচি ছিল। প্রফেসর মুখার্জি মুগ্ধস্বরে বললেন, 'বাহ্, আগেরদিন লাইব্রেরিটা ভালো করে দেখিনি। এখন তো দেখছি আপনার বাবা খুব পড়ুয়া লোক ছিলেন মশাই।'

দীপনারায়ণ একটু তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'শুধু কি এই? এসব ছাড়াও বাবার কাছে কিছু রেয়ার অ্যান্টিক বই আছে। দেখবেন নাকি?'

প্রফেসর মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'রেয়ার অ্যান্টিক বই বলতে?'

'যেমন ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রের সই করা বঙ্গদর্শনের প্রথম সংস্করণ, তারপর ধরুন বাঁধাইকরা সংবাদ প্রভাকর, গীতাঞ্জলির প্রথম কপি রবীন্দ্রনাথের সই করা—এমন বেশ কিছু বই।' বললেন দীপনারায়ণ।

বলতে বলতে তিনি ঘরের এক কোণে রাখা একটা লোহার আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার তালা খুললে দেখা গেল ভেতরে কিছু বই খুব যত্ন করে রাখা। সেগুলো প্রফেসর মুখার্জি এত সাবধানে হাতে নিলেন যেন সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিলেন। তারপর অতিযত্নে বইগুলো উলটে পালটে দেখলেন।

মনোজ চাকলাদার একবার উঁকি মেরে বললেন, 'এগুলোর দাম প্রচুর হতে পারে, কী বলেন মামাবাবু?'

প্রফেসর অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'দেখো কালেক্টরের কাছে এগুলো অমূল্য। কিন্তু এতটাও অমূল্য নয় যার জন্য লোকজন অপহরণ, চুরি, রাহাজানি বা খুনজখম করবে।'

ঠিক এই সময়েই মনোজ চাকলাদার আলমারির নীচের র‍্যাকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওগুলো কী?'

প্রফেসর মুখার্জি আর মনুজেন্দ্র দেখলেন যে আলমারির একদম নীচের র‍্যাকে কিছু বই আছে, সেলোফেন পেপারে মোড়া। দীপনারায়ণ বললেন 'ওগুলো হচ্ছে ফিলাটেলির বই, বাবার ইন্টারেস্টের বিষয় ছিল।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'বটে? বইগুলো দেখা যায় একবার?'

দীপনারায়ণ অনুমতি দেওয়ার আগেই মনুজেন্দ্র নিচু হয়ে ততক্ষণে বইগুলো তুলে এনেছে। প্রফেসর মুখার্জি উলটে দেখলেন সবগুলোই হচ্ছে ফিলাটেলি বা স্ট্যাম্প কালেকশনের উপর বই। প্রফেসর মুখার্জি দেখতে দেখতে বললেন, 'আরিব্বাস! আপনার বাবার কাছে এ বিষয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বই আর জার্নাল প্রায় সবগুলোই আছে। আপনার বাবার তো এ বিষয়ে প্রগাঢ় আগ্রহ ছিল বলেই মনে হচ্ছে।'

দীপানারায়ণ বললেন 'হ্যাঁ, স্ট্যাম্প কালেকশন বাবার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। প্রায়ই বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেন। বিভিন্ন ফিলাটেলিক সোসাইটির সঙ্গে বাবার নিয়মিত পত্রালাপও চলত।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'আপনার বাবার স্ট্যাম্প কালেকশনটা দেখা যেতে পারে?'

দীপনারায়ণ বললেন 'সেরকম কোনো স্ট্যাম্প কালেকশন তো নেই।'

প্রফেসর মুখার্জির ভ্রু দুটো কুঁচকে গেল। উনি বললেন, 'সেকি! আপনি সত্যি জানেন?'

মাথা নাড়লেন দীপনারায়ণ, 'নাহ্, আমি কোনওদিন দেখিনি। বা বাবার মুখে উল্লেখও শুনিনি। দেখুন আমার ছেলে ফিরে এসেছে, আমি এতেই খুশি। এবার এই তদন্ত আপনাদের মতো যেমন করতে হয় করুন। আমরা এর বেশি কিছু চাই না।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন 'তথাস্তু। এই বইগুলো একটু নিয়ে যেতে পারি? পরে ফেরত দিয়ে যাবো যথাসময়ে।'

দীপনারায়ণ সাগ্রহে বললেন, 'নিয়ে যান না! কোনো অসুবিধা নেই।'

তিনজনে বেরিয়ে আসছেন। এমন সময় দীপনারায়ণের স্ত্রী এসে বললেন, 'আপনারা একটু এদিকে আসবেন? ব্রতীন আপনাদের কিছু বলতে চাইছে।'

'তিনজনেই ব্রতীনের ঘরে ঢুকলেন। ব্রতীন খুব মৃদুস্বরে বলল, 'একটা কথা আপনাদের বলা উচিত। আমার এই মুহূর্তে মনে পড়লো। সাধুবাবার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় দুটো জিনিস খুব খটকা লেগেছিল। এক, সাধুবাবার হাতে একটা দামি ঘড়ি ছিল, যেটা খুব বেমানান। দুই, যখন সাধুবাবা তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে, আমার যেন মুহূর্তের জন্য মনে হল আমি লোকটাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি।'

প্রফেসর মুখার্জি কথাটা শুনে কিছু ভাবলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম নাও। পরে আবার তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

* * *

গাড়িতে উঠে মনোজ চাকলাদার বললেন, 'আপাতত কিং কর্তব্যম মামাবাবু?'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'চালাও পানসি পার্ক সার্কাস। আজ সকাল থেকেই মনটা বিরিয়ানি বিরিয়ানি করছে এডিজি সাহেব।'

মনুজেন্দ্র ব্যাজার মুখে বলল, 'মোটেও না। আপনি ওই ব্রতীনের বিরিয়ানির বায়না শুনে উতলা হয়ে পড়েছেন।'

প্রফেসর মুখার্জি মুচকি হাসলেন। কিছু বললেন না। মনোজ চাকলাদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এডিজি সাহেব, দীপনারায়ণ তো তদন্ত বন্ধ করতে বলছেন। তাহলে আমরা কি এই নিয়ে আর এগোব?'

'পুলিশি তদন্ত ওভাবে বন্ধ করা যায় না মামাবাবু। কেস ফাইল একবার যখন ওপেন হয়েছে তদন্ত আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে।'

'ভেরি গুড। আচ্ছা, কলকাতা শহরে স্ট্যাম্প কালেকশন করেন এমন কাউকে চেনো?'

'আজকাল ইমেইল এর জমানায় তো এসব শখ উঠেই গেছে। তবে একজনকে

চিনি, কলকাতা ফিলাটেলি সোসাইটির সভাপতি ছিলেন এককালে। নাম চতুরানন পট্টনায়ক। ঢাকুরিয়ার দিকে বাড়ি। যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। পট্টনায়ক বাবুকে একবার ফোন করে বলো যে বিকেলের দিকে আমরা আসছি। আর মনু, একটা কাজ করো তো। যে রাস্তায় অপহরণটা হয়েছে সেখানে একবার চলো তো দেখি। অকুস্থলটা দেখে আসা প্রয়োজন।

* * *

জায়গাটা একটা ছোট গলি মতন। দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিট থেকে আনন্দ নিয়োগী লেন যাওয়ার পথে পড়ে। রাস্তার একদিকে অন্য একটা বাড়ির পেছনদিকের দেওয়াল, অন্য দিকে একটা পরিত্যক্ত পার্কের ভাঙা রেলিং। এই দুপুরবেলাতেও বেশি লোক নেই। বোঝা গেল যে অপহরণকারীরা বেশ খবরাখবর নিয়ে আটঘাট বেঁধেই এসেছিল।

রাস্তায় কোথাও কোনও সিসিটিভি থাকার সম্ভাবনা নেই। এমনকি রাস্তার দুই প্রান্তেও এমন কোনও বড় মোড় নেই যেখানে সিসিটিভি থাকতে পারে। তিনজনেই পুরো রাস্তাটা দু-একবার চক্কর মারলেন। তারপর আনন্দ নিয়োগী লেন ধরে এপাশ ওপাশ কিছুক্ষণ হাঁটলেন।

মনুজেন্দ্র বলল, 'আমরা প্রথম দিনেই একপ্রস্থ তদন্ত করে গেছি স্যার। কেউই এই গলির মধ্যে কোনও গাড়ি ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি। আর এই দুদিকের দুটো রাস্তাতেই এত গাড়ি চলাচল করে যে কোথায় কোন গাড়ি ঢুকছে, বেরোচ্ছে কারো পক্ষেই অত মনে রাখা সম্ভব না।'

প্রফেসর মুখার্জি নাকের মধ্যে দিয়ে শব্দ করলেন। তারপর গলিটা পেরিয়ে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগলেন।

একটু এগিয়েই একটা খাবার দোকান। তার সামনে বেশ ভিড়। তবে তাদের মধ্যে কাস্টমার কম, ক্যামেরা হাতে তরুণ তরুণীরাই সংখ্যায় বেশি। প্রফেসর মুখার্জি কৌতূহলী হলেন। এত ছেলেমেয়ে ক্যামেরা হাতে কী করছে ওখানে?

গিয়ে দেখলেন একটা পাইস হোটেল। তার সামনে বিভিন্ন ছেলেমেয়েরা হোটেলের বিভিন্ন ডিশ হাতে ক্যামেরার সামনে খাবারের গুণাগুণ বর্ণনা করছে। কেউ বলছে, 'এই দেখুন পতিতপাবন ভোজনালয়ের বিখ্যাত বেগুন বাসন্তী। দেখলেই মনে হচ্ছে মর্ত্যের অমৃত।'

আরেকজন বলছে, 'এই হচ্ছে এখানকার বিখ্যাত হলুদ পোলাও, দেখুন কেমন ঝরে ঝরে পড়ছে।'

ওদিকে আরেকটি মেয়ে একটা মাছের ঝোলের বাটি থেকে একটা বাটামাছ তুলে খুব উত্তেজিত স্বরে বলছে, 'এই হচ্ছে পরেশদা'র বিখ্যাত সর্ষে-পার্শে। খেলেই এক অদ্ভুত অনুভূতি...'

প্রফেসর মুখার্জি একটু ঘাবড়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কী হচ্ছে মনু?'

মনুজেন্দ্র হেসে বলল, 'একে বলে ফুড ব্লগিং। এরা সব নামী ফুড ব্লগার।

এরা বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, হোটেল এসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে খাবারের বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ করে। আপনি এমন খাইয়ে মানুষ, আপনি ফেসবুক বা ইউটিউবে ফুড ব্লগিং দেখেননি?'

ইতিমধ্যে মনুজেন্দ্রর পুলিশের উর্দি দেখে দোকানদার হাতজোড় করে বেরিয়ে এসেছে। বলল, 'স্যারেরা কিছু খাবেন?'

মনুজেন্দ্র বলল, 'না, না। এখানে এত ভিড় দেখে ভাবলাম কী হচ্ছে একটু দেখে আসি।'

দোকানদার বলল, 'এই এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে স্যার। কথা নেই বার্তা নেই, ছেলেমেয়েরা এসে ভিডিও তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কী জ্বালায় যে পড়েছি স্যার?'

মনুজেন্দ্র হেসে বলল, 'সে তো ভালোই। বিনাপয়সায় আপনার দোকানের প্রচার হচ্ছে।'

দোকানদার ব্যাজার মুখে বলল, 'তা হচ্ছে বটে। তবে একেকদিন এরা বড় উৎপাত করে, এদের ঠেলায় দোকানে কাস্টমারই ঢুকতে পারে না।'

প্রফেসর মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা রোজ আসে?'

'রোজ না এলেও, প্রায়ই।'

'আজ থেকে চারদিন আগে কে বা কারা এসেছিল বলতে পারবেন?'

'এত ছেলেমেয়েরা আসে, সবার নামধাম চেহারা ছবি তো আর মনে থাকে না স্যার। তবে যেদিনকার কথা বলছিলেন, সেদিন ওরা এসেছিল স্যার।' বলে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের দিকে দেখলেন, 'আজ আবার এসেছে, সেদিন নাকি আলুচচ্চড়ি আর পাঁপড়ভাজার ভিডিও তুলতে ভুলে গেসল।'

মনুজেন্দ্র হেসে ফেলল। মনোজ চাকলাদার ইশারায় ছেলে মেয়ে দুটিকে ডাকলেন। তাদের বোধহয় আসার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পুলিশের উর্দির ডাক অমোঘ। তারা এগিয়ে আসতে মনোজ চাকলাদার একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নাম কী?'

হাসি দেখে ছেলেমেয়ে দুটি বোধহয় ভরসা পেল। মেয়েটি বলল, 'আমার নাম তৃণান্তিকা, ওর নাম স্বালিম্পন।'

নাম শুনে তিনজনে একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর প্রফেসর মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ থেকে দিন চারেক আগে তোমরা এখানে এই ব্লগিং না কী বলে, সেইটা করতে এসেছিলে?'

দুজনেই ঘাড় নাড়ল।

'কখন এসেছিলে?'

মেয়েটি বলল, 'এই তো বিকেলের দিকে। সেদিন মাত্র ছ'টা আইটেম নিয়ে ভিডিও করতে পেরেছিলাম। তারপর লাইট কমে এসেছিল বলে শুটিং বন্ধ করে দিই। আমাদের মাইকটাও আবার....'

প্রফেসর মুখার্জি মেয়েটিকে বললেন, 'কোথায় দাঁড়িয়ে শুটিং করছিলে?'

মেয়েটি যে জায়গাটা দেখাল, সেখান থেকে ওই গলির মুখটা স্পষ্ট দেখা

যায়। এতক্ষণে মনুজেন্দ্র সজাগ হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'ভিডিওটা কোথায়?'

ছেলেটি বলল, 'আমাদের কাছেই আছে। এখনও ইউটিউবে ছাড়িনি। আসলে এডিটিং হয়নি তো। আমাদের এডিটর ত্বিষাম্পতির শরীরটা খারাপ। কাল এডিটিং এ বসবে। কাল এডিটিং হলেই...'

মনুজেন্দ্র কঠিনস্বরে বলল, 'ভিডিওটা কোথাও পোস্ট করা হবে না। আজ বিকেলের মধ্যে একটা পেন ড্রাইভে ভিডিওটা রেডি রাখবে। বাড়ির ঠিকানা বলো, আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।'

ছেলেমেয়ে দুটো শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিল একবার। তারপর মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'কিন্তু কাল যদি পোস্ট না হয়, তাহলে আমাদের চ্যানেলের রিচ... '

মনুজেন্দ্র বোধহয় কড়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। প্রফেসর মুখার্জি থামিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে বললেন, 'আহা, তা কেন মা। ভিডিওটা তোমরা একদিন পরে দিও না হয়। তারপর ধরো একটা বড় কেস সলভ হলে তোমাদের আর তোমাদের চ্যানেলের নাম খবরের কাগজে আসবে। এতে তোমাদের রিচ আরও বাড়বে না?'

এতক্ষণে ছেলেমেয়ে দুটির মুখে হাসি ফুটল। ছেলেটি মনুজেন্দ্রকে বলল, 'অ্যাড্রেসটা লিখে নিন কাকু।'

কাকু শুনে মনুজেন্দ্র ছেলেটির দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর মোবাইল বার করে গম্ভীর মুখে বলল, 'বলো খোকা।'

* * *

টেবিলে খাবার আসতেই মনোজ চাকলাদারের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি প্রফেসর মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই খাবারগুলোর কথাই ব্রতীন বলছিল না মামাবাবু?'

মাটন স্টু থেকে খানিকটা গ্রেভি বিরিয়ানির প্লেটে নিতে নিতে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ এডিজি সাহেব। এইটি হচ্ছে আরসালানের যাকে বলে সিগনেচার ডিশ। আমার মতন খাদ্যরসিক হলে তুমি আগেই ধরতে পারতে।'

'কী ধরতে পারতাম?'

'যে ব্রতীনকে এই পার্ক সার্কাস অঞ্চলের আশেপাশেই কোথাও রাখা হয়েছিল। নইলে চাওয়ার পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে আরসালানের বিরিয়ানি জুটতো না ছোকরার কপালে।'

'সে তো এদের অন্যান্য ব্রাঞ্চও আছে সারা শহরে।'

'সে আছে। তবে মনে করে দেখো, ব্রতীন আরও বলেছিল, সে ঘন ঘন মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের আওয়াজ আর ট্রেনের হুইসিল শুনতে পেয়েছে। তিনটে এক করলে পার্ক সার্কাসের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তাই না? এক কাজ করো তো মনু। তুমি তোমার টিমকে লাগিয়ে দাও জানতে এই অঞ্চলে রিসেন্টলি কেউ একটা টু বি এচ কে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে কী না।'

'সে তো খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা হয়ে যাবে স্যার। এতবড় এরিয়া।'

'আহা, তা কেন। একটা যুক্তিসঙ্গত ক্যালকুলেশন শোনো।

ব্রতীন বলেছে যে সে বিরিয়ানি খেতে চাইবার কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে বিরিয়ানি পেয়ে গেছে। পঁচিশ মিনিটই না হয় ধরলাম। এবার মনে করো যে কিনতে এসেছিল, তার কাছে নির্দেশ পৌঁছতে পাঁচ মিনিট মতো গেছে। লোকটা নিশ্চয়ই হেঁটে এসেছে, এইটুকু রাস্তার জন্য কেউ রিকশা, বাস বা অটো করে না আর অস্থায়ী বাসায় কেউ সাইকেল বা বাইক রাখে না। খাবার প্যাক হতে আরও পাঁচ মিনিট ধরলাম। তার মানে তার হেঁটে আসতে আর ফিরে যেতে টোটাল পনেরো মিনিট মতো লেগেছে। অর্থাৎ তুমি এই পার্ক সার্কাস ক্রসিংকে সেন্টার করে যদি একটা সার্কেল আঁকো, যার পেরিমিটার এর যে কোনও বিন্দুতে সাধারণ গতিতে হেঁটে যেতে ওই সাত থেকে আট মিনিট লাগে। এবার সেই সার্কেলের মধ্যে খোঁজখবর করাটা কি খুব কঠিন কাজ?'

মনুজেন্দ্র ব্যাজার মুখে বলল, 'একটু কম কঠিন হলেও, কঠিন কাজ।'

প্রফেসর মুখার্জি দ্রুত বিরিয়ানি গলাধঃকরণ করতে করতে বললেন, 'আহা, কম কঠিন কাজটাই ঝট করে নামিয়ে ফেলো দিকি। আর এডিজি সাহেব, একটা কাজ করো, প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে যেখানে যেখানে যা যা সিসিটিভি-র ফুটেজ আছে জোগাড় করে ফেলো। সন্ধেবেলা চাই।'

মনোজ চাকলাদার বললেন, 'সে আপনাকে বলতে হবে না। আমি অলরেডি সে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কি কোনও লাভ হবে মামাবাবু? যারা এত সতর্ক, তারা কি আর গাড়িতে আসল নাম্বার প্লেট লাগিয়ে এই কাজ করবে? ইন ফ্যাক্ট ওই ফুড ব্লগার বাচ্চাদুটোর কাছ থেকে ভিডিও পেয়েও খুব বেশি কিছু উদ্ধার হবে বলে মনে হয় না।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'কথাটায় যুক্তি আছে বটে। তবে শাস্ত্রে একটা যেখানে পাইবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই গোছের প্রবচন আছে না? দেখা যাক না কিছু পাওয়া যায় কী না। আর বলছি যে ওই চতুরানন বাবুকে ফোন করে একবার আজকের মিটিংটা আরেকবার কনফার্ম করে নাও না।'

এডিজি সাহেবকে আর ফোন করতে হল না, পট্টনায়ক মশাই নিজেই ফোন করে বললেন চলে আসতে। তিনি নাকি 'ইগারলি ওয়েটিং।'

* * *

'আজকাল তো এসব শখ উঠেই গেছে,' খেদের সুরে বললেন চতুরানন পট্টনায়ক, 'অথচ আমাদের ছোটবেলায় স্ট্যাম্প কালেকশন নিয়ে কী বিপুল উৎসাহ ছিল। কার কাছে কত স্ট্যাম্প আছে, কে কোথায় কোন পুরোনো দলিল দস্তাবেজ থেকে রেয়ার স্ট্যাম্প পেয়েছে, এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে খবরাখবর চালাচালি, কী দিন ছিল। কেউ দৈবাৎ কোনও একটা দুর্লভ বা বিদেশি স্ট্যাম্প পেয়ে গেলে দল বেঁধে দেখতে যাওয়া, এক্সট্রা স্ট্যাম্প অদলবদল করে নেওয়া, সবই ছিল।'

প্রফেসর মুখার্জি মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের সময় এমন অনেক হবিই ছিল যা আজকাল আর নেই। কালের নিয়মে কত কিছুই যে হারিয়ে যায়। যাক, যে জন্য এসেছি সেটা বলি। কথাটা হচ্ছে যে একটা অদ্ভুত কেস আমাদের হাতে এসেছে। এক ভদ্রলোকের প্রাইভেট কালেকশন থেকে ফিলাটেলি নিয়ে বেশ কিছু বই বা জার্নাল আমাদের হাতে এসেছে। একটু দেখে জানাবেন, এগুলো কীরকম ইম্পর্ট্যান্ট?'

মনুজেন্দ্র বই আর জার্নালগুলো টেবিলে রাখলো। পট্টনায়ক সাহেব সেগুলো দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ! এ তো দুর্দান্ত কালেকশন মশাই। এই জিনিস কলকাতা শহরে গুটিকয় লোক ছাড়া কারও কাছে থাকার কথাই নয়। পেলেন কোথা থেকে?'

প্রফেসর মুখার্জি কথাটার সরাসরি উত্তর দিলেন না। বললেন, 'জগদিন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি বলে কোনও স্ট্যাম্প কালেকটর কখনও আপনাদের সোসাইটির সদস্য ছিলেন?'

'দাঁড়ান, একবার সোসাইটির মেম্বার লিস্টটা দেখে নিই। সোসাইটি তো প্রায় উঠেই গেছে। যা রয়ে গেছে শুধু কাগজপত্তর।' বলতে বলতে উঠে গেলেন অশীতিপর মানুষটি। ফিরলেন একটু পর একটা জাবদা খাতা নিয়ে, 'কী নাম বললেন? জগদিন্দ্রনারায়ণ?'

মিনিট দশেক খোঁজার পর খাতাটা বন্ধ করলেন চতুরানন পট্টনায়ক। 'নাহ, ওই নামে কোনও এন্ট্রি নেই। কেন বলুন তো?'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'আচ্ছা, ধরে নিন একজন কালেক্টর, যাঁর বিবিধ রেয়ার আর্টিফ্যাক্টস সংগ্রহে রুচি আছে, যিনি ফিলাটেলি নিয়েও খুব উৎসাহী। এতটাই উৎসাহী সে এই দুর্লভ বই বা জার্নালগুলো সংগ্রহ করেছেন, অথচ কোনওদিন কোনও স্ট্যাম্প কালেক্ট করেননি। এটা সম্ভব?'

শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন চতুরানন, 'দেখুন, অসম্ভব বলে তো কিছু নেই। তবে অস্বাভাবিক তো বটেই। বিশেষ করে আপনি যখন বলছেন যে ভদ্রলোকের বিভিন্ন শখের জিনিস সংগ্রহ করার উৎসাহ আছে। বাই দ্য ওয়ে, ইনিই কি জগদিন্দ্রনারায়ণ যিনি আমাদের সদস্য ছিলেন কি না খোঁজ করছিলেন?'

'হ্যাঁ। এবং এখানেই আমরা আটকে গেছি।'

'কেসটা কী একটু খুলে বলবেন?'

পুরো কাহিনিটা শুনে চতুরানন পট্টনায়ক বললেন, 'ইন্টারেস্টিং।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'লোকে স্ট্যাম্প কালেকশন করে কেন? শুধুই শখ? কিছু কিছু রেয়ার স্ট্যাম্পের শুনেছি কোটি কোটি টাকা দাম হয়।'

'হয়ই তো। পৃথিবীতে বেশ কিছু স্ট্যাম্প অমূল্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন ধরুন ব্রিটিশ গায়ানার ম্যাজেন্টা রঙের ওয়ান সেন্ট স্ট্যাম্প। পৃথিবীতে একটাই আছে। ২০১৪ সালের সদবি'র অকশনে প্রায় দশ লাখ ডলারে বিক্রি হয়। তারপর ধরুন ইনভার্টেড জেনি, যাতে ভুল করে বাইপ্লেনের ছবি উলটো করে ছাপা হয়েছিল। টু পেনি ব্লু, ব্রিটিশ এম্পায়ারের বাইরে ছাপা প্রথম ব্রিটিশ স্ট্যাম্প। অথবা ধরুন টু সেন্টের হাওয়াইয়ান মিশনারিজ, যার জন্য প্যারিসে গ্যাস্টন লেরু বলে একজন

ডাকটিকিট কালেক্টর খুন পর্যন্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও আরও কত কী আছে! পৃথিবীর প্রথম তিনকোণা ডাকটিকিট ট্রায়াঙ্গুলার কেপস, পৃথিবীর সবচাইতে দামি ডাকটিকিট হলুদ রঙের থ্রি শিলিং ব্যাঙ্কো, এ নিয়ে বলতে বসলে রাত ভোর হয়ে যাবে।'

'এ তো সবই বিদেশের। ভারতের কোনও ডাকটিকিট নেই যা এত দামি।'

চতুরানন পট্টনায়ক অদ্ভুত চোখ করে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর মুখার্জির দিকে। তারপর বললেন, 'আশ্চর্য! আমার কাছে সপ্তাহ খানেক আগে একটা ফোন আসে। তিনিও ঠিক এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভারতবর্ষের সবচেয়ে দামি ডাকটিকিট কী।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'আপনি কী উত্তর দিলেন?'

'ভারতের বেশ কিছু স্ট্যাম্পের দামও কিন্তু কম নয়। যেমন ধরুন দুতিয়া প্রিন্সলি স্টেটের ১৮৯৩ সালের হাফ আনার স্ট্যাম্প, ১৯২৯ সালের পঞ্চম জর্জের স্ট্যাম্প, ১৮৬৬ সালের ভায়োলেট কালারের প্রভিন্সিয়াল স্ট্যাম্প এগুলো তো আছেই।

তবে ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং দামি স্ট্যাম্প হচ্ছে সিন্ধু ডাক স্ট্যাম্প, সমগ্র এশিয়াতে চালু হওয়া প্রথম ডাকটিকিট। এর ইংরেজি বানানটাও খুব অদ্ভুত, scinde dawk.

সিন্ধু প্রদেশ বা সিন্ধ্ সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির অধীনে আসে ১৮৪২ সাল নাগাদ, স্যার চার্লস নেপিয়ারের কল্যাণে। ১৮৫০ সালে সিন্ধ্ এর প্রশাসক হন স্যার বার্টল ফ্রেয়ার। তিনি সিন্ধ্ এর রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা, করাচি বন্দরের প্রভূত উন্নতি ঘটান। এই ডাকটিকিট প্রচলনও তাঁরই হাত ধরে।

সে আমলে চিঠি সিল করার জন্য এক ধরনের বিশেষ পাতলা কাগজ বা ওয়েফার ব্যবহার করা হতো। কাগজগুলো ছিল খুব মুড়মুড়ে, একটু শুকিয়ে গেলে বা পুরোন হলেই ভেঙে যেত। সেই কাগজেই এমবস করে এই সিন্ধ ডাক ছাপানো হয়। হাফ আনা দামের এক ধরনের টিকিটই ছাপানো হয়েছিল। লাল রঙের ডাকটিকিটটি আকারে ছিল গোল। সার্কুলার ফ্রেমের ভেতর লেখা ছিল সিন্ধ ডিস্ট্রিক্ট ডাক। সেই থেকে এর নাম সিন্ধ ডাক। ফ্রেমের ভেতর তাসের হরতনের মতো গোলাকৃতি তির চিহ্নের ভেতরে লেখা EIC। তীরের নীচে লেখা ১/২ আনা। ওপরে ইংরেজিতে চার লেখা। তখনকার দিনে ব্যবসায়ীরা তাঁদের জিনিসপত্রে ৪ সংখ্যা লিখে রাখতেন, শুভ চিহ্ন বা রক্ষা কবচ হিসেবে।

এই সিন্ধ ডাক এতই ভঙ্গুর পেপারে ছাপা হয়েছিল যে এখন এগুলো অক্ষত অবস্থায় পাওয়ার চান্স প্রায় নেই বললেই চলে। আজ অবধি একটিমাত্র অব্যবহৃত সিন্ধ্ ডাক পাওয়া গেছে, ব্যবহৃত প্রায় দুচারটি। কিন্তু নিখুঁত অবস্থায় তার কোনওটাই নেই। এর পর লাল এর বদলে নীল রঙ-এর সিন্ধ্ ডাক এর প্রচলন করা হয়। তবে সারা ভারতে একই ডাকটিকিট চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ১৮৫৪ সাল নাগাদ সিন্ধ ডাক তুলে নেওয়া হয়।

গত মাসে লণ্ডনের রয়্যাল ফিলাটেলি সোসাইটি একটা দামি ডাকটিকিটের লিস্ট প্রকাশ করেছে। সেই লিস্ট অনুযায়ী ভারতীয় ডাকটিকিটের মধ্যে সবচেয়ে অমূল্য এই সিন্ধ্ ডাক। দু হাজার এগারো সালে একটি নীল সিন্ধ ডাক বিক্রি হয়

প্রায় আটাশ লাখ ডলারে। এখন বাজারে এলে তার দাম আরও উঠবে। আর লাল সিন্ধ ডাক পেলে তো কথাই নেই।'

'যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর নাম বলতে পারবেন?' প্রশ্ন করলেন মনোজ চাকলাদার। তিনজনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চতুরানন পট্টনায়ক-এর দিকে।

'নাম বলেছিলেন বি এন মুখার্জি। বাকি আর কিছু বলেননি।

তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন। মনোজ চাকলাদার বললেন, 'থ্যাঙ্কস আ লট ফর ইওর হেল্প মিস্টার পট্টনায়ক। আপাতত এইটুকুই। পরে যদি কখনও কোনও তথ্যের দরকার হয় আপনার সাহায্য পাবো তো?'

'সার্টেনলি প্রফেসর। দ্যাট গো'জ উইদাউট সেয়িং।'

* * *

গাড়িতে উঠেই মনোজ চাকলাদার মনুজেন্দ্রকে বললেন, 'মনু, ইওরোপ বা আমেরিকা থেকে গত একমাসের মধ্যে ইন্ডিয়ায় এসেছে এমন সমস্ত ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করার ব্যবস্থা করো। দেখো ব্রজনারায়ণ মুখার্জি নামের কাউকে পাও কী না।'

মনুজেন্দ্র বলল, 'ইয়েস স্যার। এখনই ব্যবস্থা করছি।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'বি এন মুখার্জি মানে ব্রজনারায়ণ মুখার্জি, বোঝা গেল। আমপাবলিক আর যাই লুকোক, পাসপোর্ট জাল করে না। করলে আন্তর্জাতিক আইনে বেশ কয়েকবছর ঘানি ঘোরানো কেউ এড়াতে পারবে না। এবার যদি জানা যায় যে মহাপ্রভু সত্যিই কলকাতায় পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তাহলে কলকাতার সমস্ত হোটেলের গত দু তিন সপ্তাহের বোর্ডার লিস্ট চেক করাও। ভদ্রলোক এতদিন বিদেশে আছেন, নিশ্চয়ই খানদানি হোটেল ছাড়া উঠবেন না।'

'আপনি শিওর স্যার? এ কাজ ব্রজনারায়ণের?'

'ব্রতীনের কথাটা মনে আছে তো? সাধুবাবাকে দেখে তার মনে হয়েছিল যেন লোকটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে। কাকাকে চোখে না দেখলেও, নিশ্চয়ই ছবি টবি দেখেছে। তাছাড়া বাপ আর কাকার মুখের আদলে মিল থাকাই খুব স্বাভাবিক।'

'তাতেই আপনি শিওর হয়ে গেলেন?'

'আরও কারণ আছে মনু। নিজের ভাইপো বলেই ব্রজনারায়ণ হয়তো ব্রতীনকে অপহরণ করেও ওর সঙ্গে অত সদয় ব্যবহার করেছিলেন। হাজার হোক, নিজের রক্ত। নিজের মুখটা দেখাতে পারেননি, ফর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রিজনস, কিন্তু তাই বলে আতিথেয়তায় কমতি রাখেননি।'

মনুজেন্দ্র বলল, 'গট ইওর পয়েন্ট স্যার।। আর কোনও আদেশ স্যার?'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'আদেশ নয় মনু। একটা রিকোয়েস্ট, ওই চুরি যাওয়া বইটা যে করেই হোক হাতে পেতে হবে। ওই বইটা যদি হাতে না পাওয়া যায় তাহলে অপূরণীয় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'কেন স্যার?'

'কারণ এতদিনে ব্রতীনের অপহরণের একটা মোটিভ পাওয়া গেল। তবে একটা খবর না পেলে সেটা কনফার্ম করতে পারছি না মনু। প্লিস গিভ মি সাম টাইম।'

সন্ধেবেলা নাগাদ মনুজেন্দ্র ফোন করল প্রফেসর মুখার্জিকে। প্রফেসর মুখার্জি তখন মন দিয়ে জগদিন্দ্রনারায়ণের বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। মোবাইল তুলে বললেন 'বলো মনু। গাড়ির খোঁজ পেয়েছ তো?'

'একদম স্যার। মারুতি সুজুকি। একই গাড়ি ওই ম্লগার ছেলেমেয়েগুলোর ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে, আর প্রিন্সেপ ঘাটের সামনের সিসিটিভিতেও।'

'নাম্বারটা নিশ্চয়ই নোট করেছ। আর মোটর ভেহিকলস দপ্তরে খোঁজ নিয়ে দেখেছ যে নাম্বার প্লেটটা ফলস, তাই তো?'

মনুজেন্দ্রর গলার উৎসাহ নিভে এলো, 'ঠিক ধরেছেন স্যার। তবে একেবারে ফলস না।'

'একেবারে ফলস না মানে? ফলস আবার মাঝামাঝি হয় নাকি?'

'ওই WB02E2486 নাম্বার প্লেটের একটা গাড়ি আছে, তবে সেটা মারুতি সুজুকি নয়, হোন্ডা বি আর ভি। মালিকের নাম বসন্ত আগরওয়াল। সল্টলেকে বাড়ি। গত একমাস ধরে আগরওয়াল সাহেব বিদেশে। গাড়ি তাঁর গ্যারেজে। লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি।'

'জানতাম। মনোজ ঠিকই ধরেছিল। একটা কথা বলো তো, নাম্বার প্লেট হলুদ না সাদা?'

'সাদা। আপনাকে ওই ছেলেমেয়েদুটোর কাছ থেকে পাওয়া ভিডিও ক্লিপ পাঠাচ্ছি স্যার। প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে লাগানো সিসিটিভি'র ফুটেজও।'

'ওই বসন্ত আগরওয়ালের গাড়ির নাম্বার প্লেটেরও ছবি পাঠাও। বাই দ্য ওয়ে, ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট থেকে কিছু খোঁজ পেলে?'

'এখনও পাইনি স্যার। আশা করছি রাতের মধ্যে পেয়ে যাব।'

একটু পরেই প্রফেসর মুখার্জির হোয়্যাটসঅ্যাপে দুটো ভিডিও এসে গেল। সেকেন্ড ভিডিওতে নাম্বার প্লেট দেখা যাচ্ছে না, ক্যামেরা রাস্তার ওপারে ছিল। প্রথম ভিডিওতে গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখা যাচ্ছে বটে, তবে আউট অফ ফোকাস। নাম্বার প্লেট ভালো করে পড়া যায় না। অনেক কষ্ট করে নাম্বার পড়তে পারলেন প্রফেসর মুখার্জি, WB02E2468।

এ ছাড়া ভিডিওতে আর দেখার বিশেষ কিছু নেই। প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে তোলা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা খিদিরপুরের দিক থেকে দ্রুত এসে থামছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই স্পিড বাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্রতীন দাঁড়িয়ে আছে ওপারে। একটু পরে সে টলতে টলতে এপারে চলে এল। একটা পথচলতি ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে উঠে পড়ল। ব্যস, এইটুকুই।

বসন্ত আগরওয়ালের গাড়ির ছবিও চলে এলো। গ্যারেজের মধ্যে তোলা ছবি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ গাড়ি বহুদিন রাস্তার মুখ দেখেনি।

মনুজেন্দ্রকে আবার ফোন করলেন তিনি, 'মনু, আর একটা কাজ দিয়েছিলাম তোমাকে।'

'পার্ক সার্কাসের কাছে ওই দু-কামরা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারটা তো? না স্যার। কোনও খোঁজ পাইনি। ওই চত্বরে গত এক মাসের মধ্যে কেউই কোনও দু'কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়নি।'

প্রফেসর মুখার্জি হতাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে তো মুশকিল হল। আচ্ছা, মিস্টার ব্রজনারায়ণ মুখার্জির পাত্তা লাগাও আগে। দেখি কী পাওয়া যায়।'

প্রফেসর মুখার্জি ব্যাজার মুখে বসে বসে ভিডিওগুলো বারবার দেখতে লাগলেন। কোথাও কোনও সূত্র নেই। ব্রতীনকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে লাভ নেই। ইন ফ্যাক্ট দীপনারায়ণ বলেই দিয়েছেন এর মধ্যে তিনি আর জড়াতে চান না। ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন, তিনি এতেই খুশি।

ভিডিওগুলো আনমনে দেখতে দেখতে প্রফেসর মুখার্জির মনে হল, একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী যেন একটা অসঙ্গতি তাঁর চোখে পড়ছে, কিন্তু মনের আয়নায় ধরা পড়ছে না। কী যেন একটা ঠিক নেই, বা হওয়া উচিত নয়। তিনি বারবার ভিডিওগুলো দেখতে লাগলেন, কিন্তু তবু অস্বস্তির কারণ বুঝতে পারলেন না।

একটু পর উঠে পড়লেন প্রফেসর মুখার্জি। খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ফের বসে পড়লেন।। কিছুতেই কিছু মাথায় আসছে না। কী ভেবে একবার চতুরানন পট্টনায়ককে ফোন করলেন।

'মিস্টার পট্টনায়ক, আমি মুখার্জি বলছি। ফ্রি আছেন? দু মিনিট কথা বলা যাবে?'

'হুকুম করুন প্রফেসর মুখার্জি। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

'ধরুন আজ যদি একটা প্রায় অক্ষত লাল রঙের সিন্ধ ডাক পাওয়া যায়, তার দাম কীরকম হতে পারে?'

'আমার অনুমান তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ ইউ এস ডলার, ইফ নট মোর।'

'আইব্বাস! সে তো অনেক টাকা মশাই!'

'সে আর বলতে।'

'এবার ধরুন দৈবাৎ ও জিনিস আমার হাতে এক পিস এসে পড়েছে, আমি ওটাকে বেচব কী করে?'

'অকশন হাউস ছাড়া উপায় নেই। কারণ এই লাইনে জানাশোনা না থাকলে সরাসরি কাউকে বেচতে গিয়ে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'কলকাতায় কোন অকশন হাউস ডাকটিকিটের অকশন করে, জানেন কিছু?'

'দু একটা আছে বটে, তবে তাদের এই জিনিস অকশন করার অওকাত নেই। এর সঠিক মূল্য পেতে সদবির মতো নামী অকশন হাউস ছাড়া গতি নেই। তবে এখানে একটা কথা আছে। এই অকশন হাউস ছাড়াও এসব জিনিসপত্র কেনাবেচার আরেকটা সেলস চ্যানেল খুলেছে রিসেন্টলি।'

'কী?'

'ডার্ক ওয়েব।'

* * *

পরেরদিন সকালে প্রফেসর মুখার্জির ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হল। আজ তাঁর যা যা ক্লাস নেওয়ার আছে সে সবই সেকেন্ড হাফ-এ। তাই একটু লিবার্টি নেওয়াই যায়।

ঘুম থেকে উঠে প্রফেসর মুখার্জি আড়মোড়া ভাঙলেন বেশ সময় নিয়ে। ভাবলেন গিন্নিকে চায়ের কথাটা বললে খ্যাঁকখ্যাঁকানি শুনতে হবে কি হবে না। তারপর চোখ টোখ কচলে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলেন মনুজেন্দ্রর ফোন থেকে এগারোটা মিসড কল, মনোজ চাকলাদারের ফোন থেকে সাতটা।

প্রফেসর মুখার্জি বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নামলেন। গিন্নিকে চেঁচিয়ে বললেন, 'বড় কাপের এক কাপ চা গিন্নি। খুব আর্জেন্ট কাজ এসে পড়েছে।' বলেই বাথরুমে ঢুকে পড়লেন।

আধঘন্টা পর স্নান-টান করে গোপালধারা টি এস্টেটের সেকেন্ড ফ্লাশ লিকার চা খেতে খেতে প্রফেসর মুখার্জি প্রথম ফোনটা করলেন মনুজেন্দ্রকে, 'গুড মর্নিং মনু। ব্রজনারায়ণ মুখার্জির খোঁজ পেয়েছ তাহলে? কোন হোটেলে উঠেছেন?'

মনুজেন্দ্র উত্তেজিতস্বরে যা বলে গেল তা এরকম।

ব্রজনারায়ণ মুখার্জি আজ থেকে ঠিক দশদিন আগে ইউ কে থেকে দিল্লি আসেন। ওই দিনই সন্ধের ফ্লাইট ধরে কলকাতা পৌঁছন। উঠেছেন হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে, পার্ক সার্কাস থেকে যার দূরত্ব পায়ে হেঁটে মাত্র মিনিট পাঁচেক। আসার উদ্দেশ্য এথিক্যাল হ্যাকিং নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখা, বিষয় ডার্ক ওয়েব।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ভদ্রলোককে শ্যাডো করা শুরু করে দিয়েছ?'

'সে আর বলতে! ইন ফ্যাক্ট ব্রজনারায়ণ মুখার্জির প্রতিটি ফোন কল এখন ট্যাপ করা হচ্ছে। পাখি এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের জালে। আপনি বললেই ক্যাচ কট কট।'

'একদম না। তোমরা যা করছ করে যাও। উনি যেন বিন্দুমাত্র টের না পান যে ওঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। কলকাতা সহ দেশের সমস্ত এয়ারপোর্ট অথরিটিকে বলে রাখো যে ওমুক পাসপোর্ট নাম্বার নিয়ে কেউ যেন দেশ ছেড়ে যেতে না পারে।'

'ইয়েস ক্যাপ্টেন।'

পরের ফোন গেল মনোজ চাকলাদারের কাছে। তিনি ফোন তুলেই বললেন, 'আপনার পেয়ারের মনুর কাছে নিশ্চয়ই সব আপডেট পেয়ে গেছেন মামাবাবু। আপাতত কী করণীয়?'

প্রফেসব মুখার্জি বললেন, 'রহু ধৈর্যং, রহু ধৈর্যং। আগে ভদ্রলোককে প্যাঁচে ফেলি। তারপর ধরাধরির প্রশ্ন। বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের ডিপার্টমেন্টে ডার্ক ওয়েব

এক্সপার্ট কেউ আছে মনোজ?'

'আছে, ফৌজিয়া খাতুন বলে একটি মেয়ে। তুখোড় সাইবার এক্সপার্ট। এথিক্যাল হ্যাকিং, ডার্ক ওয়েব, এসবে একদম টপ নচ ট্যালেন্ট। কেন বলুন তো মামাবাবু?'

'ফৌজিয়া ম্যাডামকে একটু রেডি থাকতে বলো। আমি এখুনি আসছি। তারপর মনুকে সঙ্গে নিয়ে যাব ব্রজবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মোলাকাতে। ওকে?'

সকালের জ্যাম ঠেঙিয়ে লেকটাউন থেকে ভবানীভবন পৌঁছতে কিঞ্চিত দেরি হল প্রফেসর মুখার্জির। মনোজ চাকলাদার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রফেসর মুখার্জি পৌঁছতেই তিনি এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ফৌজিয়া খাতুনকে এত্তেলা দিলেন।

ফৌজিয়া ম্যাডামের বয়েস বেশি না। ছোটখাটো চেহারার মিষ্টি দেখতে। চোখে চশমা আর দুটো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

প্রফেসর মুখার্জি হাই-হ্যালো করার পর সোজা কাজের কথায় চলে এলেন, 'ম্যাডাম, ডার্ক ওয়েব জায়গাটা কী একটু বোঝাও তো।'

ফৌজিয়া বোঝাতে থাকে। ডার্ক ওয়েব হল ইন্টারনেটের একটি এনক্রিপ্ট করা অংশ যা সাধারণ ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে খোঁজা যায় না। আমরা ইন্টারনেটে যা দেখি সব সারফেস ওয়েব। এই বিপুল সারফেস ওয়েব সমুদ্রের নীচে আছে ডিপ ওয়েব। তারও অন্ধকার অংশ হচ্ছে ডার্ক ওয়েব।

ডার্ক ওয়েব হল ডিপ ওয়েবের একটি ছোট, কম অ্যাক্সেসযোগ্য অংশ। দুটোর মধ্যে একটিই মিল রয়েছে: সার্চ ইঞ্জিনের ফলাফলে কোনটিই পাওয়া যাবে না। আর এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল কিভাবে তাদের অ্যাক্সেস করা হয়। ইউআরএল জানে এমন স্ট্যান্ডার্ড ওয়েব ব্রাউজার সহ যে কেউ ডিপ ওয়েব অ্যাক্সেস করতে পারে। কিন্তু ডার্ক ওয়েব পেজ অ্যাক্সেস করার জন্য অনিয়ন রাউটার, টর নামের বিশেষ ব্রাউজার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

ডার্ক ওয়েব মূলত সাইবার অপরাধীদের অভয়ারণ্য। যাবতীয় বেনামী, বেআইনি সাইবার কার্যকলাপের জায়গা হচ্ছে ডার্ক ওয়েব। এই ইজি অ্যাক্সেসের অসুবিধা, নির্দিষ্ট ওয়েবপেজের অ্যাড্রেস না জানলে তাকে খুঁজে না পাওয়া এসব কারণে প্রচুর বেআইনি লেনদেন এখন ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে হয়। যেমন মাদক পাচার, হিউম্যান ট্রাফিকিং, অস্ত্রের লেনদেন, ব্ল্যাক মানি লেনদেন, নিষিদ্ধ বা চোরাই সম্পদ বিক্রি ইত্যাদি।

প্রফেসর মুখার্জি বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। তারপর বললেন, 'এই ডার্ক ওয়েবে আর কী কী কেনাকাটি করা যায় বলো তো?'

ফৌজিয়া হেসে ফেলল, 'স্যার, এ হচ্ছে বেআইনি লেনদেনের সুপারমার্কেট। পাওয়া যায় না হেন জিনিস নেই। যেমন ধরুন চুরি করা ক্রেডিট কার্ড নম্বর, ব্যক্তিগত তথ্য, চাইল্ড পর্নোগ্রাফি, ফেক কারেন্সি নোট, র‍্যামনসমওয়্যার বা ফিশিং স্ক্যামের মতো সাইবার অপরাধের সফ্টওয়্যার, কী নেই!'

'হুম। একটা কথা বলো তো মা। কেউ ধরো একটা চোরাই চিঠি, বা একটা রেয়ার ডাকটিকিট, বা দুষ্প্রাপ্য বই ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে বিক্রি করতে চাইছে। তুমি

তাকে ট্রেস করতে পারবে?'

'খুব শক্ত কাজ স্যার, তবে চেষ্টা করতে পারি। কিছু ডিটেইলস লাগবে।'

'সে তুমি মনোজের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। কাজটা একটু আর্জেন্ট, বুঝলে।'

ফৌজিয়া চলে যেতে প্রফেসর মুখার্জি মনুজেন্দ্রর দিকে ফিরলেন, 'চলো হে মনু। মিস্টার বি এন মুখার্জির সঙ্গে একবার মোলাকাত করে আসা যাক। দেখি, ভালো কথায় নিজে নিজে স্বীকার করেন কী না।'

* * *

ব্রজনারায়ণ মুখার্জি যাকে বলে তাঁর দাদার একেবারে কার্বন কপি। শুধু বয়েসটা অনেক কম, আর বহুদিন দেশের বাইরে আছেন বলে রঙটা খোলতাই হয়েছে।

ব্রজনারায়ণ তাঁর হোটেল রুমেই ছিলেন। একজন প্রফেসর আর পুলিশ অফিসার দেখা করতে আসছে শুনে অবাক হয়েছিলেন বটে। তবে আসতে বাধা দেননি।

দুজনে ঢুকে দেখলেন ব্রজনারায়ণ একেবারে স্যুট বুট পরে তৈরি। বোধহয় কোথাও যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিলেন। তিনি দুজনকে আপ্যায়ন করে বললেন, 'ইয়েস জেন্টলম্যান, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

প্রফেসর মুখার্জি একটা মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, 'আসলে একটা সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে আসা। আপনার একটু হেল্প লাগবে।'

ব্রজনারায়ণ আশ্চর্য হলেও তাঁর মুখেচোখে সেই ভাব প্রকাশ পেল না। গম্ভীরমুখে বললেন, 'বলুন।'

প্রফেসর মুখার্জি প্রথমেই কাজের কথায় গেলেন না। নানা কথার মধ্য দিয়ে ব্রজনারায়ণের ঠিকুজি কুলুজি বের করার চেষ্টা করলেন। মনুজেন্দ্র এইবার বুঝল প্রফেসর মুখার্জির সেলসের অভিজ্ঞতার দাম।

ব্রজনারায়ণের কথায় জানা গেল তিনি প্রায় বিশ বছরের ওপর লণ্ডনে আছেন। ওখানে একটি বিশ্ববিখ্যাত কনসালটেন্সি কম্পানির সাইবার সিকিউরিটি বিভাগের প্রধান। তাঁর প্রধান রিসার্চ এরিয়া ডার্ক ওয়েব।

তিনি কী করে লণ্ডনে পৌঁছলেন সে কথা খোলসা করে বললেন না ব্রজনারায়ণ। অল্প করে হলেও ফ্যামিলি ট্রাবলের কথা ছুঁয়ে গেলেন। বোঝা গেল ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে তিনি অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী নন। এও জানালেন যে আপাতত তিনি ব্রিটিশ নাগরিক, এদেশে ফিরে আসার কোনও ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, কাজের সূত্রে ভারতে বহুবার এসেছেন, কলকাতাতেও। কিন্তু পৈতৃক বাড়িতে একবারও পা রাখেননি। নাহ্, নিজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না, রাখতেও চান না।

ডার্ক ওয়েব নিয়ে কথা উঠল। প্রফেসর মুখার্জি জানালেন যে তাঁরা জানতে পেরেছেন ব্রজনারায়ণ মুখার্জির মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাইবার ক্রাইম

বিশেষজ্ঞ কলকাতায় এসেছেন। কলকাতা পুলিশ বর্তমানে একটা ডার্ক ওয়েব সংক্রান্ত বিষয়ে একটা জটিল কেস আছে। তাই তাঁরা ব্রজনারায়ণের সাহায্য নিতে এসেছেন।

ব্রজনারায়ণের মুখ দেখে বোঝা গেল কথাটা শুনে ভারি খুশি হয়েছেন তিনি। হেসে বললেন, 'সার্টেনলি। বলুন না কী হেল্প চান?'

'ধরুন একটা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্প, মানে ডাকটিকিট, কারো হাতে এসে পড়েছে। তার দাম অকশানে গেলে কম করে হলেও কোটির ব্যাপার হবেই। বুঝতেই পারছেন এমন দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্পের জন্য খুন জখম অপহরণ সবই হতে পারে। এবার এরকম যদি একটা ডাকটিকিট কেউ ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তাকে কী করতে হবে?'

মনুজেন্দ্র আর প্রফেসর মুখার্জি আশা করছিলেন প্রশ্নটা শুনেই ব্রজনারায়ণ চমকে উঠবেন। কিন্তু না, তিনি তার ধারকাছ দিয়ে গেলেন না। বরং বিশদে ডার্ক ওয়েব কী, এবং তার কাজকর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

প্রফেসর মুখার্জি তীক্ষ্ণচোখে ব্রজনারায়ণের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ লক্ষ্য করছিলেন। নাহ, কোথাও কোনও ভয় বা অস্বস্তির চিহ্ন নেই। বরং বেশ উৎসাহের সঙ্গে তিনি ডার্ক ওয়েব বোঝাতে লাগলেন।

মনুজেন্দ্র উশখুশ করতে লাগল। ব্রজনারায়ণের কথা শেষ হতেই সে ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, আপনি কখনও ওয়ান পেনি ব্রিটিশ গায়ানা, ইনভার্টেড জেনি, টু পেনি ব্লু, হাওয়াইয়ান মিশনারিজ, থ্রি শিলিং ব্যাঙ্কো, এই শব্দগুলো শুনেছেন?'

ব্রজনারায়ণ ভারি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'না তো! এগুলো কী?'

প্রফেসর মুখার্জি উঠে পড়লেন, 'থ্যাঙ্কস আ লট মিস্টার মুখার্জি। আপনার ফোন নম্বরটা পেতে পারি? মানে আবার যদি দরকার হয়।'

'বেশ তো, আমার ইউ কে'র নাম্বারটাই নিন। কল করতে হলে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে নেবেন।'

যদিও ব্রজনারায়ণের ফোন নাম্বার থেকে শুরু করে মায় পাসপোর্ট নাম্বার অবধি এখন সি আই ডি-র কাছে, তা সত্ত্বেও প্রফেসর মুখার্জি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ফোন নাম্বারটা মোবাইলে সেভ করলেন। তারপর হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'তাহলে আসি মিস্টার মুখার্জি?'

ব্রজনারায়ণ বললেন, 'চলুন, আমিও বেরোব। একবার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে যেতে হবে।'

তিনজনে নীচে নামলেন। ব্রজনারায়ণের জন্য একটা ভাড়া করা ইনোভা পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রজনারায়ণ মুখার্জি একবার হ্যান্ডশেক করে গাড়িতে উঠতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

মনুজেন্দ্র হতাশ সুরে বলল, 'অতঃকিম স্যার? ইনি তো মনে হয় না জড়িত বলে। এতদিন পুলিশের চাকরি করছি, অপরাধীদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো কম স্টাডি করিনি। আর ইনি যদি অ্যাক্টিং করেন তাহলে বলতে হবে ভূভারত কেন, সারা দুনিয়ার এমন অভিনেতা জন্মায়নি। হলিউডে নামলে অস্কার বাঁধা।'

প্রফেসর মুখার্জি অন্যমনস্ক ভাবে ইনোভার দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ সচকিত হয়ে বললেন, 'গাড়িটার নাম্বার কত দেখলে মনু?'

'WB 25AF 4444। কেন বলুন তো? এ তো ভাড়া নেওয়া গাড়ি...।'

প্রফেসর মুখার্জি ওসব শুনছিলেন না। তিনি অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোবাইলটা বার করে মনুর পাঠানো ভিডিওদুটো দেখতে লাগলেন। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'মাই গুডনেস। এত বড় অ্যানোম্যালিটা আমার নজর এড়িয়ে গেল কী করে?'

মনুজেন্দ্র একটু হকচকিয়ে গেছিল। সে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে স্যার?'

প্রফেসর মুখার্জি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'ভেরোনিকার সঙ্গে যেদিন লাস্ট দেখা হয়, ও নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেছিল। গাড়ির মডেল মনে আছে?'

'ইয়েস স্যার। মারুতি সুজুকি।'

'ওকে এখুনি ফোন করো। খোঁজ নাও ও কোথায় আছে এখন?'

মনুজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মোবাইল বার করে ভেরোনিকাকে ফোন করল। কিছুক্ষণ পর ফোন বন্ধ করে চাপা উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ও এখন এয়ারপোর্টের পথে, দিল্লি যাচ্ছে কী একটা কাজে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এক্ষুনি এয়ারপোর্টের সিকিউরিটিকে অ্যালার্ট করো। ওকে যেন কিছুতেই এয়ারপোর্টে ঢুকতে দেওয়া না হয়। আর দীপনারায়ণকে ফোন করো। জিগ্যেস করো, ব্রতীন কেমন আছে, কী করছে?'

মনুজেন্দ্র এতদিনে প্রফেসর মুখার্জির কাজের পদ্ধতি শিখে গেছে। সে কোনও প্রশ্ন করল না, ফোন করল দীপনারায়ণকে। প্রশ্ন করল, ব্রতীন কোথায়। ওপার থেকে কিছু একটা শুনে বলল, 'ছেলেকে এক্ষুনি ফিরে আসতে বলুন। আমাদের কথা বলবেন না। বাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট বা ওই গোছের কিছু একটা অজুহাত দেবেন। দিস ইজ ভেরি ভেরি আর্জেন্ট।'

ফোন রেখে বলল, 'ব্রতীন সকালে কিছু জামাকাপড় আর ওর ল্যাপটপের ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বলে গেছে কয়েকদিনের জন্য কোন বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে।'

'আমি হলফ করে বলতে পারি যে গাড়িটা ভেরোনিকাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে, তার মধ্যে শ্রীমান ব্রতীনচন্দর বসে আছেন। ওদের ধরতে হবে, যে করেই হোক।'

মনুজেন্দ্র বোধহয় এটাই আন্দাজ করেছিল। সে বিশেষ চমকাল না। ফোন তুলে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট আর এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কয়েকজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন 'মনু, গাড়ি ঘোরাও। চতুরানন পট্টনায়ককে তুলে বাগবাজার যাব।' তারপর পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে ফোন করলেন মনোজ চাকলাদারকে, 'এডিজি সাহেব, একটা কাজ করতে হবে। তুমি ছাড়া কেউ পারবে না। আমি তোমাকে ব্রজনারায়ণ মুখার্জির ফোন নাম্বার দিচ্ছি। উনি খুব সম্ভবত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে আছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে একবার দেখা করো। আর ওখান থেকে ভদ্রলোককে তুলে আনার ব্যবস্থা করো। না না, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দরকার

নেই। ওঁকে বলো উনি যেন ওঁর পৈতৃক ভিটেয় একবার পায়ের ধুলো দেন। আখেরে ওঁর লাভই হবে। জোরাজোরি করলে চলবে না, হাজার হোক ব্রিটিশ নাগরিক। তাছাড়া তুমি দীপনারায়ণের বাল্যবন্ধু, ব্রজনারায়ণকে ছোটবেলায় দেখেছ। তাই তোমাকেই কাজটা করতে হবে। আর ফৌজিয়া ম্যাডামকে বলো তো একবার আমাকে কল করতে।'

মনোজ চাকলাদার বললেন, 'ফৌজিয়া আমার সামনেই বসে আছে। নিন, কথা বলুন।'

ফৌজিয়া ফোন তুলেই বলল, 'পিওর লাক স্যার, পিওর লাক। যা কাজ দিয়ে গেছিলেন সেসব খুঁজে পেতে জান বেরিয়ে যায়। কিন্তু কী বলব স্যার...'

প্রফেসর মুখার্জি অধৈর্যস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। কী পেয়েছ সেটা বলো।'

'একটা অ্যাক্টিভিটি ট্রেস করতে পেরেছি স্যার। একটি অত্যন্ত রেয়ার এবং দামি ডাকটিকিট বিক্রির কথাবার্তা চলছে। সেলার কলকাতার, বায়ার...'

'দিল্লির। জানি। সেলারের আই পি অ্যাড্রেস জানা গেছে?'

'ইয়েস স্যার।' তৃপ্তির হাসি হাসে ফৌজিয়া, 'দে মে বি গুড, বাট আই অ্যাম বেটার।'

'চমৎকার। একটা কাজ করো তো বাপু। তুমি তোমার ফাইন্ডিংগুলো একজায়গায় নোট করে এডিজি সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো। উনি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি হয়ে, বাগবাজার আসবেন। তোমার হেল্প দরকার হবে।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ রইলেন। গাড়ি তখন বালিগঞ্জ পেরিয়ে গড়িয়াহাটের কাছে। মনুজেন্দ্র বলল, 'কেসটা কী ঘটছে একটু জানা যাবে?'

প্রফেসর মুখার্জি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমাদেরই ভুল মনু। ব্রতীন নিজেও যে একজন সাইবার এক্সপার্ট সেটা ভুলে গেছিলাম। ছেলেমেয়ে দুটো পাক্কা নিখুঁত প্ল্যান করেছিল। ধরা পড়ে গেল শুধু একটা জায়গায়।'

'কোন জায়গা স্যার?'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'আর তো কয়েকটা ঘণ্টা। একটু ধৈর্য ধরে বোসো না বাপু।' বলে তিনি মোবাইল বার করে চতুরানন পট্টনায়ককে একটা ফোন করলেন, 'পট্টনায়কবাবু, নমস্কার, চিন্তাহরণ মুখার্জি বলছি। ঝটপট রেডি হয়ে নিন, আমাদের সঙ্গে একটু বেরোতে হবে। না, না, বেশিদূর না, বাগবাজার যাব। অনেক সাহায্য করেছেন। তাই আপনাকে এমন একটা জিনিস দেখাবো যেটা দেখে আপনার জীবন সার্থক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাই ওয়ার্ড অফ অনার।'

* * *

চতুরানন পট্টনায়ক বৃদ্ধ হলে কী হবে, এই বয়সেও বেশ শক্তপোক্ত। রেডি হয়েই বসেছিলেন। গাড়িতে উঠে বললেন, 'প্রফেসর সাহেব, যা বলেছেন যদি ফুলফিল করতে পারেন, আজকের ডিনার আমার তরফ থেকে।'

প্রফেসর মুখার্জি মৃদু হাসলেন। কিছু বললেন না।

ঢাকুরিয়া থেকে বাগবাজার প্রায় বারো কিলোমিটার। অনেক কসরৎ করেও মনুজেন্দ্র কিছুতেই ঘণ্টা দেড়েকের আগে মুখার্জিবাড়িতে পৌঁছতে পারল না।

দুজনে পৌঁছে দেখলেন, পরিস্থিতি গম্ভীর। সবাই বৈঠকখানায় জমায়েত হয়েছে। ব্রতীন তার ল্যাপটপের ব্যাগটা কোলের কাছে আঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ভেরোনিকা তার পাশেই। তার আচার আচরণে অধৈর্যভাব স্পষ্ট। ব্রজনারায়ণ আর দীপনারায়ণের মধ্যে মিলিজুলি হয়ে একপ্রস্থ কান্নাকাটিও হয়ে গেছে। দীপনারায়ণের চোখ ছলছল। এক কোণে মনোজ চাকলাদার বসে হাই তুলছেন। তাঁর পাশে ফৌজিয়া বসে নিজের মোবাইলে ব্যস্ত। শুধু একজনকেই প্রথমবার দেখলেন প্রফেসর মুখার্জি, নীলিমা দেবী, দীপনারায়ণের স্ত্রী। ছেলের কাঁধটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রফেসর মুখার্জি আর মনুজেন্দ্র ঢুকতেই সবাই নড়েচড়ে বসলেন। প্রথমে ভেরোনিকাই মুখ খুলল। একটু জোরের সঙ্গে বলল, 'এসব কী হচ্ছে আঙ্কেল? আমার একটা আর্জেন্ট কাজ ছিল দিল্লিতে। এইভাবে আমাকে এখানে নিয়ে আসার মানে কী?'

প্রফেসর মুখার্জি আরাম করে একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'বটে? তা কী আর্জেন্ট কাজ ছিল একটু বলো তো মা। আর ব্রতীন কেন সঙ্গে যাচ্ছিল সেটাও একটু জানাও দেখি।'

ভেরোনিকা সামান্য অপ্রস্তুত হয়েও নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'ও এয়ারপোর্টে আমাকে সি অফ করতে যাচ্ছিল।'

'সঙ্গে কয়েকদিনের জামাকাপড় নিয়ে?'

ভেরোনিকা চুপ করে গেল। প্রফেসর মুখার্জি এবার ব্রতীনের দিকে ফিরলেন, 'বাবা ব্রতীন, তোমার ল্যাপটপের ব্যাগটা একটু দাও তো বাবা।'

ব্রতীন ব্যাগটা বুকের কাছে আরও জোরে আঁকড়ে বলল, 'একদম না। আমার প্রাইভেট জিনিস আপনাকে দেখতে দেব কেন?'

মনুজেন্দ্র উঠে দাঁড়াচ্ছিল ব্রতীনের ব্যাগটা নিজের হাতে নেবে বলে। তার দরকার হল না। নীলিমা দেবী ব্রতীনের হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিলেন। ব্রতীন বোধহয় তার মা'কে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। নীলিমা দেবী যে চোখে ব্রতীনের দিকে তাকালেন, দেখে মনুজেন্দ্ররই গলা শুকিয়ে গেল, ব্রতীনের তো কথাই নেই।

প্রফেসর মুখার্জি ধীরেসুস্থে ল্যাপটপ ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বার করলেন। তারপর ওটা ফৌজিয়ার হাতে দিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আই পি অ্যাড্রেসটা নোট করে এনেছ তো? এর সঙ্গে চেক করো তো। আর পাসওয়ার্ড চাইলে ব্রতীনকে জিজ্ঞেস করো, ব্রতীন বলে দেবে। কী বাবা ব্রতীন, তাই তো?'

ব্রতীনের গলার কণ্ঠাটা ওঠানামা করল, কথা বেরোল না।

দীপনারায়ণ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'কী হচ্ছে, একটু বুঝিয়ে বলবেন প্রফেসর মুখার্জি?'

প্রফেসর মুখার্জি হাত তুলে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'বলব তো বটেই। তবে তার আগে একটি বহুমূল্য জিনিস তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হাতে

তুলে দিই।'

এই বলে প্রফেসর মুখার্জি ল্যাপটপ ব্যাগের সবকটা চেন খুলে ফেললেন। অবশেষে ব্যাগের একদম পেছনে বিশেষভাবে তৈরি একটি লুকোনো পকেট থেকে বের করে আনলেন একটি বই। তারপর সেটি সবার সামনে তুলে ধরলেন। সবাই দেখল প্রফেসর মুখার্জির হাতে শোভা পাচ্ছে জগদিন্দ্রনারায়ণ মুখার্জির লেখা একমাত্র বই 'কল অফ দ্য সিন্ধ'এর চুরি যাওয়া কপিটি।

দীপনারায়ণ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'এর মানে কী?'

'মানে অনেক কিছুই মিস্টার মুখার্জি। সব এক এক করে বলছি। তার আগে একটা ছোট কাজ আছে।' এই বলে বইটার কভার উলটে প্রথম পৃষ্ঠা বার করলেন প্রফেসর মুখার্জি। পৃষ্ঠাটির মাথার দিকে সিঁদুরের ছাপ দেওয়া একটি ছোট্ট গোল কাগজ আছে, ছোট্ট একটুকরো প্লাস্টিকে মোড়া। প্রফেসর মুখার্জি সেটা চতুরানন পট্টনায়কের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো পট্টনায়ক সাহেব, চিনতে পারেন কী না।'

পট্টনায়ক সাহেব পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করলেন। সেই দেখে প্রফেসর মুখার্জি হেসে বললেন, 'আপনি বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তাই না?'

চতুরানন বললেন, 'চুলগুলো তো আর এমনি এমনি পাকেনি। গোয়েন্দা না হতে পারি, অভিজ্ঞতার তো একটা দাম আছে।'

এই বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সিঁদুরের টিপটা খুব যত্ন করে দেখতে লাগলেন। মিনিট দুয়েক পর মাথা তুলে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'মাই গড! এ তো অরিজিনাল রেড সিন্‌ধ্ ডাক, অলমোস্ট ইনট্যাক্ট! এ তো সাত রাজার ধন এক মানিক প্রফেসর সাহেব! জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, আহা, কী জিনিস দেখালেন প্রফেসর মুখার্জি! আমার সারা জীবন ধন্য হয়ে গেল।'

প্রফেসর মুখার্জি মৃদু হেসে বইটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন ব্রজনারায়ণ মুখার্জির দিকে। বইটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'নিন। আপনার বাবা আপনার জন্য এই সাত রাজার ধন মানিক রেখে গেছিলেন। এ জিনিস আইনত, ন্যায্যত আপনার প্রাপ্য।'

ব্রজনারায়ণ অভিভূতস্বরে বললেন, 'কী হচ্ছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কী এটা?'

'সিন্‌ধ্ ডাক। ভারত তথা এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পুরোনো স্ট্যাম্প, সবচেয়ে দামিও বটে। সদবি'র অকশনে তুললে হেসেখেলে তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ ডলার পাবেন।'

ব্রজনারায়ণের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি এখনও বুঝতে পারছেন না কী হচ্ছে। দীপনারায়ণের অবস্থাও তথৈবচ। ভেরোনিকা আর ব্রতীনের মুখ মাটির দিকে। মনোজ চাকলাদার একটু গলা খাঁকারি দিয়ে হেসে বললেন, 'পুরো ঘটনাটা একটু খুলে বলবেন মামাবাবু?'

প্রফেসর মুখার্জি হেসে বললেন, 'সব বলছি। এক এক করে। সত্যি কথা

বলতে কি, এটা এমন কিছু জটিল কেস ছিল না। প্রিপ্রেজুডিসড না হলে এই কেস আমি আগেই সলভ করে ফেলতে পারতাম। পুরো ঘটনাটা আমি আমার আন্দাজে বলছি। ভুল হলে ব্রতীন আর ভেরোনিকা শুধরে দেবে। কী ব্রতীন, দেবে তো?'

ব্রতীন অতি দুর্বলভাবে ঘাড় নাড়ল।

'গুড। এইবার বলা যাক।

স্যার জগদিন্দ্রনারায়ণ ছিলেন একজন কালেক্টর। বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। দুনিয়ার প্রায় সমস্ত রেয়ার আর্টিফ্যাক্টস বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন।

একজন কালেক্টর হিসেবে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মতো ফিলাটেলি বা স্ট্যাম্প কালেকশন বিষয়েও জগদিন্দ্রনারায়ণের উৎসাহ ছিল সাংঘাতিক। কিন্তু তিনি কোনও স্ট্যাম্প জমাননি। কেন জমাননি সে কথা আজ বলা মুশকিল।

জগদিন্দ্রনারায়ণ যখন মারা যান, তখন তিনি নিজের স্ত্রীর চাপে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর বড় ছেলে দীপনারায়ণের নামে উইল করে দিয়ে যান। অথচ ছোট ছেলে ব্রজনারায়ণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল গভীর। তিনি চাননি যে তাঁর ছোটছেলে একেবারে বঞ্চিত হোক।

যখন তিনি তাঁর স্ত্রীর জোরাজুরিতে তাঁর সব সম্পত্তি থেকে তাঁর ছোট ছেলেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হলেন, তখনই তিনি একটা ঝুঁকি নেওয়ার কথা ভাবলেন।

আগেই বলেছি আরও বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ফিলাটেলি নিয়েও জগদিন্দ্রনারায়ণের প্রচুর উৎসাহ ছিল। অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত হবে না, অন্যান্য বিভিন্ন আর্টিফ্যাক্টস কালেক্টরদের সঙ্গে, অতি উচ্চমার্গের স্ট্যাম্প কালেক্টরদের সঙ্গেও জগদিন্দ্রনারায়ণের যোগাযোগ ছিল।

খুব সম্ভবত তাঁদেরই কারও একজনের কাছ থেকে, নিজের সারাজীবনের সঞ্চয়ের বেশ খানিকটা খসিয়ে এই স্ট্যাম্পটি কেনেন জগদিন্দ্রনারায়ণ।

অন্যান্য বহুতর দামি স্ট্যাম্প থাকতে তিনি কেন এই স্ট্যাম্পটিই কেনেন সেটা অনুমান করতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নিজের সারাজীবনের পড়াশোনা দিয়ে জগদিন্দ্রনারায়ণ একটিই বই লিখেছিলেন, কল অফ দ্য সিন্ধ্। বাংলায় অনুবাদ করলে হয় সিন্ধ্ এর ডাক!

তাই একটি অমূল্য সিন্ধ্ ডাক জোগাড় করে তিনি ছোট একটি প্লাস্টিকের মধ্যে পুরে তাঁর সমনামী বইটির মাথায় সেঁটে দিলেন। বড় ছেলেকে বলে গেলেন, এই বই যেন কোনওভাবে বেহাত না হয়, আর সুযোগ পেলে দীপনারায়ণ যেন বইটি তাঁর ছোট ছেলে ব্রজনারায়ণের হাতে তুলে দেন।

জগদিন্দ্রনারায়ণ হয়তো আশায় ছিলেন যে ব্রজনারায়ণ যেহেতু স্বভাবচরিত্রে তাঁরই মতন, তাই তাঁরও হয়তো একদিন ফিলাটেলিতে আগ্রহ জন্মাবে। আর একদিন না একদিন তিনি নিশ্চয়ই নিজের ভিটেয় ফিরে আসবেন। আর বইটি হাতে পেয়ে ওই অমূল্য স্ট্যাম্পটি আবিষ্কার করবেন। হয়তো ভদ্রলোকের আশা বা কল্পনা একটু দূরপ্রসারী ছিল। কিন্তু অনুমান করি, এর থেকে আর ভালো প্ল্যান তিনি খুঁজে পাননি।

জগদিন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন। ব্রজনারায়ণ আর নিজের ভিটেয় ফিরলেন না।

দীপনারায়ণের ফিলাটেলিতে কোনও আগ্রহ ছিল না। বইটা তাই এমনিতেই লাইব্রেরিতে পড়েছিল। সিন্ধ্ ডাক এমনিতেই খুব ভঙ্গুর, ফ্র্যাজাইল কাগজে ছাপা। হয়তো আর তিরিশ চল্লিশ বছর পর এমনি এমনিই হাপিস হয়ে যেত। হল না একজনের জন্য। আমাদের ব্রতীন, ব্রতীন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি।

ব্রতীন ছোটবেলা থেকেই খুব চুপচাপ, মুখচোরা লাজুক গোছের ছেলে। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে সে তার ঠাকুর্দার একটি গুণ পেয়েছিল, বিভিন্ন অ্যান্টিক বা রেয়ার আর্টিফ্যাক্টস নিয়ে আগ্রহ। দিনের একটা বড় সময় সে ঠাকুর্দার কালেকশন এবং তার ঠিকুজী কুলুজি খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করত। কল অফ দ্য সিন্ধ্ বইটিও সে নেড়েচেড়ে দেখেছিল নিশ্চয়ই। তবে তখন সে তার মর্ম বোঝেনি।

বুঝল আজ থেকে এক মাস আগে।

ব্রতীন কম্পিউটারে তুখোড়। সারা পৃথিবীর ওয়েব দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। ঠাকুর্দার মতো অতটা না হলেও, ফিলাটেলি নিয়ে কিছু পড়াশোনা তারও আছে। ফলে আজ থেকে মাসখানেক আগে যখন গত মাসে লণ্ডনের রয়্যাল ফিলাটেলি সোসাইটি একটা দামি ডাকটিকিটের লিস্ট প্রকাশ করল, সেটা তার নজর এড়ায়নি। তখন সে জানতে পারল সেই লিস্ট অনুযায়ী ভারতীয় ডাকটিকিটের মধ্যে সবচেয়ে অমূল্য হচ্ছে সিন্ধ্ ডাক। সেইসঙ্গে সিন্ধ্ ডাক এর কিছু ছবিও প্রকাশিত হয়।

তাতেও ব্রতীন নিঃসন্দেহ হল না। সে ফোন করল চতুরানন পট্টনায়ককে। নিজের নামটা অবশ্য ঠিকই বলেছিল। বি এন মুখার্জি, ব্রতীন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি।'

মনুজেন্দ্র বলল, 'মাই গুডনেস! আর আমরা ভেবেছি ব্রজনারায়ণ মুখার্জি!'

ব্রজনারায়ণ ভুরু কুঁচকে মনুজেন্দ্রর দিকে তাকালেন। বোধহয় কিছু একটা বলতেন।

'ব্রতীন বুঝে গেল কী অমূল্য জিনিস তার হাতে এসে পড়েছে। ব্রতীনের টাকা চাই, অনেক টাকা। তখনই তার মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেলো। কিন্তু এত টাকা ব্রতীনের কী কারণে চাই?

ব্রতীনের একটিই বন্ধু কলেজে, নাম ভেরোনিকা। শুধু বন্ধু না, বিশেষ বন্ধু। মুখচোরা ছেলেদের প্রতি ডাকাবুকো মেয়েদের একটা আকর্ষণ থাকে। কেন, সে মনস্তত্ত্ববিদরাই বলতে পারবেন। ভেরোনিকা বলিয়ে কইয়ে মেয়ে, তার উপস্থিত বুদ্ধিও প্রচুর। কী করে যে 'মিলন হল দোহেঁ' সে মা গঙ্গাই জানেন।

ভেরোনিকার বাবা বড়লোক। ভেরোনিকা ঠিকই করে নিয়েছে গ্র্যাজুয়েশনের পর সে কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে পড়তে বিদেশে যাবে। ব্রতীন এদিকে ক্লাসের সেরা ছেলে। সেও কি পড়াশোনা করতে বিদেশে যাবে না? তারও ইচ্ছে খুব। তাছাড়া ভেরোনিকাকে ছেড়ে থাকার কথা সে ভাবতেও পারে না।

কিন্তু দীপনারায়ণ-নীলিমা পারতপক্ষে তাঁদের একমাত্র ছেলেকে চোখের আড়াল করেন না। তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ব্রতীনকে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করার দরকার নেই। একবার তাঁদের পরিবারের সন্তান গৃহত্যাগী হয়েছে, দ্বিতীয়বার তাঁরা সেটা হতে দেবেন না।

ব্রতীন ঠিক করল, সে আর ভেরোনিকা বিদেশ যাবেই। দরকার হলে নিজের

পয়সাতেই যাবে। তার কাকার মতো বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করে অনেক বড় হবে সে। আর তার জন্য তার চাই টাকা। অনেক টাকা।

এইবার সে খুঁজতে লাগল কী করে স্ট্যাম্পটা বেচা যায়। কয়েকদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে সে বুঝল সাধারণ উপায়ে এ জিনিস বেচা যাবে না। তখন তার সাইবার বুদ্ধি তাকে বলল এর একটাই উপায় আছে, ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে বিক্রি করা।

কিন্তু এসব সে করবে কখন? কোথায়? ডার্ক ওয়েবে ঢুকতে গেলে টর ব্রাউজার লাগে। তাতে মেশিনের ইন্টারনেট স্পিড স্লো হয়ে যায়। ফলে ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন চাই। আর যদি কোনও ক্রেতা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে, সেসব তো আর বাড়িতে বসে করা যায় না!

তাহলে কী করবে সে? তার থেকেও বড় কথা বইটা হাপিস হয়ে যাওয়াটা কী করে সামাল দেবে সে? সে তার বাবাকে চেনে। দীপনারায়ণ এক কথার লোক, পিতৃ আদেশ পালন করার জন্য তিনি তোলপাড় করে ফেলবেন। অতএব এমন কৌশল করতে হবে যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

এই সময়ে ব্রতীন জানতে পারল ব্রজনারায়ণ কলকাতা আসছেন। খুব সম্ভবত কাকাকে অনেক দিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করে সে। সে নিজেও তার কাকার মতো সাইবার এক্সপার্ট হতে চায়। ব্রতীনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো।

শাস্ত্রে পার্টনার ইন ক্রাইম বলে একটা কথা আছে। ব্রতীন তার সমস্ত পরিকল্পনা খুলে বলল তার উইনসাম ম্যারো ভেরোনিকাকে। ভেরোনিকাও ব্রতীনকে ছাড়া থাকতে পারবে না। সে একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। আর দুই কপোত-কপোতীর মাথা থেকে বেরোল এক জবরদস্ত প্ল্যান। ব্রতীন নিজেই নিজেকে অপহরণ করবে। আর এমনভাবে কেসটা সাজাবে যাতে পুলিশ ভাববে যে এর পেছনে ব্রজনারায়ণের হাত আছে।

ব্রতীন সেই প্ল্যানমাফিক ঠাকুর্দার ডেস্ক থেকে বইটা সরাল। বাস ধরে কলেজ স্ট্রিট গেল, বাড়ির গাড়ি না নিয়ে। তারপর আগে থেকেই ঠিক করে রাখা গলিতে ঢুকে ওয়েট করতে থাকল। একটু পরে ভেরোনিকা তার গাড়ি নিয়ে এল। ব্রতীন গাড়িতে উঠে বসতেই ভেরোনিকা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ব্রতীন একটা চমৎকার আইডিয়া করেছিল। সে আমাদের যা বলেছে তার অর্ধেক মিথ্যে আর বাকি অর্ধেক নির্জলা সত্যি। কে না জানে, নিখুঁত মিথ্যে ধরে ফেলার থেকে সত্যি মিথ্যে মেশানো গল্প ধরতে অনেক বেশি অসুবিধা হয়।

ভেরোনিকা ব্রতীনকে নিয়ে তুলল তারই বাবার কেনা একটি ফ্ল্যাটে। খুব সম্ভবত পার্ক সার্কাসের কাছাকাছি কোথাও, তাই তো ভেরোনিকা?'

ভেরোনিকা এতক্ষণ জড়সড় হয়ে চুপ করে প্রফেসর মুখার্জির কথা শুনছিল। তার যাবতীয় স্মার্টনেস এখন উধাও। মিনমিন করে বলল, 'দরগা রোডে, ডন বস্কো স্কুলের পেছনের গলিতে। লাস্ট বার্থডেতে বাবা আমাকে গিফট করেছিল। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পার্টি করতে হলে ওখানেই যাই।'

তৃপ্তির হাসি হাসলেন প্রফেসর মুখার্জি। মনুজেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী মনু, বলেছিলাম না? যাই হোক, বাকিটা বলছি।

দুদিন ব্রতীন আর ভেরোনিকা ওখানে রইল। ব্রতীন ডার্ক ওয়েবের থ্রু দিয়ে একজন ক্রেতা খুঁজে বার করল, যে দিল্লিতে থাকে। তারপর প্ল্যানমাফিক ভেরোনিকা তাকে দুদিন পর ভোরের দিকে প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ব্রতীন বাড়ি ফিরে এসে তার রিহার্সাল দেওয়া গল্পটা শোনাল। এমন কিছু হিন্ট দিল, যেন শুনে মনে হয় তার কাকাই এসে সাধুবাবার ছদ্মবেশে তাকে অপহরণ করেছিল। তাই সাধুবাবাকে দেখে তার চেনা চেনা মনে হয়, সাধুবাবার হাতে দামি বিদেশি ঘড়ি থাকে। অপহরণকারীরা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, বিরিয়ানি খাওয়ায়, এমনকি বাড়ি ফেরার জন্য ভাড়া অবধি দিয়ে দেয়!

ব্রতীন ভালোই জানত পুলিশ তার কাকাকে ছুঁতে পারবে না। কারণ একে তিনি ব্রিটিশ নাগরিক, দ্বিতীয়ত তিনিই যে এই কাজ করেছেন সেটা পুলিশ প্রমাণই করতে পারবে না। ফলে যতদিনে পুলিশ বুঝতে পারবে যে ব্রজনারায়ণ নির্দোষ, ততদিনে ব্রতীনের কাজ নির্বিঘ্নে মিটে যাবে। তারপর দীপনারায়ণ যদি আর কেস এগিয়ে নিয়ে যেতে না চান, পুলিশ কেস ফাইল বন্ধ করতে বাধ্য।

প্ল্যান ফাইনাল হল, কয়েকদিন বাদে দুই জনে দিল্লি গিয়ে স্ট্যাম্পটা হ্যান্ডওভার করে আসবে। ডার্ক ওয়েবে সব পেমেন্ট সচরাচর বিটকয়েনে হয়। কিন্তু বিদেশের ইউনিভার্সিটি তো আর বিটকয়েনে পেমেন্ট নেবে না! তার জন্য ডলার বা ইউরো চাই।

কিন্তু এমন চমৎকার প্ল্যান সত্বেও দুইজনে একটা ছোট ভুল করে ফেলেছিল। আর সেটুকুর জন্যই দুজনে ধরা পড়ে গেল।

ভেরোনিকা জানত তার গাড়ির ছবি কোনও না কোনও সিসিটিভি ক্যামেরায় উঠবেই। সেই দেখে তার গাড়ি খুঁজে পাওয়া পুলিশের কাছে জলভাত। এই ঝামেলা এড়ানোর একটাই উপায়, নাম্বারপ্লেট পালটানো। কিন্তু সেসব কাজে অনেক ঝুঁকি আছে, জানাজানির ভয় আছে। ফলে ভেরোনিকা, যে নিজে একজন দক্ষ আঁকিয়ে, সে ঠিক করল তার নাম্বারপ্লেটের লাস্ট চারটে ডিজিট বদলে দেবে।

ভেরোনিকার গাড়ির নাম্বারপ্লেট হচ্ছে WB02F2153. সে কী করল, যেটুকু চেঞ্জ না করলেই নয়, সেটুকুই চেঞ্জ করল। F কে E করল, 1 কে করল 4, 5 কে করল 6, আর 3 কে করল 8। এটুকু চেঞ্জ করা তার মতো আর্টিস্টের কাছে বাঁয়ে হাত কা খেল। ব্যবহার করল এমন এক ধরনের কালি যা সহজে ওঠানো যায়। দুদিন পরে তার্পিন তেল দিয়ে ঘষে তুলে দিলেই হল, নাম্বার প্লেট আবার যে কে সেই।

কিন্তু বেচারি ভাবতেও পারেনি যে WB02E2486 নাম্বারে সত্যিই একটা গাড়ি আছে। আর সেখানে 4 লেখা আছে যার ওপেন স্টাইলে, মানে যার মাথা দুটো মিলে যায় না। এদিকে ভেরোনিকাকে 1 থেকে 4 করতে হল, যেটা ক্লোজড স্টাইল, দুটো এন্ড শীর্ষবিন্দুতে মিলে গেছে।

ব্যাপারটা আমার মাথায় স্ট্রাইক করে ব্রজনারায়ণকে যে গাড়িটা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম্বারপ্লেট দেখে। গাড়ির লাস্ট চারটে ডিজিটই ছিল 4। আর তখনই মনে পড়ে বসন্ত আগরওয়াল আর ব্লগারদের ক্যামেরায় ধরা পড়া

দুটো নাম্বারপ্লেটের 4 দুরকম স্টাইলে লেখা। অর্থাৎ ব্লগারদুজনের ক্যামেরায় ধরা পড়া গাড়িটার নাম্বারপ্লেট হাতে আঁকা হয়েছে। এবং আঁকা হয়েছে সবচেয়ে মিনিমাল, কম এফোর্ট দিয়ে, যাতে পরে আসল নাম্বারে ফিরে যাওয়া যায়। এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে আমাদের খুঁজতে হবে কোন কোন ইংরেজি লেটার আর নাম্বার সবচেয়ে কম পরিশ্রম করে অন্য লেটার বা নাম্বারে পরিণত করা যায়। একটু মাথা খাটাতেই বুঝলাম যে E এর আড়ালে একটি F, 4 এর আড়ালে একটি 1, ৪ এর আড়ালে 3 এবং 6 এর আড়ালে 5 লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ গাড়িটার আসল নাম্বার WB02F2153, যে গাড়ির মালকিন মিস ভেরোনিকা। তাই তো?'

ভেরোনিকার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না! মনে হচ্ছে সে এবার মাটিতে মিশে গেলেই পারে।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'ব্যস, তারপর আর কী, সমস্ত অসঙ্গতিগুলো জিগস'স পাজলের মতো খাঁজে খাঁজে মিলে গেল। আর বাকিটা তো আপনারা জানেনই। যাই হোক, কেস সলভড, এবার পুলিশ কাকে অ্যারেস্ট করবে কি করবে না তাদের ব্যাপার। আমরা এখন চলি।'

কেউ কিছু বলার আগে নীলিমা দেবী শক্ত গলায় বললেন, 'কেউ কাউকে অ্যারেস্ট করবে না। এরা এমন কোনও বড় অপরাধ করেনি যে অ্যারেস্ট করতে হবে। এ আমাদের পারিবারিক ব্যাপার, আমরা মিটিয়ে নেব। আমরা কেস তুলে নিচ্ছি, পুলিশ ফাইল বন্ধ করে দিক।'

প্রফেসর মুখার্জি মনোজ চাকলাদারের দিকে তাকালেন। এডিজি সাহেব শ্রাগ করে বললেন, 'যো হুকুম ম্যাডাম। আমাদের হাতে এমনিতেও অনেক অন্যান্য কঠিন কেস আছে। আপনারা স্থানীয় থানায় একটা চিঠি দিন, আমরা কেস ফাইল ক্লোজ করে দিচ্ছি।'

চতুরানন পট্টনায়ক এখনও পুরো ঘটনাটার অভিঘাত সামলে উঠতে পারেননি। তিনি অভিভূতস্বরে বললেন, 'এবার ওই সিন্ধ্ ডাক এর কী হবে?'

প্রফেসর মুখার্জি ব্রজনারায়ণের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'সে উনি বুঝবেন। সিন্ধ ডাক এখন ওঁর সম্পত্তি।'

ব্রজনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোজা গিয়ে নিজের ভাইপোকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'পাগল ছেলে! ফেসবুকে যখন ফলো করতিস, যোগাযোগ করিসনি কেন? আমি কি তোর কেউ নই?'

ব্রতীন এমনিতেই কম কথা বলে। এখন তাকে দেখে মনে হল চোখদুটো টসটস করছে।

ব্রজনারায়ণ বললেন, 'মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিলাম বটে, বাবা কিন্তু আমাকে ভোলেননি। তিনি গোপনে আমার বিদেশযাত্রার খরচ, ভর্তি হওয়ার খরচ সব বহন করেছেন। এই সিন্ধ ডাক আমার নয়, মুখার্জি পরিবারের সম্পত্তি। আমি এই সম্পত্তি আমার ভাইপো শ্রীমান ব্রতীন্দ্রনারায়ণকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি।'

দীপনারায়ণের গলা বুজে এসেছিল। তিনি গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'কিন্তু ব্রজ, বাবা বলে গেছিলেন এটা তোরই সম্পত্তি।'

ব্রজনারায়ণ হেসে বললেন, 'ঠিকই তো। আমার সম্পত্তি যখন, আমি যাকে খুশি দান করতে পারি, তাই না? আমি না হয় আমার ভাইপোকে দান করে গেলাম। দেখো দাদা, আমি বিয়ে করিনি, আমার সন্তানাদি নেই। ব্রিটেনে চাকরি বাকরি করে যা সঞ্চয় করেছি, যা প্রপার্টি বানিয়েছি সে আমার ভাইপোরই প্রাপ্য। আর আমার ভাইপোর যা বুদ্ধি দেখছি, সম্পত্তি ওকে দিলেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তাছাড়া এতদিন পরে তোমাদের ফিরে পেলাম, তার দামও কি কম নাকি? না না, ও জিনিস ব্রতীনের কাছেই থাকুক। ও গ্র্যারজুয়েশনের পরেই লণ্ডন চলে আসুক। কাজের সূত্রে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ দু-জায়গাতেই আমার যথেষ্ট হোল্ড আছে। ব্রতীন আমার বাড়িতে থেকে মাস্টার্স, পি এইচ ডি যা খুশি করুক। ও এলে আমি ওই স্ট্যাম্প সদবি'তে নিলামে তুলব, যা পাওয়া যাবে তার হাফ তোমরা নিও, বাকি হাফ ব্রতীন নিক। এমনিতেও আমি নিলেও ব্রতীনই পাবে। কী বৌদি, তোমার ছেলে আমার বাড়িতে থেকে পড়লে তোমার আর ছেলে হারাবার ভয় নেই তো?'

নীলিমা দেবী শক্ত চরিত্রের মহিলা। তবুও দেখা গেল তাঁর আঁচল চোখের নীচে। তিনি সামান্য নাক টেনে বললেন, 'বাড়ির ছেলে তার কাকার কাছে থেকে পড়াশোনা করবে, এতে আর আমার ভয় কীসের? তোমাদের বাড়ির ছেলে, তোমরাই বুঝে নাও।'

ভেরোনিকা এতক্ষণ গোমড়া মুখে বসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে ব্রজনারায়ণ সামান্য হাসলেন, 'অমন ডিসহার্টেনড হওয়ার কিছু হয়নি সুইটহার্ট। তুমি আর ব্রতীন মিলে এতবড় প্ল্যানটা ফাঁদলে, তোমাকে কি ভুলে যেতে পারি? তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। তোমাকে কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে ব্রিটেনের সেরা জায়গায় ভর্তি করাবার দায়িত্ব আমার।'

ভেরোনিকা যে হাসিটা হাসল, তার দামই লাখ টাকা। নীলিমা দেবী ভেরোনিকার বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা নিয়ে টুক করে কামড়ে দিলেন, চাপাস্বরে বললেন, 'শয়তান মেয়ে, অত হাসতে নেই, নজর লেগে যাবে যে।'

প্রফেসর মুখার্জি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহলে আর কি। আমে দুধে মিশে গেছে, আমাদের আর আঁটি হয়ে গড়াগড়ি খেয়ে লাভ নেই, কী বলেন এডিজি সাহেব?'

সবাই উঠতে যাচ্ছিলেন। নীলিমা দেবী গম্ভীরমুখে বললেন, 'কেউ কোথাও যাবে না। আমি আরসালান থেকে বিরিয়ানি আনাচ্ছি। সব্বাই আজ ডিনার করে যাবেন।'

প্রফেসর মুখার্জি আকর্ণবিস্তৃত হেসে বললেন, 'স্পেশাল বিরিয়ানিটাই আনাবেন মাঠান, যাতে ডিম থাকে। আর ইয়ে, সঙ্গে মাটন স্টু'টা ভুলবেন না কিন্তু।'



বরেন মজুমদার হত্যা রহস্য

আঠেরোই মার্চ, উনিশশো নব্বই, বস্টন।

রাত দুটো। চারিদিক নিস্তব্ধ। পুব দিক থেকে বয়ে আসছে সামুদ্রিক হাওয়া। তার একটানা শনশন শব্দ শোনা যায়। সেই হাওয়ায় বার্চ আর পাইন গাছের মাথাগুলো অল্প অল্প দুলছে। সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লোকটা। কিন্তু তার কান ছিল অন্য দিকে।

লোকটার পরনে কালো কোট, মাথায় লম্বা হ্যাট আর হাতে গ্লাভস। প্যালেস রোড যেখানে আর ফেনওয়ে স্ট্রিটে এসে মিশেছে সেই কর্নারে একটা গাছের ছায়ায় মিশে দাঁড়িয়েছিল সে। স্থিরভাবে অপেক্ষা করছিল সামনের বিল্ডিংটার দরজাটার দিকে তাকিয়ে। না, সদর দরজা নয়, প্যালেস রোডের দিকে একটা ছোট দরজা আছে ফায়ার এস্কেপ হিসেবে। তার নজর ছিল সেইদিকে।

একবার বাঁ-হাতের কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিল। একঘণ্টা পনেরো মিনিট হয়েছে। আর বড়জোর মিনিট দশেক। তার মধ্যে ওরা বেরিয়ে না এলে মুশকিল। এর পর সিকিওরিটি গার্ড চেঞ্জ হওয়ার সময়। ধরা পড়তে বেশিক্ষণ লাগবে না।

একটু অস্থির হয়ে উঠল লোকটা। একঘণ্টা কুড়ি মিনিট মানে একঘণ্টা উনিশ মিনিট হয়ে ষাট সেকেন্ড, তার একমুহূর্ত বেশি না। চুলচেরা প্ল্যানিং আর যন্ত্রের মতো নিখুঁত এক্সিকিউশন, এর ওপরে ভর করেই আজ অব্দি এতগুলো সফল অপারেশন করেছে সে। কোনও দেশের পুলিশের বাবার সাধ্য হয়নি তার টিকি ছোঁয়া। কিন্তু এই ছেলে দুটোকে এত ট্রেনিং দিয়েও ব্যাপারটা শেখাতে পারেনি।

ভাবতে ভাবতেই প্যালেস রোডের দিক থেকে রাতের অন্ধকার চিরে চাপা পায়ের শব্দ ভেসে এল লোকটার কানে। দুজনের পায়ের শব্দ। ওরা ফিরে আসছে।

একটু পরেই দুটো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল লোকটার কাছে। তাদের পরনে পুলিশের নকল পোশাক। পিঠে রুকস্যাক। তিনজনের মধ্যে ফিসফিস করে কথা হল। একজন একটা ছোট রুকস্যাক ধরিয়ে দিল লোকটার হাতে।

'এটাই তো?' নিশ্চিন্ত হতে চাইল লোকটা।

'নিঃসন্দেহে।'

'গুড, এটা আমার কাছেই থাক। বাকিগুলো সেফ হাউসে নিয়ে যাও। এগুলো বাল্টিমোরের ভল্টে জমা করে কেটে পড়ো। ব্রাজিল হোক, মেক্সিকো হোক, কানাডা হোক, ইওরোপের যে কোনও কান্ট্রি হোক, মোটমাট এ দেশে যেন তোমাদের নেক্সট বছরখানেক আর দেখা না যায়।'

'সে তো বটেই। কিন্তু...' একটু ইতস্তত করল দ্বিতীয়জন।

'কিন্তু কী?'

'কিছু টাকা পেলে সুবিধা হয়। প্যাসেজ মানিও তো লাগবে।'

'প্যাসেজ মানি বাল্টিমোর দিয়ে দেবে। আর বাকি টাকার জন্য চিন্তা কোরো না। আজ অবধি কাজ করে টাকা পাওনি এমন হয়েছে কখনও?'

'না, না, হ্যারি' দ্বিতীয় লোকটা বলে, 'আমি সে-কথা বলতে চাইনি। আসলে একটু টানাটানি যাচ্ছে বলে...'

'পরশুর মধ্যে টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। এখন যাও, দেরি কোরো না।'

দুটো শরীর ছায়ার মতো নিঃশব্দে মিশে গেল অন্ধকারে। লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে হাঁটা দিল সামনের দিকে।

ফেনওয়ে স্ট্রিট ধরে একটু এগোলে ইভান্স ওয়ে পার্ক। তার পাশে রাস্তায় পার্কের ফুটপাত ঘেঁষে একটা বার্চগাছ। তার আড়ালে রাখা ফোর্ড গাড়িতে উঠে একবার রুকস্যাকটা খুলল সে।

হ্যাঁ, সেইটাই। কোনও ভুল নেই।

বুকটা ধকধক করছিল লোকটার, হাত কাঁপছিল থরথর করে। সে খুব ভালো করেই জানে যে অমূল্য সম্পদ এই মুহূর্তে তার কোলের ওপর পড়ে, সেটার মালিকানা পাওয়ার জন্য পৃথিবীর তাবড় তাবড় ধনীরা তাদের ডানহাতটা কেটে দিতে পারে।

কিন্তু না, সে বেচবে না এটা। সে চোর বটে, কিন্তু তার আগে সে একজন সমঝদার। এ জিনিস তার কাছেই থাকবে।

ড্যাশবোর্ড খুলে সে একবার ফ্লাইট টিকিটটা চেক করে নিল। এখান থেকে সোজা সেফ হাউস। বাল্টিমোর নয়, অন্য সেফ হাউস। তারপর সেখান থেকে কাল দুপুর নাগাদ এয়ারপোর্ট। প্রথমে বেলজিয়াম, সেখান থেকে ট্রেনে প্যারিস। তারপর তার নিজের ডেরা, লন্ডন। ভাবতে ভাবতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তবে সে হাসি মিনিটখানেকের জন্যই। গাড়ি চালাতে চালাতে ভ্রু কুঁচকে সে ভাবছিল, কোথায় রাখা যায় এই অমূল্য সম্পদ। কাল সকাল থেকে এ নিয়ে যা তুলকালাম উঠবে সেটা আন্দাজ করতে পারা কঠিন নয়। অন্তত বছর নয়-দশের আগে একে মার্কেটে আনাই যাবে না। ততদিন অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গায় রাখতে হবে এটাকে। কী করা যায়?

ভাবতে ভাবতে এক চিলতে হাসি খেলে গেল লোকটার মুখে। ইয়েস, এর থেকে নিরাপদ জায়গা আর হয় না।

গাড়ির গতি বাড়াল লোকটা। এখন তার ঘুম দরকার, অন্তত ঘণ্টা পাঁচ-ছয়েকের গাঢ় নিশ্চিন্ত ঘুম।

ডিসেম্বর। উনিশশো নব্বই। অক্সফোর্ড।

ফায়ার প্লেসের আগুনটা একটু উসকে দিয়ে রকিং চেয়ারে এসে বসলেন বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক। পরনে দামি সিল্কের গাউন, পায়ে দামি স্যান্ডেল। ফর্সা রং,

কাঁচা-পাকা চুল, আর সোনালি রিমের চশমায় ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আলাদা আভিজাত্য ফুটে উঠেছে। শুধু চেহারায় কেন, ঘরের সর্বত্র বৈভব আর আভিজাত্যের পরিচয়। মেঝেতে পাতা দামি কার্পেটে, বাহারি ওয়ালপেপারে, দেওয়ালে ঝোলানো দামি পেইন্টিং-এর দিকে তাকালে বোঝা যায় গৃহস্বামীর অর্থ আছে, রুচিও। একদিকের দেওয়াল জুড়ে ওক কাঠের বুককেস। তাতে ঠাসা আর্টের বইপত্র।

ঠোঁটে ধরা পাইপটা নিভে গেছিল। তাতে লাইটার জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করতে করতে উল্টোদিকে বসা ছেলেটিকে একবার আড়চোখে দেখে নিলেন তিনি। তারপর একবার গলা খাঁকার দিয়ে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তা বাবু হঠাৎ কী মনে করে?'

ছেলেটি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল, প্রশ্ন শুনে চমকে সামনে তাকাল সে। তারপর সামান্য নড়েচড়ে বসল। তার ভাব-ভঙ্গির মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য। পোশাক-আশাক দেখে মনে হয় খুব একটা স্বচ্ছল অবস্থা নয়। অথচ মুখ-চোখ দেখলে বোঝা যায় সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। হয়তো কোনও দুর্বিপাকে পড়ে এই অবস্থা।

ছেলেটি মৃদুস্বরে কথা বলা শুরু করে। এক এক করে বলে যায় তার ঘরছাড়া হওয়ার কাহিনি। মনে হয়, ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে থাকা থমথমে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কে যেন গ্রামোফোনের পিন দিয়ে আঁচড় কেটে চলেছে।

বলা শেষ হয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে ছেলেটি। তার দিকে তাকিয়ে একটু করুণাই হয় ভদ্রলোকের। তিনি বলেন, 'তা সামন্ত বাড়ির ছেলের এহেন দুর্মতি হল কেন? বাপের আস্তানায় কি ভাত-কাপড়ের খুবই অভাব হচ্ছিল?'

ছেলেটি ওইভাবেই বসে থাকে। কোনও উত্তর দেয় না।

সামান্য গলা চড়ান তিনি, 'বলি তোমার উধাও হওয়ার খবর শুনে চারিদিকে কী হুলুস্থুল পড়ে গেছিল সে নিয়ে সামান্য ধারণা আছে তোমার? তোমার মা-বাবার কী অবস্থা হয়েছিল জানো সেটা? তোমার অমন স্নেহশীলা মাকে এক সপ্তাহ নার্সিংহোমে ভর্তি রাখতে হয়েছিল, তোমার বাপের সেই থেকে হার্টের ব্যামো। আমি নিজে বার বার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ছুটে গেছি তোমাদের বাড়ি, নিজের প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা করেছি, সে সব জানো তুমি?'

ছেলেটি মাথা নিচু করে বসে থাকে। কোনও কথা জোগায় না তার মুখে। সেদিকে তাকিয়ে একটু মায়াই হয় তাঁর।

'কী পেলে কুঞ্জ? ঘর থেকে পালিয়ে কী পেলে? নিজের জীবন নিয়ে এতবড় ঝুঁকিটা নেওয়ার আগে দুবার ভাবলে না? এত ব্রাইট ছেলে তুমি, যেমন ব্রিলিয়ান্ট স্পোর্টসম্যান, তেমনই চমৎকার আঁকার হাত। ইউ হ্যাড আ ব্রাইট কেরিয়ার মাই বয়। অল দিস...অল দিস ফর হোয়াট?'

'ফর এভরিথিং ছোটকাকু, ফর এভরিথিং আই হ্যাভ এভার ভ্যালুড ইন লাইফ।' এইবার সোজা হয়ে বসে ছেলেটি। তার দু-চোখে সামান্য হলেও জ্যোতি ফিরে আসে, 'ভেবেছি একটাই তো জীবন। সেটাকে কি ওই কলকাতার এঁদো গলিতে

বসে নষ্ট করব? আমি দেশ দেখতে চাই ছোটকাকু। সারা পৃথিবী ঘুরতে চাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে বসে জীবন কাটানোর জন্য আমি জন্মাইনি ছোটকাকু।'

মনে মনে খুশি হন তিনি। সাব্বাস, এই তো চাই। ঘরকুনো বাঙালি উনি দু-চোখে দেখতে পারেন না। প্রশ্রয়কৌতুক ঝলসে ওঠে তাঁর স্বরে, 'হুম, এই লালমুখোদের সঙ্গে থেকে থেকে এদের বুকনি ভালোই রপ্ত করেছ দেখছি। তা কদ্দিন হল এদেশে?'

'বছর দুয়েক। এর আগে অ্যাডেন আর লিঁয়তে ছিলাম মাস ছয়েক ধরে। বেশিরভাগটা কেটেছে জলে ভেসে ভেসে।'

'তা ভবানীপুরের ভাস্কো দা গামার এখন থাকা হয় কোথায়? বাকিংহাম প্যালেসে?'

ব্যঙ্গ গায়ে মাখল না ছেলেটি। সাধারণ স্বরে বলল, 'ব্রিক লেনে। একটা ওয়ান কামরার অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছি। সেখানেই আছি আপাতত।'

'বাহ্, তোফা। ভবানীপুরের বিখ্যাত সামন্ত বংশের ছেলে আজ লন্ডনের একটা নোংরা বস্তিতে জীবন কাটাচ্ছে দেশ দুনিয়া দেখবে বলে। তা না হয় বুঝলাম। তা বাবুর অন্নসংস্থান হচ্ছে কী করে?'

একটু ইতস্ততভাবে উত্তর দেয় ছেলেটি, 'ওই আর কি...দু-একটা টুকিটাকি কাজ...অড জবস...'

'হুঁ।' জবাব শুনে সামান্য গম্ভীর হন তিনি, 'তা ভালো। দুবেলা খাবার জুটছে তো অড জবস করে?'

কিছু বলে না ছেলেটি। মাথা নিচু করে থাকে। এবার স্বর সামান্য নরম করেন তিনি, 'দেখো বাপু, আতান্তরে যে পড়েছ সে তো বুঝতেই পারছি। এককালে বড় কষ্ট দিয়েছ যা হোক, হাজার হোক মল্লিক বংশের রক্ত বইছে তোমার গায়ে। তোমাকে তো আর ফেলে দিতে পারি না। বলি আঁকাআঁকির অভ্যেসটা আছে, না সেটাও উচ্ছন্নে দিয়েছ?'

মাথা নাড়ে ছেলেটি। তারপর পায়ের কাছে রাখা ময়লা রুকস্যাক থেকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা একটা চার্ট পেপারের রোল তুলে আনে সে।

'বাঃ। একমাত্র ওই ভালো অভ্যেসটি ছাড়োনি দেখছি।' চার্ট পেপারগুলো এক এক করে উল্টে যাচ্ছিলেন তিনি, 'আহা, যেমন স্ট্রোক তেমনই ইম্যাজিনেশন। আমি তো তোমাকে সেই কবেই বলেছিলাম কানাই, এই লাইনে তোমার উন্নতির অবকাশ আছে। কেন যে এই বিপত্তি বাধালে...'

ছেলেটি শুকনো ঠোঁট চাটে। সামান্য স্খলিত গলায় বলে, 'একটু জল পেতে পারি ছোটকাকু?'

এতক্ষণে সচকিত হন মধ্যবয়সি মানুষটি, 'এ হে হে। দেখেছ, এতক্ষণ ধরে এখানে আছ, তোমাকে এক গ্লাস জল অবধি দিইনি। আসলে তোমার কাকিমা মারা যাওয়ার পর থেকেই...দাঁড়াও বাপু।'

কানাই ইতস্তত করে, 'ছোটকাকু, প্রমিতকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন?'

'না রে ভাই। প্রমিতের পড়াশোনা আছে। তাকে দার্জিলিঙের একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। কলকাতায় ওর দাদু-দিদা, মামারা আছেন। তাঁদের ছেড়ে ও এদেশে আসতে চাইল না। তাছাড়া আমি তো আর সারাজীবন এখানে কাটাব বলে আসিনি। চুক্তিতে পড়াব বলে এসেছি। টাইম ফুরোলেই ফুড়ুৎ।'

ছেলেটি চুপ করে রইল। ততক্ষণে তার সামনে এসে গেছে কিছু বার্গার, স্টেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি, সঙ্গে গ্লাসে ঢালা স্পার্কলিং ওয়াটার।

ছেলেটি বুভুক্ষুর মতো খেতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে করুণায় দ্রব হল গৃহস্বামীর মন। আহারে, লতায় পাতায় হোক, তাঁরই তো আত্মীয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হল। গৃহস্বামী আবার ফায়ার প্লেসের আগুন উসকে দিলেন একটু। অক্সফোর্ডে ডিসেম্বরের ঠান্ডা মারাত্মক। তিনি গরমের দেশের লোক। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা তিনি গত চার বছরেও মানিয়ে নিতে পারেননি।

'তা এখন কী মনে করে মিস্টার ভাস্কো দা গামা?' পাইপটা ফের ধরালেন তিনি। গলার স্বরে সহৃদয় সস্নেহ কৌতুক। সামনে বসে আসা ছেলেটা বোধহয় তাতেই সাহস পেল একটু, সামান্য থেমে বলল, 'একটা সমস্যায় পড়ে তোমার কাছে এলাম ছোটকাকু।'

'হুম, সে তো বুঝতেই পারছি। নইলে আর বিদেশে বিভুঁইয়ে এত খুঁজে খুঁজে আমার কাছে আসবি কেন?'

তুমির বদলে বহু পরিচিত তুই শুনে এবার আশ্বস্ত হয় ছেলেটি। গলা ঝেড়ে বলে, 'আমি যার কাছে এখন কাজ করি, তার নাম হচ্ছে হ্যারি এডিংটন। হ্যারি আমার থেকে বছর চারেকের বড়। লন্ডনের একটা পাবে আমার সঙ্গে ওর আলাপ। আমার অবস্থা শুনে ওর ব্রিক লেনের আস্তানায় আমাকে নিয়ে যায়। বলে এখানেই থাকো। আমার ফ্ল্যাটের দেখভাল করো। তার জন্য এক পয়সাও দিতে হবে না। শুধু নিজের খাই খরচ নিজে জুটিয়ে নাও।'

'ইন্টারেস্টিং! তা লোকটা করে কী?'

'বলতে পারব না। আস্তানাটা ওর নামে নেওয়া হলে কী হবে, সেখানে সে থাকে না বললেই চলে। আমি একাই ভোগদখল করি সেটা। লোকটা কোন কোন মুল্লুকে ঘুরে বেড়ায় জানি না। মাঝে মাঝে আসে, তখন তার হাবভাব রাজাবাদশাদের মতো। দামি কোট, জুতো, ঘড়ি, পারফিউম, কিছুরই কমতি নেই। হপ্তা দশ দিন থাকে। রইসি মেজাজে টাকা ওড়ায়, তারপর ফের উধাও হয়ে যায়।'

'হুম, আরও ইন্টারেস্টিং। তা একটা গোটা ফ্ল্যাট তোকে এমন মিনিমাগনায় ছেড়ে দিল? বদলে কিছু নিল না?'

'সেটাই তো বলছি। অড জবস করি বলছিলাম না? আজ থেকে বছর দেড়েক আগেকার কথা। আস্তানায় বসে ভেরেন্ডা ভাজছি আর ভাবছি কালকের দানাপানি জুটবে কোথা থেকে, এমন সময় ধূমকেতুর মতো হ্যারি এসে হাজির। আমাকে একটা ভালো করে মোড়া প্যাকেট দিয়ে বলল, গ্রসভেনর পার্কের গেটে বিকেল ছ'টা নাগাদ ব্রাউন কোট পরে একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। তার হাতে

এই প্যাকেটটা পৌঁছে দিলেই কড়কড়ে হাজার পাউন্ড পকেটে।'

'হাজার পাউন্ড? এই সামান্য কাজের জন্য? মাই গুডনেস! তোর সন্দেহ হল না?'

'হলেই বা কি। কিন্তু তখন আমার প্রায় না খেতে পেয়ে মরার দশা। তাই গেলাম। যেমন বলা ছিল তেমনই দাঁড়িয়েছিল একটা লোক। শেখানো কথামতো জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইজন'ট ইট টু কোল্ড হিয়ার?' লোকটা জবাব দিল 'ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড?'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। আমি প্যাকেট দিয়ে চলে এলাম। এসে দেখি হ্যারি নেই, কিন্তু আমার ওয়ার্ড্রোবের ড্রয়ারে কড়কড়ে হাজার পাউন্ড রেখে গেছে।'

'সাউন্ডস ফিশি। এক্সট্রিমলি ফিশি।' পাইপটা ফের ধরান ভদ্রলোক। ভ্রু দুটো ভীষণভাবে কুঁচকে আছে।

'তারপর আর কি। এরকম মাঝে মাঝেই হতো। আজ থেকে মাস আটেক আগে একটা কাণ্ড ঘটে। হ্যারি হঠাৎ করে ফিরে আসে ওর ফ্ল্যাটে। খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল ওকে। যেটা ওকে চট করে দেখায় না। আমাকে একটা প্যাকেট দিয়ে বলল, খুব যত্ন করে সাবধানে রাখতে। ও এসে বছরদুয়েক বাদে নিয়ে যাবে। তদ্দিন অবধি প্যাকেটটা ঠিকঠাক রাখার জন্য বিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে যাচ্ছে।'

'বিশ হাজার পাউন্ড?' সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। 'বলিস কী রে? এত টাকা শুধু একটা প্যাকেট লুকিয়ে রাখার জন্য? কী ছিল সে প্যাকেটে, জিগ্যেস করিসনি?'

'না ছোটকাকু। আমার কাজ টাকা নিয়ে কাজ হাসিল করা। বুঝেছিলাম যে কাজটা বোধহয় খুব একটা আইনি নয়, কিন্তু পেট চলে যাচ্ছে বলে আর মাথা ঘামাইনি।'

'হুম। তারপর?'

'তারপর, গতকাল পেপারে দেখলাম...' বলে পকেট থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বার করে সামনে রাখা মেহগনি টেবলের ওপরে রাখে সে।

লন্ডন টাইমসের গতকালের পেপারের কাটিং। তাতে একটা দুর্ঘটনার খবর। স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি পথে পুলিশের ধাওয়া থেকে বাঁচতে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ে গেছে একটি গাড়ি। আরোহীর নামধাম প্রকাশ করেছে স্কটল্যান্ডের পুলিশ। সঙ্গে মৃত লোকটির মুখের ফটো।

কাটিংটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। 'এ তো স্প্যানিশ নাম দেখছি। আমিও দেখেছি খবরটা। তো কী হয়েছে?'

'এ সেই হ্যারি ছোটকাকু।'

'তুই সিওর?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট। এ হ্যারি ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।'

'কিন্তু নামধাম তো অন্য লিখেছে এখানে।'

'হ্যারির মতো প্রতিভাবান জালিয়াত খুব বেশি জন্মায়নি ছোটকাকু। ও চাইলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীরও ফলস আইডেন্টিটি বানাতে পারে। নামধাম, গাড়ির নাম্বারপ্লেট জাল করা তো ওর বাঁ-হাতের খেলা।'

'বললেই হল? একটা জালিয়াত চোখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তার আসল ঠিকুজি কুষ্ঠি খুঁজে পাচ্ছে না? এ কী আঠেরোশো সালের সস্তা পাল্প ফিকশন নাকি? ইয়ার্কি হচ্ছে?'

ছেলেটা একটু ইতস্ততভাবে বলল, 'প্রশ্ন সেখানে নয় ছোটকাকু। প্রশ্ন হচ্ছে এইবারে প্যাকেটটা নিয়ে আমি কী করব।'

'প্যাকেটটা সঙ্গে আছে?'

'আছে। দেখাব বলেই তো এনেছি।'

'বার কর।'

রুকস্যাকটা থেকে একটা ব্রাউন কালারের এনভেলপে বাঁধা প্যাকেট বার করে আনল ছেলেটি। তারপর তুলে দিল তাঁর হাতে।

প্যাকেটের বাঁধন কেটে ভেতরের জিনিসটি বার করামাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চমকে উঠলেন তিনি। খানিকক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উত্তেজিত চাপাস্বরে বললেন, 'এটা জাল না আসল?'

ছেলেটি প্রশ্নটা বোঝেনি প্রথমে। তারপর বলল, 'মানে? জাল না আসল মানে?'

দীর্ঘদেহী মানুষটি উঠে এলেন তাঁর রকিং চেয়ার থেকে। ছেলেটির কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তোর হ্যারি কোথা থেকে পেল এই জিনিস?'

ছোটকাকুর এই অচেনা চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল ছেলেটি। আমতা আমতা করে বলল, 'সে আমি কী করে বলব?'

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ দ্রুত পায়ে পদচারণা করলেন ভদ্রলোক। পেছনে হাত, দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। ফর্সা মুখ উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

পায়চারি শেষ করে ফের ফিরে এলেন তিনি। বুককেসের নীচের দেরাজ থেকে কয়েকটা পেপারের কাটিং বার করে আনলেন। তারপর সেগুলো মেলে দিলেন ছেলেটির সামনে।

প্রতিটি পেপার কাটিং জুড়েই এক দুঃসাহসিক ডাকাতির খবর। ডাকাতেরা লুট করে নিয়ে গেছে বেশ কিছু অমূল্য সামগ্রী। সেসবের দাম পড়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল ছেলেটির।

'এর মানে কী ছোটকাকু?'

খানিকক্ষণ ছেলেটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছিস কিছু?'

'না ছোটকাকু। এসবের সঙ্গে হ্যারি বা এই প্যাকেটের কী সম্পর্ক?'

ভদ্রলোক এবার ঝুঁকে এলেন ছেলেটির দিকে, 'সত্যিই বুঝতে পারছিস না?'

ছেলেটি বোকা নয়। অনেক ঘাটের জল খেয়ে সে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার যা মনে হচ্ছিল সেটা আর মুখে প্রকাশ করল না সে।

'শোন কুঞ্জ, তুই এর মর্ম বুঝবি না। তাই এটা আমি নিজের কাছে রাখলাম। আর শোন, এই কথাটা যেন বাইরে না যায়, বুঝলি?'

'কেন ছোটকাকু?'

'কী চাস কুঞ্জ, তোর বাকি জীবনটা জেলে কাটুক?'

নড়েচড়ে বসল ছেলেটি, 'সে কি কেউ চায় ছোটকাকু?'

'তাহলে একদম চেপে যা এই ব্যাপার।' উত্তেজনা চেপে রেখে স্বাভাবিক স্বরে বলেন, 'শোন কুঞ্জ, নিজের অজান্তেই একটাই বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিস তুই। বুঝেছিস? ঘুণাক্ষরেও যদি এ-দেশের পুলিশ জানতে পারে যে তোর কাছে এই প্যাকেট আছে, তাহলে বাকি জীবনটা তোকে আমেরিকার জেলে পচবে।'

ছেলেটি শুকনো ঠোঁট চাটে, মুখে কথা আসে না।

'এই প্যাকেটটা আমি আমার কাছে রাখলাম। আজ থেকে এর দায়িত্ব আমার।'

'আর ইয়ে...'

'কোনও ইয়ে না কুঞ্জ।' কঠিন ভদ্রলোকের স্বর, 'এই প্যাকেট আমার কাছে থাকবে। এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ইনফ্যাক্ট তোর সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে সেটাও কাউকে জানাবার দরকার নেই। বুঝেছিস?'

ডিসেম্বরের অক্সফোর্ডের শৈত্য ক্রমেই চারিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটির শিরদাঁড়ায়। ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি তার হাড়ে হাড়ে ঠকঠকানি ধরিয়ে দিচ্ছিল।

মধ্যবয়সি মানুষটি এবার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলেটির সামনে বসেন। 'শোন কুঞ্জ, এই দেশে তোর একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোর বিদেশ দেখার শখ যাতে পূরণ হয় সে ব্যবস্থাও করে দেব। কিন্তু একটা শর্ত।'

'না ছোটকাকু। আমার জন্য কিছুই করতে হবে না তোমাকে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি, 'আমি খবরটা দেখেই বুঝেছিলাম যে মস্ত একটা গোলমাল বাধতে চলেছে এটা নিয়ে। হ্যারির ফ্ল্যাটে আজ না হোক কাল পুলিশ আসবে। আমি ওই ফ্ল্যাট খালি করে আমার উপস্থিতির শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে এসেছি। হ্যারিই একবার একটা জাল পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। সেটা সঙ্গে আছে। আর ওই বিশ হাজার পাউন্ডের প্রায় পুরোটাই আমার কাছে। সেসব নিয়ে আজ রাতেই এই দেশ ছাড়ছি আমি। আর হ্যাঁ, এই মুহূর্ত থেকেই কুঞ্জবিহারী সামন্ত মৃত। কাল থেকে এই নামে এই পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। আমি চললাম পাকাপাকি নিরুদ্দেশ হতে। আমার আর খোঁজ পাবে না কেউ। তুমিও না। খোঁজার চেষ্টাও কোরো না। ভালো থেকো।'

উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। গৃহস্বামী ভ্রু কুঁচকে বসে রইলেন।

* * *

কলেজ থেকে বেরোতেই প্রফেসর মুখার্জি দেখলেন সামনের রাস্তা জ্যামে পুরো বন্ধ। গাড়ির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন যে একটি রাজনৈতিক দলের

সমর্থকরা কলেজ স্ট্রিটের মোড় অবরোধ করেছে। দাবি অতি সামান্য। আধঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়ার সব অন্যায় অবিচারের অবসান চাই। এই চত্বরে এটাই দস্তুর, তাই প্রফেসর মুখার্জি চটলেন না। তিনি নিজেও বয়সকালে এসব ঢের করেছেন। তিনি জানেন যে মিনিট কুড়ির বেশি অবরোধ বাড়লেই পুলিশ এসে তুলে দেয়।

এবারেও তাই হল। জ্যাম কাটিয়ে বিধান সরণী ধরে প্রফেসর মুখার্জির গাড়ি যখন ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে তখন ওঁর মোবাইল বেজে উঠল। ফোন বার করে দেখলেন স্ক্রিনে লেখা মনোজ কলিং।

মনোজ চাকলাদারকে আপনারা চেনেন। ওঁর ভাগনে, সি আই ডি-র এডি জি। প্রফেসর মামা আর পুলিশকর্তা ভাগনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। ফোন তুলে বললেন, 'হ্যালো ভাগনেবাবু, বলো। আবার কোথাও ভালোমতন ঠেকেছ?'

মনোজ চাকলাদার উত্তর দিলেন, 'নইলে আর আপনাকে ফোন করব কেন?'

'তা তো বটেই। কাজ না থাকলে আর এই বুড়ো মানুষটাকে ফোনই বা করবে কেন?'

'ইয়ার্কি নয় মামাবাবু। একটা শক্ত কেসে ফেঁসে গেছি। বুদ্ধি ধার লাগবে।'

'বটে? কোন কেস? বরেন মজুমদারের খুনের কেসটা?'

ফোনের ওপারে হা-হা করে হেসে উঠলেন মনোজ চাকলাদার, 'মান গয়ে মামাবাবু। আমি জানতাম আপনি খবরের কাগজে এই কেসটা ফলো করছেন। ইনফ্যাক্ট এই নিয়ে আমি বাজিও ধরেছিলাম।'

'কেসটা কী একটু খুলে বলো তো বাপু। আমি খবরের কাগজে পড়লাম যে ভদ্রলোক বেশ কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। হার্টের ব্যামো ছিল। একদিন হঠাৎ তাঁকে বেডে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তো ব্যাপার।'

'প্রায় ঠিক বলেছেন মামাবাবু। লোকে এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মেনে নিত, যদি না তাঁর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর সরকার মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে সন্দেহ করতেন। তাঁর কথাতেই বরেন মজুমদারের ছেলে প্রমিত মজুমদার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস বলে একটা এফ আই আর করেন। আপনি তো জানেন, মজুমদাররা যথেষ্ট প্রভাবশালী ফ্যামিলি। তাই স্থানীয় থানা তড়িঘড়ি কেস রুজু করে এবং বডিটা ফরেনসিকে পাঠানো হয়।'

'ফরেনসিক রিপোর্টে কী বলল?'

'বিষক্রিয়ায় মৃত্যু। তবে বিষটা একটু আনইউজুয়াল। বিষটা প্রাকৃতিক নয়, সিন্থেটিক। খুব যে দুষ্প্রাপ্য তা নয়, আবার খুব সহজে পাওয়া যায় তাও নয়।'

'তাই নাকি?' আশ্চর্য হলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কী বিষ শুনি।'

'ক্যাস্টর অয়েল চেনেন তো? তার বীজ থেকে রাইসিন বলে একটা তীব্র বিষ তৈরি হয়। যে বিষটা পাওয়া গেছে সেটা এই রাইসিনেরই একটা ভ্যারিয়েশন। সত্তর কেজির একটা মানুষকে ঘণ্টা সাত-আটেকের মধ্যে পরপারে পাঠাতে পঞ্চাশ থেকে ষাট ন্যানোগ্রামই যথেষ্ট।'

'ন্যানোগ্রাম? বলো কী? তাহলে তো খুব সাঙ্ঘাতিক বিষ।'

'সে তো বটেই।'

'হুম। খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে আমিও বিষক্রিয়া বলেই আন্দাজ করেছিলাম। তা এখনও অবধি একটাও গ্রেফতার হল না!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মনোজ চাকলাদার। বললেন, 'গ্রেফতার যে হয়নি তা নয়। প্রফেসর মজুমদারকে দেখাশোনার জন্য একজন সর্বক্ষণের নার্স ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে ছেড়ে দিয়েছি। প্রফেসর মজুমদারের ঘর তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, নো ক্লু। আগের রাতে যে বাসনপত্রে খেয়েছিলেন সব ফরেনসিকে পাঠান হয়েছে, তাতে কোনওকিছু পাওয়া যায়নি। কী করে যে বিষটা ওঁর শরীরে ঢুকল বোঝা যাচ্ছে না।

বাড়ির কাজের লোকেদের ওপর ওয়াচ রাখা হচ্ছে। লোককে দেখানোর জন্য ড্রাইভার বংশীর ছেলে তাপস ওরফে ট্যাপাকে তুলে আনা হয়েছে। ছোকরা ড্রাগ অ্যাডিক্ট। হাতটানের অভ্যেস আছে। এদিক-ওদিক টুকটাক চুরির কেস খেয়েছে কয়েকটা। কিন্তু আমরাও জানি, এ কাজ ওর হতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা পুরো অথৈ জলে পড়ে আছি। খুনের মোডাস অপারেন্ডি, মোটিভ-টোটিভ কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'হুম। শুধু সেই জন্যই আবার আমার কথা মনে পড়ল ভাগ্নে? এটুকু তদন্তের জন্য তো তোমাদের সিআইডি মোর দ্যান এনাফ।'

ইতস্তত করলেন পুলিশ অধিকর্তা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন মামাবাবু। কেসটা এত অবধি এলে কোনও কথা ছিল না। প্রবলেমটা অন্য জায়গায়।

মজুমদার ফ্যামিলি যে বেশ প্রভাবশালী ফ্যামিলি সে তো আগেই বলেছি। তাছাড়া ওঁর বেশ কিছু গুণগ্রাহী সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলীতে বসে আছে। তাঁরাই স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে দরবার করছেন কেসটা নিয়ে। তাই উপরমহল থেকে এই রহস্য উদঘাটনের জন্য প্রচুর চাপ আসছে। আশু একটা সমাধান না হলে ডিপার্টমেন্টের একেবারে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা হয়ে যাবে মামাবাবু।'

'হুম, কেসের বিলিরুবিন হাই। নইলে আর এই বুড়োকে মনে পড়বে কেন। কিন্তু ভাগ্নেস্যার, একটা কথা বলো তো, তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি এই ব্যাপারে কী কী সাহায্য পেতে পারি? সে তো তোমাদের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন মনোজ চাকলাদার। হেসে বললেন, 'সে তো আপনার আছেই। আপনার স্নেহের মনু, মনুজেন্দ্র বর্মন।'

'গুড। মনুকে বোলো আমাকে একটা কল করতে।'

প্রফেসর মুখার্জি তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় নামতেই তাঁর ফোনে একটা কল এল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল, মনুজেন্দ্র কলিং। প্রফেসর মুখার্জি মুচকি হেসে ফোনটা কেটে দিলেন। একটু পর কল ব্যাক করবেন তিনি। ততক্ষণ শ্রীমান মনু একটু টেনশনে থাকুক না হয়।

* * *

বেলেঘাটা মেন রোড ধরে কালো রঙের এসইউভিটা ছুটে যাচ্ছিল ভবানীপুরের দিকে। তখন বেলা বারোটা বাজে, রাস্তাঘাটে প্রচুর ভিড়। স্পিডোমিটারের কাঁটা তিরিশ ছাড়াতেই পারছে না।

ড্রাইভারের পাশের সিটে যিনি বসেছিলেন তিনি একটু বয়স্ক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, বেঁটেখাটো রোগাসোগা চেহারা। গালে ফ্রেঞ্চকাট। পরনে সাধারণ শার্ট আর ট্রাউজার। যিনি ড্রাইভ করছিলেন তাঁর বয়েস তিরিশের বেশি নয়। পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম, চোখে গগলস।

'কিছু মনে করবেন না স্যার, এবারের ব্যাপারটা কিন্তু একটু উইয়ার্ড।'

'সে তো বটেই মনু। উইয়ার্ড অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং। নইলে কী আর মনোজ, আমার শরণাপন্ন হয়?'

মনু, মানে মনুজেন্দ্র বর্মণ, প্রফেসরের অত্যন্ত স্নেহের মানুষ।

'আমি সেটা মিন করিনি স্যার, কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করছি, কিছু মনে করবেন না। সেই আপনাকেই আবার কেসটা হ্যান্ডেল করতে দিলেন এডিজি স্যার।'

'ওর উপায় কী বলো! এবার ঘটনাটা কী ঘটেছে আদ্যোপান্ত খুলে বলো তো। খবরের কাগজে যা বলে তার তো আদ্ধেক মিথ্যে আর বাকি আদ্ধেক বাড়িয়ে বলা। আমার বিশ্বাস নেই।'

এবার একগাল হাসি দেখা গেল মনুজেন্দ্রর মুখে। গাড়ি চালাতে চালাতে ছোকরা বলে গেল গড়গড় করে।

'ভবানীপুরের মজুমদারেরা বনেদী পরিবার, এককালে বড় জমিদারি ছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পরেও নেই নেই করে যা রয়ে গেছে তা কম নয়। ভবানীপুরের মতো জায়গায় বিশাল তিনমহলা বাড়ি, গ্যারেজে কম করে তিন তিন খানা দামি গাড়ি। এত যুগ পরেও ঠাটবাট কিছুমাত্র কমেনি। এমনকী এই পরিবারের সন্তান হরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার স্বাধীনতার পর বিধান রায়ের মন্ত্রীসভাতেও ঠাঁই পেয়েছিলেন। সেটাও কম বড় বিষয় না।

'এই বাড়িরই সন্তান বরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আর্টের প্রফেসর। নিজেও আঁকা শিখেছেন এককালে। তবে আঁকাআঁকির চেয়ে ভদ্রলোকের ঝোঁক ছিল আর্টের হিস্ট্রির দিকে। দেশি-বিদেশি, সবধরনের আর্টের ইতিহাস নিয়ে একজন অথরিটি ছিলেন। বিদেশেও পড়িয়েছেন কিছুদিন। এই সার্কেলে খুব নামজাদা লোক।

বরেন মজুমদারের বয়েস হয়েছিল পঁচাত্তরের কাছাকাছি। স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন। একমাত্র ছেলে প্রমিতেন্দ্রনাথ মজুমদার পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাপের সঙ্গে ছেলের খুব মাখামাখি না থাকলেও অসদ্ভাব ছিল না। প্রমিতেন্দ্র কনফার্মড ব্যাচেলর। তিনি তাঁর কাজ, ক্লাব, পার্টি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর বরেন মজুমদার নিজের জগৎ নিয়ে। তাঁর সর্বক্ষণের দেখা-শোনার জন্য একজন নার্স বহাল

করা হয়েছিল। মজুমদারদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ছিলেন ডক্টর হরগোবিন্দ সরকার। নার্সটিকে তিনিই ঠিক করে দেন। এছাড়া ছিল বরেন মজুমদারের বাইশ বছরের বিশ্বস্ত সঙ্গী বংশী, ড্রাইভার কাম কম্বাইন্ড হ্যান্ড। সব মিলিয়ে বংশী, রান্নার জন্য এক মাসি আর ঠিকে কাজের জন্য আরেকটি মেয়ে, এই হচ্ছে বাপ ব্যাটার সংসার।

আজ থেকে দিন দশেক আগে ভদ্রলোককে তাঁর বিছানায় পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। তার আগের রাতে ঠিকঠাক ডিনার করেন। পরের দিন সকালে ঘর মোছার জন্য ঠিকে কাজের মেয়েটি দরজায় অনেকবার নক করার পরেও সাড়া না পেয়ে বাড়ির লোকজনকে ডেকে আনে। তারা ডাকাডাকি করেও ভেতর থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে শেষমেশ দরজা ভেঙে ঢুকে দেখে ভদ্রলোক খাটের ওপর মরে পড়ে আছেন।

প্রথমে মনে হয়েছিল সাধারণ হার্ট অ্যাটাকের কেস। ডক্টর সরকারেরই প্রথম সন্দেহ হয় মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাঁরই পরামর্শ মতো পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তারপর তো বাকিটা জানাই।

'ডক্টর সরকারের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল যে কেন ওঁর মনে হল যে মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মনুজেন্দ্র, 'বুড়ো বহুত খিটকেল। মেজাজ একেবারে রাজাবাদশার মতো। তার ওপর কেসটা যিনি হ্যান্ডেল করছিলেন, সেই ইনস্পেকটর রাখাল মুৎসুদ্দির কথাবার্তাও একটু রাফ। দুজনের মধ্যে একটা ক্ল্যাশ হয়ে যায়। তারপর আরও অন্যান্য কারণে রাখালবাবুকে কেসটা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কথা বলে দেখুন, বুড়োর পেট থেকে কিছু উদ্ধার করা যায় কি না।'

মুচকি হাসলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'আর কতদূর হে?'

'এই তো এই মোড়টা ঘুরেই।'

* * *

'আমার ঠাকুরদা কিন্তু বেশ জাঁদরেল লোক ছিলেন প্রফেসর মুখার্জি। স্পিকারও নাকি হরেন মজুমদারের দাপটে বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতেন। বিধানবাবু শুনেছি চোখে হারাতেন ওঁকে। পরে অবশ্য মনোমালিন্যের জন্য ঠাকুরদা পার্টি পলিটিক্স ছেড়ে দেন।' চায়ের কাপে একটা চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'প্রমিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, মজুমদার পরিবারের বর্তমান কর্তা। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, লম্বা দোহারা চেহারা। কাঁচাপাকা চুল, সরু গোঁফ আর রিমলেস চশমায় ভদ্রলোকের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে।'

'ঠাকুরদা আসলে একটু একরোখা গোছের মানুষ ছিলেন। চট করে কারও সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারতেন না। ইনফ্যাক্ট, এই একরোখামিটা আমাদের সবার মধ্যেই পাবেন। বাবা তো অক্সফোর্ডে পড়ানোর অমন লুক্রেটিভ কেরিয়ার ছেড়ে এই দেশে চলে এলেন ওই জন্যেই।'

'অক্সফোর্ডে কোন কলেজে পড়াতেন আপনার বাবা?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর মুখার্জি।

'সেন্ট জন'স কলেজে। বাবা সব ধরনের আর্ট হিস্ট্রির ওপরেই পড়াতে পারতেন। তবে ওঁর স্পেশ্যালিটি ছিল মধ্যযুগের পাশ্চাত্য শিল্পকলা, মানে মিডিভাল ইওরোপিয়ান আর্ট হিস্টরিতে। এই লাইনে এদেশে বাবার থেকে বড় বিশেষজ্ঞ খুব বেশি ছিলেন না।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট তো।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী অবধি পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাস, এই ছিল বাবার এরিয়া অফ স্পেশালাইজেশন। এই নিয়ে বাবার কয়েকটা পেপার্সও আছে। দেশের আর্ট ক্রিটিক বা শিল্পকলার প্রফেসর মাত্রেই বাবাকে একনামে চেনেন। তা আপনিও তো প্রফেসর শুনলাম। তবে আপনার বোধহয় অন্য লাইন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি কমার্সের লোক। আগে সেলসে চাকরি করতাম। আপাতত একটা এম বি এ কলেজে মার্কেটিং পড়াই।'

'তাই বলুন। আমার বাবা অ্যাকাডেমিক লাইনের লোক ছিলেন, নিজের সাবজেক্ট ছাড়া কিছু বুঝতেন না। রাতদিন ওই নিয়েই পড়ে থাকতেন। কারও সাতেপাঁচে থাকতেন না। কী করে যে কী হয়ে গেল!'

প্রমিতেন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসটা বেশ গভীর চোখে লক্ষ করলেন প্রফেসর মুখার্জি। মনুজেন্দ্র অবশ্য এত কথা শুনছিল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মস্ত বড় বৈঠকখানা দেখছিল। সারা ঘরে বৈভবের ছড়াছড়ি।

মেঝেতে দামি মির্জাপুরি গালিচা পাতা, উঁচু সিলিং থেকে যে ঝাড়বাতিখানি ঝুলছে তার দামই কিছু না হলেও কয়েক লক্ষ টাকা। বসার চেয়ার টেবিল সবই মহার্ঘ মেহগনি কাঠের। দেওয়ালের কোণে যে দুষ্প্রাপ্য ভিক্টোরিয়ান সাঁঝবাতিটি ঝুলছে, মনুজেন্দ্রর শিক্ষিত চোখ অনুমান করে নিল ওটা কোনও অকশন হাউস থেকে কাঞ্চনমূল্যে কেনা। এমনকী যে রেকাবিতে তাঁদের জন্য চা আর মিষ্টি এল সেটাও রুপোর তৈরি। দেওয়ালে সাঁটা দামি ডিজাইনার ওয়ালপেপার। তাতে ঝুলে আছে বেশ কিছু ভিক্টোরিয়ান যুগের ছবি। আর রয়েছে স্টাফ করা লেপার্ড, বাইসন আর হরিণের মাথা। সব মিলিয়ে বোঝা যায় যে গৃহস্বামীর শুধু অর্থ নয়, রুচিও আছে।

'ছবিগুলো সবই ইংল্যান্ড থেকে আনা। বাবার খুব পেইন্টিং সংগ্রহ করার শখ ছিল। আর জীবজন্তুর স্টাফ করা যে মাথাগুলো দেখছেন, ওগুলো হচ্ছে আমার ঠাকুরদা হরেন্দ্রনাথের কীর্তিকলাপ।' মনুজেন্দ্রর চোখ অনুসরণ করে বলে উঠলেন প্রমিতেন্দ্রনাথ, 'উনি ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত শিকারি। কত যে বুনো জন্তু মেরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। লোকে নামই দিয়েছিল হান্টার হরেন। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে এমন খুনে মেজাজের মানুষের ছেলে হয়েও আমার বাবা কিন্তু খুবই নিরীহ আর অহিংস মানুষ ছিলেন। তবে মজুমদার বংশের মর্যাদা আর জেদ, বাবার মধ্যে এই দুটো ব্যাপার ছিল পুরো মাত্রায়।'

'আপনি তো বোধহয় আপনার ঠাকুরদার মতো শিকারি বা বাবার মতো অধ্যাপক, কোনওটাই হননি, তাই না?'

হেসে ফেললেন প্রমিতেন্দ্রনাথ, 'ঠিকই বলেছেন। আমি ব্যবসা করি। তবে জিনিসপত্তর নয়, আমি বেচি বুদ্ধি। আমি ফিনান্সের লোক। একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মের পত্তন করি বছর বিশেক আগে। খারাপ চলছে না। তবে সত্যি বলতে কি, ছবির ব্যাপারে আমার তেমন ইন্টারেস্ট নেই। ওসব বাবাই বুঝতেন। আমার কোনওদিনই আগ্রহ জাগেনি ও ব্যাপারে।'

'আপনার কম্পানির নাম কী?'

'অ্যাডভান্স সিকিউরিটিজ। অফিস হচ্ছে বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের পাশে, ফিফটি চৌরঙ্গী রোড। একদিন আসুন না আমাদের অফিসে।'

'এবারে একটু কাজের কথায় আসি মিস্টার মিত্র। আশা করি জানেন যে আমরা কেন এসেছি।' জলের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আসল কথায় এলেন প্রফেসর মুখার্জি।

'জানি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, খুব একটা পরিষ্কার কিছু বুঝিনি। মনোজ, মানে আপনাদের এডিজি সাহেব বাবার গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনিই বললেন যে এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার পাল্টে গেছেন। আর কেসটা নাকি সি আই ডি-র হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। ফলে তদন্ত আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। আর আপনার কথাও বললেন। আমি তো অবাক! এমনকী হল যে বাবার মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব একেবারে সি আই ডিকে দিতে হল?'

ধীরে ধীরে মাথাটা ওপর নীচে করলেন প্রফেসর মুখার্জি। 'কারণ আছে মিস্টার মজুমদার, বেশ সিরিয়াস কারণ আছে। আসলে কেসটা একটু অদ্ভুত দিকে টার্ন নিয়েছে। তাই এডিজি আমার সাহায্য চেয়েছেন। যদিও পুরোটাই আনঅফিশিয়ালি। আগে আমার নিজের বিস্তারিত পরিচয় আর এই কেসে আমার ভূমিকাটা একটু বলে নিই। তাহলে আলোচনা করতে সুবিধা হয়।

আমার প্রফেশন তো আগেই বলেছি। নিজের সাবজেক্ট ছাড়াও বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে আমার কৌতূহল আছে, যেমন ইতিহাস, ক্রিপ্টোগ্রাফি, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ইত্যাদি। আমার বইয়ের সংগ্রহ খুব খারাপও না। সবই অবশ্য শখের পড়াশোনা।

প্রফেসর বরেন মজুমদারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেসটা নিয়ে আমি প্রথম থেকেই কৌতূহলী ছিলাম। এখানে জানিয়ে রাখি যে মনোজ চাকলাদার সম্পর্কে আমার ভাগ্নে হয়। কোনও কেস নিয়ে সি আই ডি যখন নাকানিচোবানি খায়, আমার বলে দেওয়া সূত্র ধরে সেইসব কেস সলভ করা হয়। কোনও প্যাঁচাল কেস হলেই সি আই ডিতে আমার ডাক পড়ে।'

মনুজেন্দ্রর ভুরু একটু কুঁচকে গেল। তার সামনে প্রফেসর সিআইডি-র অফিসার্সদের নাকানিচোবানি খাওয়ার কথা বলছেন, সেটা ঠিক হজম হল না। তবে প্রফেসর মুখার্জি সেদিকে মোটে পাত্তা দিলেন না। তিনি নিজের মতো করে বলতে থাকলেন।

'প্রফেসর মজুমদারের মৃত্যুর পর মৃতদেহের যে ময়না তদন্ত হয়, তাতে মৃত্যুর কারণ হিসেবে একটি বিশেষ বিষের উল্লেখ করা হয়। আশা করি এত অবধি

আপনি জানেন।'

মাথা নাড়লেন প্রমিতেন্দ্র।

'এবার বলি যেটা জানেন না। কথাটা সিক্রেট, তদন্তের স্বার্থে নিজেদের মধ্যেই থাকলে ভালো হয়। বিষপ্রয়োগে হত্যা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানান প্রফেসর মজুমদারের মৃত্যু যে বিষের প্রয়োগে হয়েছে সেটা কোনও সাধারণ বাজারচলতি বিষ নয়। রিসোর্সফুল লোক ছাড়া এলিতেলির হাতে এই বিষ আসা অসম্ভব।

এবার প্রফেসরের মৃত্যুটা আর সাধারণ কোনও হত্যারহস্য রইল না। পুলিশের বড়কর্তাদের টনক নড়ল। চট করে পাওয়া যায় না এমন বিষের প্রয়োগে কলকাতা শহরে একজন প্রথিতযশা অধ্যাপক খুন হয়ে গেলে নড়েচড়ে বসতেই হয়। তার ওপর যখন খুনের কোনও মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ।' বললেন প্রমিতেন্দ্র।

'সে তো বটেই।' বললেন, 'আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে আপনার আপত্তি নেই তো?'

শ্রাগ করলেন প্রমিতেন্দ্র। বললেন 'আমার জবানবন্দি আগে একবার নেওয়া হয়েছে। তবে আবারও বলতে অসুবিধা নেই।'

'বরেনবাবুর মৃতদেহ কে প্রথম আবিষ্কার করে?'

'বলতে গেলে আমরা সবাই। কাজের মেয়ে মিনতি ঘর মুছতে আসে সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ। এসে প্রথমে ও বাবার ঘরটাই মোছে। সেদিন অনেকবার ঘরের দরজায় নক করেও সাড়া না পেয়ে আমাদের ডেকে আনে। আমরাও অনেক ডাকাডাকি করার পর শেষে দরজা ভাঙতে বাধ্য হই। তারপর দেখি বিছানার ওপর বাবার বডি...'

গলাটা ধরে এল প্রমিতেন্দ্রর।

'তখন ক'টা বাজে?'

'এই ধরুন আটটা পনেরো।'

'কে কে ছিলেন তখন?'

'আমি, মিনতি, রান্নার মাসি শিউলিদি, ড্রাইভার বংশীদা। আর চারুমতী, মানে ওই নার্স ভদ্রমহিলা।'

'হুম। ডাক্তারকে খবর দিল কে?'

'নার্স ভদ্রমহিলাই। ডাক্তার সরকার এলেন আধঘণ্টার মধ্যেই। ততক্ষণে আত্মীয়স্বজনরা আসা শুরু করেছেন। বংশীদা অনেকদিন ধরে আমাদের গাড়ি চালায়, আমাদের পরিবারের একজনই। সেই দেখাশোনা করছিল। ডাক্তার সরকারই প্রথম বললেন, 'প্রমিত, মৃত্যুটা সহজ বলে মনে হচ্ছে না হে। এ নর্ম্যাল হার্ট অ্যাটাক নয়। একটা ফাউল প্লে-র গন্ধ পাচ্ছি। তুমি বরং একবার পুলিশে খবর দাও।

শুনে আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। বাবাকে যে কেউ খুন করতে পারে এ তো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। বাবার মতো সদাশয় সাত্ত্বিক নির্বিরোধী

লোক কমই দেখেছি। তাঁকে কে খুন করবে? আর কেনই বা করবে?'

'হুম। তা ডাক্তার সরকার জানাননি ওঁর কেন এমন মনে হল?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন প্রমিতেন্দ্র, 'নাহ্, শত জোরাজুরিতেও বলেননি। এমনিতেই উনি একটু রগচটা লোক। অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তার ওপর ভয়ঙ্কর জেদি। বললেন, যা বলার পুলিশকেই বলব।'

'ঘরের জানলা দরজা?'

'ভালোভাবে বন্ধ করা ছিল, যেমন থাকে। আসলে বাবা একটু ইনসিকিওর ধরনের মানুষ ছিলেন। জানলা দরজা খুলে রেখে ঘুমোনোর কথা ভাবতেই পারতেন না। রাত্রিতে দরজা জানাল বন্ধ করে এসি চালিয়ে ঘুমোতেন। সদর দরজা কখনও খোলা দেখলে কাজের লোকেদের বকাবকি করতেন। এমনকী গাড়ি করে বাইরে কোথাও বেরোলেও সবসময় কাচ তুলে এসি অন করে দরজা লক করে রাখতেন। আমরা অনেক হাসাহাসি করতাম বটে, কিন্তু বাবা এ বিষয়ে খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন। বিশ্বাসী কাজের লোকেদের চট করে ছাড়াতে চাইতেন না। থানা, দমকল, হাসপাতালের ফোন নাম্বার মুখস্ত করে রাখতেন।'

'তার আগের দিন বরেনবাবু কী কী করেছিলেন একটু বলবেন প্লিজ?'

'তেমন আনইউজুয়াল কিছু না। বাবা খুব ডিসিপ্লিনড লাইফ লিড করতেন। ঘড়ি ধরে ঘুম থেকে উঠতেন, ঘড়ি ধরে ঘুমোতে যেতেন। রিটায়ার করার পর তাঁর রুটিন ছিল সকালে উঠে মর্নিং ওয়াক। তারপর এসে পড়াশোনা। দুপুরে অল্প লাঞ্চ। তারপর সামান্য ঘুম। বিকেলে কোনও কাজ থাকলে বেরোতেন। মাঝেমধ্যে কোনও ছাত্র বা রিসার্চ স্কলাররা দেখা করতে আসত। তা না হলে লাইব্রেরিতে লেখালিখি পড়াশোনা এসব নিয়ে বসতেন। রাতে ডিনার করে দাঁত মেজে ওষুধ খেয়ে ঘুম।

সেদিন বিকেলের দিকে বাবা একবার ডাক্তার সরকারের কাছে গেছিলেন। ফিরে আসার পর দু-একজন দেখা করতে আসে। তারপর সাতটা নাগাদ আসেন সুরেশ আঙ্কেল, সুরেশ আগরওয়াল, বাবার কলেজ লাইফের বন্ধু। তিনি যান আটটা নাগাদ। তারপর বাবা খেয়েদেয়ে সাড়ে ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়েন।'

প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'বরেনবাবুর ঘরটা একবার দেখা যাবে?'

'গত পরশু পুলিশ সিল খুলে দিয়ে গেছে। তারপর আমরা ঘর পরিষ্কার করে আবার আগের মতোই সাজিয়ে রেখেছি। কিছু পাবেন বলে মনে হয় না। তবুও আসুন।'

বরেন মজুমদারের ঘর একতলাতে। হার্টের রোগীকে যাতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে না হয় তাই এই ব্যবস্থা। দক্ষিণ আর পূর্ব কোণে দুটো কাঠের খড়খড়ি দেওয়া জানালা। তার গায়ে মোটা গ্রিল। উত্তর পশ্চিম কোণে বিছানা, টানটান করে চাদর পাতা।

বিছানার মাথার দিকে একটা ছোট বেডসাইড টেবিল। তাতে রাইটিং প্যাড। পায়ের দিকে একটা কাঠের আলমারি, প্রফেসর মজুমদারের জামাকাপড় রাখার জায়গা বলে আন্দাজ করা যায়। দেওয়ালে কয়েকটা পোর্ট্রেট। সবক'টাই অয়েল পেইন্টিং।

প্রমিত মজুমদার চিনিয়ে দিলেন, 'আমার দাদু হরেন্দ্রনাথ মজুমদার আর তাঁর বাবা নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আর ওইটা বাবার সেল্ফ পোর্ট্রেট।'

সেল্ফ পোর্ট্রেটটা চমৎকার এঁকেছেন বরেন মজুমদার। ছবিটা ওঁর যুবক বয়সের। যাকে বলে হাফ বাস্ট ছবি। সৌম্যদর্শন এক তরুণ। হাতে একটা বই ধরা। বইয়ের নামটাও পড়া যাচ্ছে এখান থেকে, টুয়েলফথ নাইট। ছবি দেখে বোঝা যায় শুধু শিল্পের ইতিহাস নয়, শিল্পকলাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

প্রমিতবাবুকে বলায় উনি হেসে বললেন, 'শুধু ছবি আঁকা নয়, ছবির ফ্রেমিং, লাইট এসব নিয়েও বাবার দারুণ উৎসাহ ছিল। অনেক আর্ট গ্যালারি রীতিমতো দক্ষিণা দিয়ে বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসত। এই সবক'টা ছবি বাবার নিজের হাতে ফ্রেমিং করা।'

আলমারির পাশে একটা দরজা, অ্যাটাচড বাথরুমের। বাথরুমটাও দেখলেন প্রফেসর মুখার্জি। ওয়াশ বেসিনের কাছে গেলেন। সেখানে সুদৃশ্য কাচের গ্লাসে টুথব্রাশ, শেভিং ক্রিম, শেভিং ব্রাশ আর আফটারশেভ লোশন। সব কিছু পরিপাটি করে গোছানো।

বেরিয়ে এলেন প্রফেসর মুখার্জি। বললেন, 'ওই জানলা দুটোর ওপাশে একটু যাব।'

পুবদিকের জানলার পাশে একটা তিনফুটের সরু প্যাসেজ, তারপর দেওয়াল। প্রফেসর মুখার্জি দেওয়াল প্যাসেজ একবার দেখলেন। মনুজেন্দ্র বলল, 'খুনের পরদিন বিকেলে তুমুল বৃষ্টি হয়। কোথাও কোনও জুতোর ছাপ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়ার প্রশ্ন নেই।'

দক্ষিণ দিকের জানলার পাশে একটা ছোট কেয়ারি করা বাগান। মাটি এখনও অল্প অল্প ভিজে। সেখানে পৌঁছেও হতাশ হলেন প্রফেসর মুখার্জি। মনুজেন্দ্র কানে কানে বলল, 'এসব পুলিশ আগেই দেখে গেছে স্যার। আমার মনে হয় না আপনি কোনও আলাদা ক্লু বা কিছু পাবেন?'

প্রফেসর মুখার্জি মনুজেন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, 'পুলিশ ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছিল।'

'ইয়েস। পরিচিত লোক ছাড়া কোনও আননোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি।'

'প্রফেসর মজুমদার মারা যাওয়ার আগের রাতে যা যা খেয়েছিলেন তার ফরেনসিক করা হয়েছে?'

উত্তর দিলেন প্রমিতেন্দ্র, 'রাতের খাওয়া আমরা একসঙ্গে খাই। এটাই এবাড়ির নিয়ম। তারপর থালাবাসন সব ধুয়ে তুলে রাখা হয়। সেদিনের কিছু খাবার অবশিষ্ট ফ্রিজে রাখা ছিল। সেসব খাবার আর থালাবাসন পুলিশ নিয়ে গেছে। তবে শুনেছি, কিছু পাওয়া যায়নি।'

মনুজেন্দ্র মাথা নেড়ে কথাটা সমর্থন করল। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'প্রত্যক্ষদর্শীদের সবার জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে আগেই, সে রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে। তবুও, যদি আরেকবার তাদের জেরা করতে চাই, আপনার আপত্তি নেই তো?'

'সার্টেনলি নট। তবে একটা কথা বলে রাখি প্রফেসর, যারা সেদিন অকুস্থলে ছিল তারা প্রায় বিশ বছরের ওপর আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। তাদের মোটামুটি সন্দেহের বাইরে রাখতে পারেন। তবে ওই নার্স ভদ্রমহিলার ব্যাপারে বলতে পারব না।'

'অর্থাৎ তাঁকে সন্দেহ করা চলে, তাই তো?'

'একদমই না। ডাক্তারকাকুর স্পেশাল রেফারেন্সে এসেছিলেন উনি। আচার-আচরণে বা কাজেকর্মেও বেচাল দেখিনি। বাবা খুবই পছন্দ করতেন ওঁকে। মাঝে মাঝে কিছু ব্যক্তিগত জিনিস, যেমন ওষুধপত্র, দাড়ি কামানোর রেজার, টুথপেস্ট, রিমোটের ব্যাটারি, এসবও এনে দিতে বলতেন। মনে রাখবেন প্রফেসর সাহেব, আমার বাবা খুব সতর্ক এবং সন্দেহবাতিক লোক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস অর্জন করা সহজ নয়।'

'অর্থাৎ আপনার মতে আপনার বাবার কোনও শত্রু থাকতে পারে না। তাই তো?'

'একদম। অজাতশত্রু লোক। খুব রেগে গেলেও স্টুপিড ছাড়া অন্য কোনও কড়া শব্দ ব্যবহার করতে দেখিনি। তাছাড়া দান ধ্যান, লোকের উপকার, এসবও করতেন খুব। তাঁর কেউ ক্ষতি করবে ভাবতেই পারছি না।' গলাটা ফের বুঁজে এল প্রমিতেন্দ্রর।

এবার মুখ খুললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আচ্ছা মিস্টার মজুমদার, বরেনবাবুর মৃত্যুর আগে মাসখানেকের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে আপনাদের বাড়িতে?'

ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন প্রমিতেন্দ্র। তারপর বললেন, 'নাহ্, কিছু মনে করতে পারছি না।'

দুজনেই উঠে পড়লেন। শেষ কথাটা বলল মনুজেন্দ্র, 'সাবধানে থাকবেন মিস্টার মিত্র।'

* * *

গাড়িতে উঠতে উঠতে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'মৃতদেহের ময়না তদন্ত, বাসনপত্র খাবার দাবারের ফরেনসিক, প্রাথমিক তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ এই সমস্ত রিপোর্টের একটা করে কপি আমাকে আজ রাতের মধ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করো মনু। আজ থেকেই কাজে নেমে পড়তে চাই। ভালো কথা, যিনি অটোপ্সি করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়?'

'দিব্যি যায়। ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আজকের কথাবার্তা থেকে কোনও আইডিয়া পেলেন স্যার?'

'একটা খটকা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না বুঝলে। আজকে এমন কিছু একটা দেখেছি যেটা স্বাভাবিক না। সেটা যে কী, সেটা বুঝতে পারছি না।'

'কী সেটা?'

'সেটা বুঝতে পারলে তো হয়েই যেত।' হতাশ সুরে বললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'বুঝতে পারছি না বলেই তো অস্বস্তিটা হচ্ছে।'

'বুঝেছি স্যার। তাহলে আপাতত আমাদের কর্মপন্থা কী?'

'ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করো। আর বরেন মজুমদারের ব্যাপারে আরও ছানবিন করো। কোনও একটা ঘোলাটে পাস্ট থাকতেই হবে। নইলে একটা লোক সাধারণ সিকিউরিটি নিয়ে এত কনসার্নড থাকবে কেন? দেশে বা বিদেশে, ওঁর কিশোর বা যুবক বয়সে কোথাও কোনও শেডি পাস্ট পাও কি না খোঁজ করো।'

'যথা আজ্ঞা হুকুম স্যার।' ছদ্মবিনয়ে ঝুঁকেই পড়ল মনুজেন্দ্র, 'অওর কই সেবা মেরে লায়েক?'

'আপাতত পার্ক স্ট্রিট চল হে। অনেকদিন হল কুসুমের এগরোল খাইনি। মনটা বড়ই আনচান করছে। কলকাতা পুলিশের তো আর যাই হোক পয়সার অভাব নেই রে বাপু।'

* * *

'আমার ছেলে কুসঙ্গে পড়ে বখে যেতে পারে বাবু। তবে ও খুন করার ছেলে নয়।'

বংশী মালাকারের বয়েস পঞ্চাশের ওপর। হাইট সাড়ে পাঁচের নীচে। রোগাসোগা দোহারা চেহারা। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, হাত দুটো জোড়া, আর দুচোখে ভয়ের দৃষ্টি।

'আরে বংশী, ভয় পাচ্ছ কেন?' সহানুভূতির স্বরে বললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আমরা দু-একটা কথা জেনেই তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'বলুন বাবু, কী জানতে চান।'

যা জানা গেল সে আগেই জানতেন প্রফেসর মুখার্জি। আগের জবানবন্দির সঙ্গে ইতরবিশেষ কিছু নেই। বংশী মালাকার আগে কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালাত। তারপর বরেন মজুমদারের কাজে ঢোকে মজুমদার সাহেব লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর, সেই বিরানব্বই সাল নাগাদ। তখন সে বছর পঁচিশের জোয়ান ছোকরা। সেই থেকে এক নাগাড়ে তিরিশ বছর মজুমদার বাড়ির নুন খেয়েছে বংশী মালাকার। একতলা বাড়ি করেছে, ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়িয়েছে, এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, সবই এই বাড়ির গোলামি করে। সে বা তার ছেলে কখনও বেইমান হতে পারে?

কেমন মালিক ছিলেন মজুমদার সাহেব? সাক্ষাৎ দেবতা। কোনওদিন গালি দেননি, কটু কথা বলেননি। দরকারে অবরে সবরে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। বংশীও বাবুর জন্য প্রাণ দিতে পারে।

ছেলেটা বখে গেছে কুসঙ্গে পড়ে। বউ মরে যাওয়ার পর বংশী ভালো করে ছেলের দেখভাল করতে পারেনি। যা হয়, এদিও ওদিক বেপাড়ার বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ছোটখাটো হুজ্জোতি করে হাত পাকায়। তারপর নেশার পয়সা জোগাতে ছোটখাটো চুরিচামারি ধরে। এখন মদ গাঁজা চরস কিছুই বাদ নেই। দু-একবার জেলও খেটেছে অল্প মেয়াদে। বংশীই গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। হাজার হোক, নিজের ছেলে।

ছেলেকে কি একেবারেই শাসন করেনি বংশী? খুব করেছে সে। বকাবকি মারধোর কান্নাকাটি কিছুই বাকি রাখেনি। কিন্তু কপালে ভোগান্তি থাকলে খণ্ডাবে কে?

'তবে একটা কথা বলতে পারি বাবু, এই খুন আমার ছেলে করেনি। নিজের মরা মায়ের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি। আমার ছেলে মাতাল গেঁজেল হতে পারে বাবু, কিন্তু কাউকে মেরে ফেলতে পারে না। আমার ছেলেকে বাঁচান বাবু,' এই বলে প্রফেসর মুখার্জির পায়ের কাছে সটান লম্বা হয়ে পড়ল মজুমদার বাড়ির অনেকদিনের সুখদুঃখের সঙ্গী।

প্রফেসর মুখার্জি তাকে টেনে তুললেন। বললেন, 'আহা, ঘাবড়াচ্ছ কেন? পুলিশ যদি কোনও প্রমাণ না পায় তো তোমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে। এবার শান্ত হয়ে আরও কয়েকটা কথার জবাব দাও দিকি বাপু।'

'বলুন বাবু।'

'যেদিন মজুমদারবাবু খুন হন, তার আগের রাতে তুমি কী করছিলে?'

'ডিউটি শেষ করে আমি পাড়ার ক্লাবে তাস খেলছিলাম বাবু। মরা মায়ের দিব্যি খেয়ে বলছি। সবাই সাক্ষী আছে।'

'হুম। তা সেদিন তোমার ডিউটি শেষ হয় কখন?'

'সন্ধেবেলায় বাবু। মজুমদার মশাই সেদিন সকালে বেরোননি। দুপুরে খাওয়ার পর হঠাৎ বললেন বংশী, গাড়িটা বার কর। ডাক্তারবাবুর কাছে যাব। নিয়ে গেলাম। বাবু ঘন্টাখানেক কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, বাড়ি চল।'

'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কী কথা হল কিছু বলেছিলেন?'

'না বাবু। চাকর ড্রাইভারের সঙ্গে কি আর সব কথা খুলে বলা যায়! তবুও বাবু সুখ-দুঃখের অনেক কথাই আমাকে বলতেন। তবে কতটা বলবেন, আর কতটা বলবেন না, সে নিয়ে বাবুর খুব টনটনে হুঁশ ছিল।'

'বুঝেছি। তা সেদিন মজুমদার মশাই ডাক্তার সরকারের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কিছুই বললেন না?'

'নাহ্। শুধু খুব অস্থির আর গম্ভীর লাগছিল বাবুকে। একবার শুধু বললেন, বড় ভুল হয়ে গেছে রে বংশী, বড় ভুল হয়ে গেছে। ব্যস, আর কিছু নয়।'

'আর কিছু বললেন না?'

'না বাবু। তারপর সারা রাস্তা একেবারে চুপচাপ।'

'বেশ, বুঝলাম। একটা কথা বল তো বংশী, তোমার বাবু কি সবসময় খুব

ভয়ে ভয়ে থাকতেন?'

'ভয়ে ভয়ে বলব না, বলব বাবু খুব সাবধানে থাকতেন। সবসময় দেখে নিতেন ঘরের দরজা লোক আছে কি না। গাড়ির কাচ তুলে রাখতেন। পারতপক্ষে কোনও ঝুট-ঝামেলায় যেতেন না। বাইরে ঘুরতে গেলে দু-বেলা আমাকে ফোন করে খোঁজ নিতেন বাড়ির সব কিছু ঠিক আছে কি না।'

'তোমার কাছে অদ্ভুত লাগত না?'

'কেন বাবু? সাবধান হওয়া কি খারাপ? কত লোকের তো কত কিছুরই বাতিক থাকে। এটাও কি একটা বাতিক হতে পারে না?'

'তা পারে। বাদ দাও, তা তোমার তো এখন এবাড়ি থেকে অন্ন উঠল বলে। এরপর কী করবে কিছু ভেবেছ?'

গলায় ঝুলে থাকা গামছাটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল বংশী। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'পঞ্চান্ন বছর বয়েস হল বাবু। মরা মায়ের দিব্যি খেয়ে বলছি, ড্রাইভারি ছাড়া কিছুই শিখিনি। আর ছেলেটার অবস্থাও তো দেখছেন। তার রোজগারের টাকায় যে বাকি জীবনটা কাটাব ভগবান সে উপায় রাখেননি। এখন ছোটবাবু যদি কাজে বহাল রাখে তো ভালো। নইলে অন্য কোথাও কাজ খুঁজতে হবে।'

'হুম, তা ছোটবাবু কেমন লোক?'

'ভালোই...তবে...' বলে ইতস্তত করতে লাগল বংশী।

ঝুঁকে এলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আরে আমাকে বলো না। কেউ জানতে পারবে না, এই আমার মরা মায়ের দিব্যি খেয়ে বলছি।'

বংশী বোধহয় একটু ভরসা পেল। গলাটা একটু নিচু করে বলল, 'ছোটবাবুর এমনিতে সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু মেজাজ বড্ড তেরিয়া। কাস্টমারদের সঙ্গে রোজ ঝামেলা লেগে আছে। ব্যবসাটা এখনও কোনওমতে চলছে বটে, কিন্তু ওই ব্যবসা ভোকাট্টা হতে দেরি নেই।'

'বুঝলাম। তুমি এখন এসো। দেখো, সুযোগ বুঝে তুমি আবার কোথাও ভোকাট্টা হয়ে যেও না যেন। তোমার ছেলেকে যাতে লকআপে মারধোর না করে সেটা এই বাবু দেখবেন বুঝলে।'

বংশী একগাল হেসে মনুজেন্দ্রকে যে প্রণামটা ঠুকল তার দামই লাখ টাকা!

কাজের মেয়ে মিনতি মণ্ডলের বয়েস তিরিশের নীচে। ছোটখাটো আঁটোসাটো চেহারা। চোখে সবসময় তিরিক্ষি ভাব। এসেই ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'একবার তো পুলিশকে যা বলার বললুম। একই কথা বারবার জিগ্যেস করার কী মানে শুনি? বলি আমার সময়ের দাম নেই? আমাকে দশ বাড়ি কাজ করে খেতে হয় না? কাজের কামাই হলে মিত্তিরবাড়ির বউদি যদি টাকা কাটে, তাহলে সেটা কে দেবে শুনি? তোমরা?'

মনুজেন্দ্র গম্ভীর গলায় বলল, 'বেশি চোপা করিস না মিনতি। যা জিগ্যেস করা হচ্ছে তার ঠিক ঠিক জবাব দে। নইলে লকআপ।

মিনতি বড়ই মুখরা। সে তেরিয়া হয়ে জবাব দিল, 'এই যে পুলিশঠাকুর, আমাকে লকআপ মকআপের ভয় দেখিও না, বুঝলে। আমার বর পার্টি করে, পার্টি, হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা...'

মনুজেন্দ্র কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল। মাঝখানে হাঁ-হাঁ করে পড়ে থামালেন প্রফেসর মুখার্জি। মনুজেন্দ্রর দিকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। তারপর মিনতির দিকে তাকিয়ে মধুর সুরে বললেন, 'আহা, চটছ কেন মা? ও এমনিই বলছিল। পুলিশ হল শিশু, তাদের কথায় রাগ করতে আছে? এই তো ক'টা কথা জিগ্যেস করেই তোমাকে ছেড়ে দেব। আজ মিত্তিরবউদি যদি টাকা কাটে তবে...' এই বলে নিজের মানিব্যাগ হাতড়ে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বার করে মিনতির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে এতেই কাজ চালিয়ে নিও মা। এতে হবে তো?'

মিনতি হাসিমুখে নোটদুটো ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে রাখল। মনুজেন্দ্র দাঁতের ফাঁকে কী একটা যেন বলল। মিনতি পাত্তা দিল না। প্রফেসর মুখার্জিকে উদ্দেশ্য করে হাসিমুখে বলল, 'বলুন জেঠু, কী জিগ্যেস করতে চান।'

মিনতির কথায় তেমন কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। সে ঠিকে ঝি-র কাজ করে বাড়ি বাড়ি। মজুমদার বাড়িতে কাজ করছে প্রায় বছর দশেক। বাড়িতে গিন্নিমা না থাকলে কী হবে, বাড়িঘর একেবারে তকতকে থাকত। বড়বাবু খুব ফিটফাট থাকতে, বাড়ির কোথাও ধুলময়লা তাঁর সহ্য হতো না।

বড়কর্তার খুন হওয়ার আগের দিন কী করছিল মিনতি?

কী আবার করবে? যেমন আসে তেমনই এসেছিল। মিনতি দিনে দুবার আসে। একবার সকালে, একবার বিকেলে। মনে করলে ওই পুলিশবাবু যেন খোঁজ নিয়ে দেখে। মিনতি বাউরি গরীব হতে পারে, কিন্তু গতর খাটিয়ে খায়।

পরের দিন সকালে ঘর মুছতে এসে মিনতি বড়কর্তার ঘরে ঠকঠক করে। এই বাড়ির বরাবর এই নিয়ম। আগে বড়কর্তার ঘর মোছা হবে, তারপর বাকি অন্য ঘর। আর বড়কর্তা জানলা দরজা বন্ধ করে শুতেন। দিনেমানেও পারতপক্ষে জানলা খুলতেন না। মিনতি এসে ঠকঠক করলে কত্তামশাই দরজা খুলতেন তারপর বাত্তুমে যেতেন।

সবসময় ঘরের দরজা জানলা বন্ধ রাখতেন কত্তামশাই?

হ্যাঁ, তাই রাখতেন, কারণ বাবু খুব সাবধানী মানুষ ছিলেন। টাকা দশবার গুণে দিতেন, নিতেনও গুণে। হুট করে কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। বাজারহাটে যেতেন না, সেসব করে দিত বংশীদাদা। কত্তাবাবু নিজের বই আর লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। দরকার না হলে বাড়ির বাইরে বেরতেনও না। বন্ধু বলতে এক ডাক্তারবাবু। তাঁকে ছাড়া তাঁর বড়কত্তার কোনও বন্ধুও ছিল না।

তাহলে তো মজুমদার মশাই খুব সাবধানী মানুষ ছিলেন বলতে হবে?

সে তো বটেই। আর সাবধান হওয়া কী খারাপ? এই যে মিনতির এত দুর্ভোগ, লোকের বাড়ি বাড়ি ঘর মুছে আর বাসন মেজে খেতে হয়, সে তো মিনতির বর এমন অসাবধানী, বেপরোয়া আর উলুইচণ্ডী বলেই না কি!

তা মিনতির এমন অসাবধানী, বেপরোয়া উলুইচণ্ডী বরটি পাট্টি করা ছাড়া আর কী করে শুনি?

মিনতির বরের নাম সন্তোষ। বাপ ছোট বয়সে মারা যাওয়ায় পড়াশোনা তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি। পাকা কাজ বলতে হাতে তেমন কিছু নেই। একটা ডেরাইভার সেন্টারে গাড়ি চালায়। এছাড়া কাজ বলতে এদিক-ওদিক টুকটাক কিছু করে। যেমন ঘর রঙ করা, গাড়ি বা বাইকের ছোটখাটো রিপেয়ারিং, তালাচাবি সারানো ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে মোটামুটি চলে যায়।

হুম। তা বড়বাবু মারা যাওয়ার দিন কী করছিল মিনতি?

সেদিন অনেক ঠকঠক করেও সাড়া না পেয়ে রান্নার মাসি শিউলিদি আর বংশীদাদাকে ডেকে আনে মিনতি। ছোটকত্তা তখন দাড়ি কাটছিলেন, চেঁচামেচি শুনে নেমে আসেন। সবাই মিলে অনেক ডেকেও সাড়া পায়নি। তারপরেই তো দরজা ভাঙতে হল। আর দরজা ভেঙেই তো দেখা গেল যে বড়বাবু মরে পড়ে আছে।

বলতে বলতে মিনতির চোখে জল চলে এল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।

মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন বড়কর্তা?

দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল মিনতি, 'ভগমান ছিলেন গো জেঠু, এক্কেবারে ভগমান। শরীলে রাগমাগ বলে কিছু ছিল না। পুজোর সময়ে কোনওদিন সস্তা শাড়ি দিতে দেখিনি। শুদু কি তাই? আমার দুই মেয়ের পড়াশোনা হল কোত্থেকে? উনি পড়াশোনা আর বই-খাতার খচ্চা দিতেন বলেই তো। অমন মানুষ আর হবেনি গো জেঠু।'

আর ছোটবাবু?

অপাঙ্গে মনুজেন্দ্রর দিকে তাকাল মিনতি। তেতো স্বরে বলল, 'এই পুলিশবাবুর মতো।'

মনুজেন্দ্র তেড়ে ওঠার আগেই মিনতিকে ঘরের বাইরে বার করে দিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপরেই খোলা দরজা দিয়ে এক বৃদ্ধা মহিলা ঘরে ঢুকলেন। বোঝা গেল ইনিই রান্নার মাসি শিউলিদি। বয়েস ষাটের ওপারে। পরনে সাদা শাড়ি। মুখেচোখে একটা আশঙ্কা। সেটা ভয়ও হতে পারে।

প্রফেসর মুখার্জি বেশ যত্ন করে বসালেন শিউলিদিকে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

শিউলিদির বাড়ি কাছেই, কালিঘাটে। মোটামুটি সম্পন্ন বাড়ির বউ। পড়াশোনায় রীতিমতো গ্র্যাজুয়েট। স্বামী কাজ করতেন একটা ছোট কারখানায়। মারা যান বছর বিশেক আগে, এক অ্যাক্সিডেন্টে। একমাত্র দুধের ছেলেকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েন শিউলিদি। তখন কোনওভাবে যোগাযোগ হয় মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গে। তিনি তার বছর দশেক আগে বিলেত থেকে ফিরেছেন। তিনিই আশ্রয় দেন অসহায়া মহিলাকে। সেই থেকে শিউলিদি এই বাড়ির রান্নার মাসি।

শিউলিদি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে হাজরার দিকে। একাই। একমাত্র ছেলের

বিয়ে দিয়েছিল ধুমধাম করে। ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে আগেই। সে নাকি এখন পাড়ার উঠতি ডন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিউলিদি। কপালে যদি ভগবান সুখ না লেখেন তাহলে সেই লিখন খণ্ডায় সাধ্য কার?

শিউলিদি সকাল আটটার মধ্যে মজুমদার বাড়িতে ঢোকে, বেরোয় রাত আটটার পরে। তার কোনও পিছুটান নেই। তাই এবাড়িতে বারো ঘণ্টার ডিউটি করতে তার অসুবিধা নেই। অসুস্থতা ছাড়া এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। বড়কর্তা তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন। এমনকী বাইরে কোথাও গেলে একসেট চাবি শিউলিকে দিয়ে যেতেন।

প্রফেসর মুখার্জির বুঝতে অসুবিধা হল না যে মজুমদার বাড়ির গিন্নির অভাবে শিউলিদিই হয়ে উঠেছিলেন সর্বময় কর্ত্রী।

মারা যাওয়ার আগের দিন কী করছিলেন শিউলিদি? মজুমদার সাহেবের আচার আচরণে অস্বাভাবিক কিছু নজরে এসেছিল?

ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবলেন মহিলা। তারপর আনমনে বললেন, 'কর্তা একবার ডাক্তারবাবুর বাড়ি গেছিলেন। সেখান থেকে আসার পর কর্তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কেন বলেননি। তারপর সুরেশবাবু এলেন। দুজনে কত্তাবাবুর ঘরে বসে অনেক কথাবার্তা বললেন। আমি চা জলখাবার দিলাম।'

'বসার ঘর থাকতে কত্তাবাবুর ঘরে কেন?'

'ওঁরা এ বাড়ির বাসিন্দাই ছিলেন একরকম।'

'সেদিন কী কথাবার্তা হচ্ছিল শুনেছিলেন কিছু।'

আঁচলের প্রান্ত দাঁতে ধরে কিছুক্ষণ ভাবলেন সেই বর্ষিয়সী মহিলা। তারপর বললেন, 'জলখাবার দিয়ে ফিরে আসার সময় শুনি কত্তাবাবু বলছেন, 'মরে গেলেও আমি তার খোঁজ দেব না সুরেশ। তাকে নীরব থাকতে দাও, এখন আর তাকে জাগাবার চেষ্টা কোরো না, তার ফল ভালো হবে না।'

'তারপর?'

'তারপর সুরেশবাবু চলে গেলেন। আমি রাত আটটা নাগাদ সবাইকে খাবার দাবার গুছিয়ে দিয়ে বাড়ি গেলাম। পরের দিন এসে...' কান্নার দমকে কথা শেষ করতে পারলেন না বৃদ্ধা মহিলা।

'বড়কর্তা কেমন মানুষ ছিলেন?'

শিউলিদি ম্লান হাসলেন, 'ভগবান কিছু কিছু ভালো মানুষ তৈরি করে ছাঁচ ভেঙে ফেলেন জানেন তো? বড়কর্তা ছিলেন তেমনই একজন। এই পোড়া জীবনে তো অনেক মানুষই তো দেখলাম। কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না।'

শিউলিদি বেরিয়ে গেলে মনুজেন্দ্র প্রশ্ন করল, 'আমাদের নেক্সট মুভ কী হবে স্যার?'

হাই তুললেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'মনোজ বলেছিল এদের প্রত্যেকের ওপর ওয়াচ রাখা হচ্ছে। তুমি সে ব্যাপারে খোঁজ নাও। এদের পাড়া প্রতিবেশিদের সঙ্গে কথা বল। আমার মাথায় একটা সম্ভাবনা এসেছে। সেটা যাচাই

করে দেখতে চাই। আর ওই নার্স ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলা যায় কবে? জবানবন্দি কবে নেবে?'

'সকালে বার দুয়েক ফোন করেছিলাম। বারবার কল কেটে দিচ্ছেন।'

'স্বাভাবিক। একবার আটক হয়েছেন। দ্বিতীয়বার ট্রু-কলারে পুলিশের নাম্বার দেখে ফোন না তোলাটাই স্বাভাবিক। তুমি একবার ওঁর বাড়ি যাও, বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখা করতে রাজি করাও। ঠিকানা নিশ্চয়ই পুলিশের ডায়েরিতে আছে। ডাক্তার সরকারের তো জবানবন্দি নেওয়া হয়নি বললে।'

মাথা নাড়ল মনুজেন্দ্র, 'নাহ্, তার আগেই ইনস্পেকটর মুৎসুদ্দির কাছ থেকে কেসটা আমার হাতে চলে আসে।'

'দুজনের জবানবন্দি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ওর ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। কাল তুমি নার্স ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বল। আমি একবার ডাক্তার সরকারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি বরং।'

মনুজেন্দ্রর মুখ দেখে মনে হল কথাটা তার ঠিক পছন্দ হল না। প্রফেসর মুখার্জি স্নেহস্বরে বললেন, 'আরে বাবা, আমরা তো একটাই টিম। দুজনে প্যারালাল প্রসেসিং করলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়। আমাদের মধ্যে তো তফাত তেমন কিছু নেই। তাহলে আর দুটো ইকোয়াল ক্যালিবারের ম্যানপাওয়ার এক জায়গায় আটকে রাখা কেন?'

চওড়া হাসল মনুজেন্দ্র। সেই দেখে মুখটা হাসি হাসি করে প্রফেসর মুখার্জি বলেন, 'আজকের লাঞ্চটা তাহলে পিটার ক্যাটেই হোক? নাকি মোকাম্বো?'

* * *

কিন্তু এত প্ল্যান প্রোগ্রাম সত্ত্বেও কেসটা হিসেব মতো এগোল না। ডাক্তার সরকার স্রেফ না করে দিলেন।

মোবাইলটা কেটে প্রফেসর মুখার্জি হতাশ সুরে বললেন, 'আজকের হাফ ডে তো একেবারে বরবাদ গেল হে। বিকেলের আগে কোনও অ্যাকশন নেই। তা তোমার লোকজন কিছু খবর পেল মজুমদার বাড়ির বাসিন্দাদের ব্যাপারে?'

কথা হচ্ছিল প্রফেসর মুখার্জির বাড়িতে বসে। দিনটা শনিবার। প্রফেসর মুখার্জি ইতিমধ্যেই একটা বাকার্ডির বোতল খুলে বসেছেন। সঙ্গে মস্ত প্লেটে শশা আর গাজরের টুকরো। সেখান থেকে মনুজেন্দ্র একটা শশার টুকরো মুখে ফেলে বলল, 'এসব খবর কি আর এক রাতের মধ্যে পাওয়া যায় স্যার, ধৈর্য ধরতে হয়। লোক লাগিয়েছি, আশা করছি কাল সন্ধের মধ্যে সব পাত্তা পেয়ে যাব।'

'গুড, গুড।'

মনুজেন্দ্র হেসে একটা কিছু বলতে যাচ্ছে, এমন সময় প্রফেসর মুখার্জির ফোন বেজে উঠল। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'চিন্তাহরণ মুখার্জি স্পিকিং।'

তারপর মিনিটখানেক ভুরু কুঁচকে শুধু শুনে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর

কলটা কেটে বললেন, 'বেরোতে হবে হে। পার্ক স্ট্রিটে একটা লাঞ্চের নেমন্তন্ন এসেছে, না গেলেই নয়। তুমি বরং যা-যা খোঁজ খবর করতে বললাম তার ব্যবস্থা করো। আর ওই সিসিটিভির ফুটেজটা খুঁটিয়ে দেখে গাড়িটার নাম্বারটা বার করো। বিকেলে আমরা মিট করছি। প্রমিত মজুমদারের জবানবন্দিটা নেওয়া বাকি আছে।'

মনুজেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে তো বুঝতে পারলাম। কিন্তু এই হঠাৎ নেমন্তন্নটা করল কে?'

প্রফেসর মুখার্জি মাথা নেড়ে বললেন, 'নামটা জানাতে পারি বটে, কিন্তু তুমি কি চিনবে?'

'আপনার পার্সোনাল কেউ হলে অবশ্য...'

'না হে বাপু। আমার পার্সোনাল কেউ না। ইন ফ্যাক্ট এই ফোনটা আসার আগে লোকটাকে আমি চিনতামও না। তবে তুমি চিনবে আশা করি।'

মনুজেন্দ্র খানিকক্ষণ বিস্মিতচোখে চেয়ে থেকে বলল, 'আমি চিনব? কে শুনি?'

'সুরেশ আগরওয়াল।'

'কে সুরেশ আগরওয়াল?'

প্রফেসর মুখার্জি একবার রাগের দৃষ্টিতে তাকালেন মনুজেন্দ্রর দিকে। তারপর গট গট করে গাড়িতে উঠে বসলেন।

* * *

'আপনাদের সঙ্গে আমার মিটিংটা যেন সিক্রেট থাকে মিস্টার মুখার্জি। আমি চাই না আমাকে নিয়ে পুলিশ টানা হেঁচড়ে করুক। হাজার হোক, সোসাইটিতে আমার একটা ইজ্জত আছে।'

মৃদু হাসলেন সুরেশ আগরওয়াল। তাঁর ফর্সা ভারী গালে, নুনমরিচ চুলে, সোনার ডাঁটিওয়ালা চশমার কাচে, দামি পারফিউমের সুবাসে বোঝা যায় যে তিনি সমাজের যে স্তরে বিচরণ করেন, সেখানে সবার প্রবেশের অনুমতি নেই।

কথাটা হচ্ছিল পার্ক স্ট্রিটের খানদানি রেস্তোরাঁয় বসে। প্রফেসর মুখার্জি বাকার্ডি কন্টিনিউ করছেন, উইথ লাইম। সুরেশ আগরওয়াল একটা জিন উইথ টনিক। চেলো কাবাব আসতে এখনও মিনিট দশেকের দেরি। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে।

প্রফেসর মুখার্জি নিরাসক্তস্বরে বললেন, 'হুঁ, বুঝলাম। এবার বলুন তো, কী বলার জন্য ডেকেছেন। বাকার্ডি দিয়ে চেলো কাবাব খাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নয়।'

একটা লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করলেন সুরেশ। জিনের প্রভাবে এখন গালদুটো সামান্য লাল। চশমা খুলে কপাল টিপে কিছুক্ষণ বসে রইলেন তিনি। তারপর নিজের কথা বলতে লাগলেন।

রক্ষণশীল মাড়োয়ারি পরিবারের ছেলেরা সচরাচর মায়ের পেট থেকে পড়েই ব্যালান্স শিটের আঁক কষতে শেখে। সুরেশ আগরওয়াল যে কী করে আঁকতে

শিখলেন খোদায় মালুম। তবে সুরেশের বাবা রাধেশ্যাম আগরওয়াল ছিলেন উদার মনের মানুষ। ছেলের ইচ্ছেয় বাধা দেননি। গোল বাধল সুরেশ যখন আর্ট কলেজে পড়ছেন। সবে একবছর হয়েছে, এমন সময় একদিন রাধেশ্যাম তাঁর বড়বাজারের গদিতে দুপুরের লাঞ্চ শেষ করে এলিয়ে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পাওয়া যায়নি।

সুরেশ ছিলেন একমাত্র ছেলে। তাঁকেই ব্যবসার হাল ধরতে হল। আর্ট কলেজে পড়াশোনার ওখানেই ইতি। তবে সেইসূত্রে পাওয়া কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বহুদিন আলাপ ছিল। বরেন মজুমদার তাদেরই একজন। প্রফেসর মজুমদার বিলেত থেকে ফেরত আসার পর সেই বন্ধুত্ব আরও ঘন হয়। সুরেশ আগরওয়াল ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেও ছবির নেশা ছাড়তে পারেননি। দেশি-বিদেশি বহু নামীদামি চিত্রকরের আঁকা ছবি তাঁর সংগ্রহে আছে। আর সেসবে তাঁকে উৎসাহ দিতেন বরেন মজুমদার।

'আমার কাছে অরিজিনাল রবি ভার্মা থেকে শুরু করে যামিনী রায়, এম এফ হুসেন, গণেশ পাইন, তৈয়াব মেহতা, সতীশ গুজরাল, মনজিৎ বাওয়া সবই আছে। বিদেশি পেইন্টিংও আছে কিছু। তবে সেসবের অরিজিনাল কমই। যা আছে বেশিরভাগই ট্রু কপি। তবে তারও তুলনা নেই। দু-একটা নমুনা দেখবেন?'

'বলেন কী মশাই? নিশ্চয়ই দেখব।'

হাতের আইপ্যাডটা খুলে কয়েকটা ক্লিক করলেন সুরেশ আগরওয়াল। ছবির গ্যালারি খুলে গেল। প্রথম ছবিটা একটা বিদেশি যুদ্ধের ছবি। তার গায়ে সযত্নে হাত বুলিয়ে বললেন, 'উজেন দেলাক্রোয়া। ফরাসি আর্টিস্ট। মাস্টার অফ কালার। ছবির নাম ব্যাটল অফ ন্যান্সি।'

তার পরের ফ্রেমটা তিনটে ছবির সমাহার। একটায় একজন বিদেশি পোশাক পরা মেছুনি চিংড়ি মাছ বিক্রি করছে, আরেকটায় একজন পুলিশ মাছ কিনে পয়সা দিচ্ছে না, তৃতীয়টায় মেছুনি সেই পুলিশটাকে তাড়া করে যাচ্ছে। সুরেশ আগরওয়াল বললেন, 'উইলিয়াম হোগার্থ। ব্রিটিশ শিল্পী।'

তৃতীয় ছবিটা অদ্ভুত, অথচ নয়নাভিরাম। কালচে বাদামি রঙে কয়েকখানি জ্যামিতিক আকার অতি উৎকৃষ্টরূপে চিত্রিত। তারই মধ্যে একটা শীতল ধাতব বন্যতা ফুটে ফুটে উঠেছে। সুরেশ আগরওয়াল বললেন, 'জর্জ ব্রাক।' তারপর আইপ্যাড বন্ধ করে বললেন, 'আরও আছে। মাতিস, সেজান, গোইয়া, কনস্টেবল, মূরীল্লো, ক্লদ মোনে, রেনোয়া। সবই ট্রু কপি।'

চেলো কাবাব খেতে খেতে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'এঁদের নাম শুনেছি বটে। সবাই ওয়ার্ল্ড ফেমাস আর্টিস্ট। এবার বলুন তো, আমাকে নেমন্তন্ন করার কারণটা কী? ভর দুপুরে আর্টের আলোচনা করার জন্য নিশ্চয়ই না।'

'না প্রফেসর মুখার্জি। আপনারও সময়ের দাম আছে, আমারও। কাজের কথায় আসি শুনুন। বরেনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়েছেন। আমার ইয়ার দোস্ত বলে বলছি না, মানুষ হিসেবে বরেনের তুলনা হয় না। শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। অমায়িক ভদ্র ব্যবহার, কাউকে কোনওদিন খারাপ কথা বলতে

শুনিনি। জমিদারবাড়ির ছেলে তো, আভিজাত্য বজায় ছিল পুরোমাত্রায়।

এত কিছু সত্ত্বেও বরেনের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। বরেনের স্ত্রীর নাম ছিল রমা। বরেন মুখ ফুটে না বললেও আমরা বুঝতাম যে রমার সঙ্গে ওর বনিবনা ছিল না। বরেন যখন লন্ডন যায় পড়াতে, একাই গেছিল। রমা আর প্রমিত দেশে থেকে যায়। প্রমিতের বয়স তখন চোদ্দো কী পনেরো।

বরেন দেশে ফেরার পরপরই রমা মারা যায়। বরেন আর বিয়ে করেনি। আমি তখন প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম। বুঝতাম যে বাপ-ব্যাটায় বিশেষ বনিবনা নেই। এমন নয় যে দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতো। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা কোল্ড ব্যাপার ছিল। কেউ কাউকে ঘাঁটাত না। কেউ কারো লাইন ক্রস করত না। তবে প্রমিত ছেলে হিসেবে অতি চমৎকার।

যাক সে কথা। এবার কাজের কথায় আসি।

আপনি জানেন নিশ্চয়ই বরেন মারা যাওয়ার বেশ কয়েকদিন আগে ওর লাইব্রেরিতে একটা বই চুরি হয়। বরেন সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। যেটা জানেন না সেটা এবার আপনাকে দেখাই।'

সুরেশ আগরওয়াল নিজের পকেট থেকে তিনটে ভাঁজ করা কাগজ বের করে প্রফেসর মুখার্জির দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রফেসর মুখার্জি এক এক করে তিনটে কাগজ খুললেন। তিনটে কাগজে তিনটে বাদ্যযন্ত্রের ছবি। প্রথমটায় একটা পিয়ানো। দ্বিতীয়টায় একটা ভায়োলিন, তৃতীয়টায় একটা স্যাক্সোফোন।

'বইটা চুরি হওয়ার ঠিক তিনদিন আগে এই তিনটে চিরকুট পাঠানো হয় বরেনকে। কেউ ওদের ডাকবাক্সে ফেলে গেছিল। আজকাল ইমেইল ইত্যাদির যুগে চিঠিচাপাটি কেউ পাঠায় না যদিও, তবুও ওদের মেইন গেটে পুরোনো ডাকবাক্সটা লাগান ছিল। খবরের কাগজওয়ালা সেখানে কাগজ গুঁজে রেখে যেত। সেখানেই পাওয়া যায় এই তিনটে চিরকুট।'

'হুম। কিন্তু এই তিনটে ছবির মানে কী?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন সুরেশ, 'বলতে পারব না মিস্টার মুখার্জি। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই তিনটে চিরকুট পেয়ে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল বরেন। কাউকে জানায়নি, শুধু আমাকে ছাড়া। এমনিতেই ও খুব সাবধানী মানুষ। একটু ভিতুও বটে। কিন্তু এর পর থেকে যেন একটা আতঙ্কে ভুগত।'

'কিন্তু ভয়টা কী নিয়ে সেটা বলেননি আপনাকে?'

'নাহ্, আমি অনেক চাপাচাপি করেছিলাম বটে। কিন্তু কিছুই বার করতে পারিনি। শুধু একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, সিজারের প্রাপ্য যে একদিন সিজারকে ফিরিয়ে দিতেই হয় সেটা ভুলে গেছিলাম সুরেশ।'

দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর সুরেশ আগরওয়াল বললেন, 'এটাও বোধহয় বরেনের ধাঁধার মতোই একটা আনসলভড মিস্ট্রি থেকে যাবে।'

'বরেনের ধাঁধা?'

'সে কী! প্রমিত বলেনি আপনাকে?'

'না তো।'

'বরেন একটা ছড়া বানিয়েছিল। আমাকে, প্রমিতকে, কাছের আরও অনেককে ধরে ধরে মুখস্থ করিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলত, আমি মারা গেলে এই ছড়াটা আবৃত্তি কোরো। আমার কথা মনে পড়বে।'

বলতে বলতে গলাটা ধরে এল সুরেশ আগরওয়ালের।

'কী ছড়া?'

গলাটা খাঁকরে আবৃত্তি করলেন সুরেশ আগরওয়াল, 'আলমারিময় ছড়িয়ে আছে বিখ্যাত সব কেতাব/ দশের বেশি দুই পেয়েছে সেখুপীরের খেতাব। তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে মস্ত খনি গানের, মীড়ের টানে ভারী সে-গান যেন করিম খানের!'

* * *

'ছড়াটার মানে কী, স্যার?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল মনুজেন্দ্র।

'কিছুটা পারছি ভায়া, কিন্তু বাকিটা তো বুঝতে পারছি না।' ভুরু কুঁচকে সামনে তাকিয়ে স্বগোতক্তি করলেন প্রফেসর মুখার্জি।'

'কী কী বুঝতে পারলেন?'

খানিকক্ষণ চলন্ত গাড়ির উইন্ডশিল্ডের দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর চিন্তিত স্বরে কেটে কেটে বললেন, 'যেটা বুঝতে পারছি সেটা খুব সুবিধার নয় হে। পুরো ঘটনাটাই আরও ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে।'

'কীরকম?'

'কবিতাটা উনি ওঁর কাছের লোকেদের মুখস্ত করিয়েছিলেন। বলেছিলেন উনি মারা গেলে এই ছড়াটার সূত্রে লোকে ওঁকে যেন মনে রাখে। কেন?'

'হয়তো উনি আশঙ্কা করছিলেন যে উনি খুনটুন হতে পারেন। আর খুন হলেও যাতে লোকে ওঁকে মনে রাখে, তাই হয়তো এই ছড়াটা মুখস্ত করিয়ে রেখেছিলেন?'

'ধুৎ! যুক্তিটা বড়ই বাজে শোনাচ্ছে মনু। উনি তো স্বাভাবিক ভাবেও মারা যেতে পারতেন। ওঁর কাছের লোকেরা ওঁকে এমনিতেই মনে রাখত। ধরে ধরে ছড়া মুখস্ত করাবার মানেটা কী?'

'কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'সেটাই তো লাখ টাকার কোশ্চেন মনু। ভুলে যেও না, এখনও অবধি আমরা একটা গুরুতর বিষয়ে আলোচনাই করিনি। মোটিভ। কে খুন করতে পারে জানার সবচেয়ে বড় রাস্তা হল খুনটা কেন হল। বিশেষ করে খুনি যখন সিরিয়াল কিলার নয়।'

'আপনার কী মনে হয়, এই ছড়ার সঙ্গে ওঁকে খুন করার মোটিভের কোনও সম্পর্ক আছে?'

'আশ্চর্য নয় মনু। ভেবে দেখো, আমি খুন হতে পারি, এ কথাটা লোকে সোচ্চারে বলে, ছড়া কেটে লিখে যায় না। এইভাবে সাংকেতিক ছড়া লোকে কখন কাটে জানো? যখন তার মধ্যে কোনও কিছু উদ্ধারের চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকে। ভাবটা এমন, দেখো বাপু, আমার কাছে এমন কিছু একটা আছে যার সন্ধান শুধু আমি জানি। সেটা এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছি যে আমি মারা গেলে তার খোঁজ পাওয়া মুশকিল। আমি চাই জিনিসটা উদ্ধার হোক, কিন্তু সেটা যেন কোনও টম ডিক হ্যারির হাতে না পড়ে। তাই এই সাবধানতা।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, বরেন মজুমদারের কাছে এমন কিছু একটা লুকোনো ছিল যেটা বেশ দামি। এবং সেটার জন্যই তাঁর প্রাণ গেছে। এখন কথাটা হচ্ছে যে সেটা কী! এবং কারা তার পেছনে পড়েছে।'

কথা বলতে বলতে মজুমদার ভিলা এসে গেল। দুজনে গাড়ি পার্ক করে ভেতরে গেলেন। প্রমিতেন্দ্র ওঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

* * *

ছড়াটা শুনে প্রমিতেন্দ্র হেসে ফেললেন, 'এটার খোঁজ পেলেন কোথা থেকে?'

'সে বাদ দিন। ধরে নিন তদন্ত করতে করতে পেয়েছি। এটা আপনার বাবা কবে লেখেন বলতে পারবেন?'

'বিলেত থেকে ফেরার পর। ইনফ্যাক্ট বেশ কয়েক বছর পর। কেন বলুন তো?'

'আপনার বাবা বিলেত যান কবে?'

'অষ্টআশির মাঝামাঝি। আমি তখন এইটে পড়ি। এখানে বলে রাখা ভালো, বাবা বিদেশে একাই গেছিলেন। আমি আর আমার মা দেশ ছেড়ে যেতে চাইনি। বাবা অবশ্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।'

'উনি দেশে ফেরেন কবে?'

'বাবা দেশে ফেরেন উনিশশো বিরানব্বুই নাগাদ। ফিরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি নিলেন। আরও নাম ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন কলেজে ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দেওয়ার ডাক আসতে লাগল। তখন বাবাকে দেখেছি অনেক গভীর রাত অবধি লাইব্রেরি ঘরে বসে বই পড়তে। শখের মধ্যে চুরুট খেতেন খুব আর টুকটাক ছবি আঁকা।

এমন সময় একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটে। বাবা গাড়িতে করে বর্ধমান যাচ্ছিলেন কোনো একটা কাজে। গাড়িটা মেমারির কাছে একটা ছোট অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে। তেমন গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু বাবা একটু শকড হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই এই ছড়াটা লেখেন। আর আমাকে বলেন মুখস্থ করতে। শুধু আমাকে নয়, ডাক্তার সরকার, সুরেশ আঙ্কেল, অনেককেই মুখস্ত করান।'

'আপনার অবাক লাগেনি?'

'তা লেগেছিল বটে। বাবা কবিতা-টবিতা বিশেষ লিখতেন না। হঠাৎ করে এই ছড়াটা কেন লিখলেন আর আমাদের মুখস্তই বা করতে বললেন কেন সেটা বোধগম্য হয়নি।'

'আপনার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেননি?'

'নাহ্। বাবা বেশ রাশভারি লোক ছিলেন। প্রয়োজনের বাইরে কথা বলতেন না। আমি একটু ভয়ই পেতাম ওঁকে। তাই এসব নিয়ে ওঁকে কোনও প্রশ্ন করার আমার সাহস হয়নি। তবে এই একটা বালখিল্য ছড়াকে আপনারাই বা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'হুম।' ফের গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি।

মনুজেন্দ্র উশখুশ করছিল। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে প্রফেসর মুখার্জি বললেন, 'প্রমিতবাবু অ্যালাও করলে সিগারেটটা তুমি এখানেও খেতে পারো মনু। অনেকক্ষণ যে তাম্বাকুসেবন হয়নি সে বুঝতেই পারছি।'

প্রমিতেন্দ্র একগাল হেসে বললেন, 'বাঁচালেন প্রফেসর মুখার্জি। ও জিনিস ছাড়া আমিও বেশিক্ষণ থাকতে পারি না।' বলে পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিলেন মনুজেন্দ্রর দিকে, 'এই ব্র্যান্ড চলে তো?'

মনুজেন্দ্রর চোখ চকচকে করে উঠল, 'বাব্বা! বেনসন অ্যান্ড হেজেস? চলবে না মানে?'

সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রমিতেন্দ্র বললেন, 'তবে আসল বেনসন হেজেসের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।'

'কীরকম?' মনুজেন্দ্র উৎসুক।

'এসব তো দিশি মাল। এখানেই তৈরি হয়। এ আসলে বিলেতের কম্পানি জানেন তো? বাবা চলে আসার সময় বেশ কয়েক কার্টন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। মাঝেমধ্যে সেখান থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে দু-একটা খেতাম। আহা, সে স্বাদের তুলনাই হয় না। বন্ধুবান্ধবদের বিলিয়েছিও কম নয়। বাবা বোধহয় এই চুরির ব্যাপারটা বুঝতেন। তবে তাঁর শখ ছিল চুরুট, তাই বোধহয় কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে সিগারেট চুরি নিয়ে কিছু বলেননি।'

'তাই? ভেরি ইন্টারেস্টিং,' প্রফেসর মুখার্জি হঠাৎ এদিকে ঘোরেন, 'তা বরেনবাবু বিলেত থেকে ফেরার সময় বেনসন হেজেস ছাড়া আর কিছু আনেননি?'

'সে আর বলতে। এনেছিলেন বেশ কিছু জিনিস। তাদের মধ্যে ঘর সাজানোর শৌখিন জিনিসই বেশি। তাদের দামও কম নয়। তার বেশ কিছু এই ঘরেই আছে।'

চকিতে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'এছাড়া? আর কিছু? এমন কিছু এনেছিলেন যেটা তিনি সবার সামনে দেখানো পছন্দ করতেন না?'

'তেমন কোনও কিছুর কথা তো মনে পড়ছে না প্রফেসর।'

শিউলিদি চায়ের কাপ প্লেট তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই কথা শুনে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওই প্যাকেটটার কথা বললেন না তো ছোটকত্তা?'

যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনভাবে প্রমিতেন্দ্র হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'আরে হ্যাঁ, তাই তো। একটা তিন ফুট বাই দু-ফুট লম্বা মতো প্যাকেট ছিল বটে, যেটা তিনি কাউকে দেখাতেন না।'

শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'কী সেটা?'

'বলা মুশকিল।' হাত উল্টে বললেন প্রমিতেন্দ্র, 'বললাম যে, বাবা খুব রাশভারি লোক ছিলেন। আমরা কী কেন এসব জিজ্ঞাসা করার সুযোগই পাইনি।'

'এখন কোথায় আছে সেটা?'

'সেটা বলা আরও মুশকিল। এককালে ছিল আমাদের লকারে। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে বাবা ওটা বার করে আনেন।'

'তারপর?'

'তারপর ওটাকে আর দেখিনি।'

গাড়িতে উঠে মনুজেন্দ্র বলল, 'এবার তাহলে আমাদের কী করণীয় আছে স্যার?'

'আছে মনু, অনেক কিছু করার আছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা হাল্কা হলেও আলোর দিশা দেখতে পাচ্ছি।'

'আলোটা কীরকম একটু বলবেন?'

'এই ধরো সাত ওয়াট এলইডি বাল্বের মতো। ওয়ার্ম হোয়াইট।'

'আহ্, আমি তা বলিনি।' ব্যাজার হল মনুজেন্দ্র, 'বলি আমরা কোন বুনো রাজহাঁসের পেছনে দৌড়চ্ছি সেটা জানা গেল কি?'

'না, তা জানা যায়নি। তবে ছড়ার ওই লাস্ট হাফটা...তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে মস্ত খনি গানের, মীড়ের টানে ভারী সে-গান যেন করিম খানের...এই হেঁয়ালিটা সমাধান করতে পারলেই তার একটা হিল্লে হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'আপনার ওই ছড়াটা একবার শুনেই মুখস্ত হয়ে গেছে স্যার?' আমি তো ফার্স্ট লাইনটাই মনে করতে পারছি না।'

সামান্য ঝুঁকলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'থ্যাঙ্কস ফর ইওর কাইন্ড ওয়ার্ডস।'

গাড়ি তখন ভবানীপুর ছাড়িয়ে এক্সাইডের মোড়ে।

'তাহলে আমাদের নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন কী হবে স্যার?'

'ডক্টর সরকারের চেম্বার কড়েয়ার আশেপাশে কোথাও। আমাকে সেখানে নামিয়ে দাও। ওঁর সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। আর তুমি নার্স মেয়েটির কাছে চলে যাও। মহিলার সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি।'

'আচ্ছা স্যার, আপনি ডাক্তার সরকারকে সন্দেহ করছেন না তো?'

'সেটা তো ওঁর সঙ্গে কথা না বলে বলতে পারব না ভাই। তবে একটা কথা বলে রাখি, সন্দেহ অনেককেই করছি। তার কারণও আছে।'

'এমনকী প্রমিত মজুমদারকেও?'

'অবশ্যই মনু। ভেবে দেখো, বরেন মজুমদার বিলেত থেকে ফিরলেন একটা তিন ফুট বাই দু ফুট প্যাকেট নিয়ে। সেটাতে কী আছে কেউ জানে না। সেটা রেখেছিলেন ব্যাঙ্কের লকারে। খুন হওয়ার আগে সেটা তুলে আনলেন নিজের কাছে।

হোয়াই? লকারে রাখতে তাঁর কী অসুবিধা হচ্ছিল?'

'আপনার কী মনে হয়, উনি আশঙ্কা করেছিলেন যে প্যাকেটটা লকারেও সুরক্ষিত নয়?'

'নিশ্চয়ই। এবং কার থেকে সুরক্ষিত নয়? ওই লকারে তিনি ছাড়া অন্য যাঁর অ্যাক্সেস আছে তাঁর থেকে সুরক্ষিত নয়। লকার সাধারণত বরেন মজুমদার আর প্রমিত মজুমদারের জয়েন্ট লকার। সেটা আন্দাজ করতে তোমার আপত্তি আছে?'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন বরেন মজুমদার কোনও কারণে তাঁর ছেলেকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন, তাই তো?'

'স্বাভাবিক মনু। নইলে তুমিই বল, লকারে অমন একটি রহস্যময় প্যাকেট, সেই প্যাকেট বরেন মজুমদার হঠাৎ করে লকার থেকে তুলে আনলেন। তারপরেই বরেন মজুমদার খুন হলেন। খুনের পর থেকে প্যাকেটের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না! এটা প্রমিতবাবু কেমন ক্যাজুয়ালি বললেন লক্ষ্য করেছ?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ প্রমিতবাবু ডাহা মিথ্যা বলেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা, ওই প্যাকেটে কী আছে সেটা তিনি এক্স্যাক্টলি না জানলেও তাতে যে বহুমূল্য কিছু একটা আছে সেটা আন্দাজ করতে পারছেন। ভুলে যেও না মনু, প্রমিত মজুমদার বাপের মতো প্রফেসর নন। তিনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, লোক চরিয়ে খান। সম্ভবত সেই সূত্রেই বুঝতে পারেন যে ওই ছড়াটা খামখেয়ালের ফসল নয়। তার সঙ্গে ওই প্যাকেটের যোগাযোগ আছে। তাই এই ছড়া বা ওই প্যাকেটের কথাটা চেপে যাচ্ছিলেন।'

'আপনার যুক্তিটা পাড়ার কুঁদুলে মাসিমাদের মতো শোনাচ্ছে স্যার। ফুল গ্যাস। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীও এর থেকে বেশি লজিক্যাল।'

'আমাদের হাতে আর কীই বা আছে বল মনু?' হাত ওল্টালেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আপাতত সবই আন্দাজ আর থিওরি। তাও আদ্ধেক ডেটা এখনও পাইনি। তোমার লোকজন বরেন মজুমদারের কর্মচারীদের ব্যাপারে কী খবর আনল জানি না। ডাক্তার সরকার আর সেই নার্স মহিলার জবানবন্দি নেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় বায়বীয় যুক্তির জাল বিছনো ছাড়া আমার আর কীই-বা করার আছে! আরে আমার ইন্টেলিজেন্ট ব্রেনের খাদ্য বলতে কিছু তো চাইরে ভাই।'

'ইয়ে, নিজেকে ইন্টেলিজেন্ট বলাটা একটু অহঙ্কার করা হয়ে গেল না স্যার?'

'সরি মনু। বলতে বাধ্য হচ্ছি, নইলে তোমার ডিপার্টমেন্ট সমস্ত জটিল কেসে আমার সাহায্য চাইতে ছুটে আসত না!'

মনুজেন্দ্র নাকের মধ্যে দিয়ে শুধু একটা ঘোঁৎ শব্দ করল।

* * *

ডাক্তার সরকার অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'চেম্বার বন্ধ হয়ে গেছে। কাল আসুন।'

প্রফেসর বললেন, 'আরে না না, আমি চিকিৎসা করাতে আসিনি। দুটো কাজের কথা বলেই চলে যাব।'

সরকার ডাক্তার সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'কী কথা?'

'বরেন বাবুর মৃত্যু নিয়ে দুটো কথা জিগ্যেস করার ছিল ডাক্তারবাবু। যদি অনুমতি দেন তো পেশ করতে পারি।'

ডাক্তার সরকার মুহূর্তে রুদ্রমূর্তি ধরলেন, 'আবার আমার কাছে কেন? আমি তো বলেইছি যা বলার দরকার হলে কাঠগড়ায় উঠে বলব, তার আগে কাউকে কিচ্ছুটি বলব না। আর যদি বেশি কিছু জানতে চান তো আমার উকিলের ফোন নাম্বার দিচ্ছি, কথা বলে নিন।

প্রফেসর মুখার্জি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আরে, না, না। আপনার কাছে কি আর জবানবন্দি নিতে এসেছি স্যার? আপনি সিনিয়র লোক, এই কেস নিয়ে দুটো পরামর্শ যদি দিতে পারেন, সেই শুনতেই আসা।'

ভুরু কুঁচকে ডাক্তার সরকার জিগ্যেস করলেন, 'তা পরামর্শটাই বা আপনাকে দিতে যাব কেন মশাই? আপনি কে?'

বিনয়ে গলে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আর বলবেন না স্যার। অধমের নাম চিন্তাহরণ মুখার্জি। ছাত্তর পড়িয়ে খাই। অবরে সবরে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করি, এই আর কি! আমাকে তেমন কেউকেটা ভাববেন না দয়া করে।'

ডাক্তার সরকার সামান্য বাঁকা হেসে বললেন, 'টিকটিকি বুড়ো হলে কী হবে, কথায় রস আছে দেখছি।'

প্রফেসর মুখার্জি কথাটা গায়ে মাখলেন না। তিনি এককালে সেলসে কাজ করেছেন। দুটো কড়া কথা শুনতে পারেন, দরকার হলে দুটো কড়া কথা শোনাতেও পারেন। তবে তিনি মিষ্টি কথায় লোকজনকে বশে আনাই প্রেফার করেন বেশি। দরকার হলে অন্য দাওয়াই তো রইলই!

তবে অন্য দাওয়াইয়ের দরকার হল না। প্রফেসর মুখার্জির ভোকাল টনিকের এলেম আছে বটে। পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল ডাক্তার সরকার প্রসন্নমুখে গড়গড় করে নিজের ছোটবেলার কথা বলে চলেছেন।

ডাক্তার হরগোবিন্দ সরকার আর বরেন মজুমদার একেবারে স্কুলবেলার বন্ধু, যাকে বলে চাড্ডিবাডি। বড় হয়ে দুজনের রাস্তা আলাদা হলে কী হবে, বন্ধুত্বে এতটুকু চিড় ধরেনি। এমনকী বরেন মজুমদার বিলেতে পড়াতে যাওয়ার সময়েও ডাক্তার সরকার এয়ারপোর্টে গেছিলেন বন্ধুকে সিঅফ করতে। দুজনের মধ্যে চিঠিচাপাটি লেগেই থাকত।

চিঠিতে কী কী লিখতেন বরেনবাবু?

বিলেতের আবহাওয়া, লোকজন, কাজের ধরন, এইসব নিয়েই। নানা মজাদার, আকর্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য ঘটনাও লিখে পাঠাতেন। বরেনের লেখার হাত খুবই ভালো, হাজার হোক মিত্র ইনস্টিটিউশনের ফার্স্ট বয়। ইংরেজির ওপর দখল থাকবেই। দু-একটা নমুনা দেখবেন নাকি মুখার্জিসাহেব? ডাক্তার সরকারের আবার একটা অভ্যেস আছে, ওঁকে লেখা যে কোনও চিঠি জমিয়ে রাখার। রীতিমতো ফাইল করে। তবে সবই হাতে লেখা চিঠি। ইমেইল জমানোর জন্য তো মেলবক্সই আছে।

প্রফেসর মুখার্জি সৌজন্যবশত দু-একটা নমুনা দেখতে চাইলেন। ডাক্তার সরকার উঠে গিয়ে গোটা পাঁচেক চিঠি নিয়ে এলেন। ডানহাতে গোটা চারেক চিঠি, বাঁহাতে একটি।

আগে চারটি চিঠি পড়লেন প্রফেসর মুখার্জি। সবই প্রবাসের দিনলিপি। ছোট ছোট ঘটনা, ব্যক্তিগত ভাবনা চমৎকার ইংরেজিতে তুলে ধরেছেন সদ্যমৃত বরেন মজুমদার।

বাঁহাতের চিঠিটি এগিয়ে দিলেন ডাক্তার সরকার, 'এইবার এইটা পড়ে বলুন তো বুড়ো টিকটিকি, এর মধ্যে কোনও রহস্য খুঁজে পান কী না।'

চিঠিটার তারিখ দেখলেন প্রফেসর মুখার্জি। তিরিশে ডিসেম্বর, উনিশশো নব্বই। অন্য চিঠিগুলোর মতোই মোটা পেপারে লেখা। বরেন মজুমদার লিখছেন,

'আজ কুঞ্জ এসেছিল। কুঞ্জকে তুমি চিনবে না। আমার গ্রামসম্পর্কের ভাইপো, ভালো নাম কুঞ্জবিহারী সামন্ত। ছোকরা ছোট বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সে এক লম্বা কাহিনী।

এতদিন বাদে ছোকরা আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি তো অবাক। জানলাম ছোকরা জাহাজে খালাসির কাজ নিয়ে আডেন হয়ে ইওরোপে এসে পৌঁছয়। তারপর ফ্রান্স হয়ে ব্রিটেন। তুমি তো জান, দুঃসাহসী ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার একটা আলাদা টান আছে, নিজে তেমন সাহসী নই বলেই বোধহয়।

তবে ছোকরার কাছ থেকে আমি একটা জিনিস পেয়েছি। তার বিবরণ তোমাকে দিলাম না। তবে বলতে পারি, এর থেকে দুর্মূল্য কিছু আমি জীবনে ছুঁয়ে দেখিনি। এখন এটাকে কীভাবে কোথায় রাখব সেটাই চিন্তার। মনে হচ্ছে খুব শিগ্গিরিই দেশে ফিরতে হবে।'

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'দুর্মূল্য জিনিসটা যে কী সেটা উনি দেশে ফিরে আসার পর জানাননি?'

হাত ওল্টালেন ডাক্তার সরকার, 'নাহ্, অনেক চাপাচাপি করেও জানতে পারিনি। আসলে বরেন খুব চাপা ধরনের মানুষ ছিল। আর সেইরকম জেদি। একবার যদি মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল, তো তার থেকে আর কিছু বার করা শিবেরও অসাধ্য ছিল।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, বরেনবাবু কি ছোটবেলা থেকেই খুব সতর্ক সাবধানী ছিলেন?'

'এতটা ছিল না। কোনওকালেই যে ও খুব ডাকাবুকো ছিল তা নয়, তবে বিলেত থেকে ফেরার পরেই দেখলাম বেশ ভিতু হয়ে গেছে।'

চিঠিগুলো ফেরত দিলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'সেদিন তো আপনিই প্রথম ঘটনাটাকে ফাউল প্লে হিসেবে সন্দেহ করেন শুনলাম। কী দেখে বুঝলেন?'

বিরক্ত হলেন ডাক্তার সরকার, 'আপনি কীরকমের গোয়েন্দা মশাই? আমি ডাক্তার, চল্লিশ বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি। বরেন আমার বন্ধুও বটে, পেশেন্টও

বটে। তার বডি দেখে বুঝতে পারব না এটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক মৃত্যু? তাও যখন জিগ্যেস করছেন তখন বলি। ঠোঁটের কোণায় একটা হাল্কা গ্যাঁজলা মতো ছিল, নখের ডগা নীল। ওয়েল, আরও অনেক কিছু লক্ষণ ছিল। সেসব আপনাদের অটোপ্সি সার্জেন বেটার বলতে পারবেন।'

'আপনিই তো ওঁর চিকিৎসা করতেন। রোগব্যাধি তেমন সিরিয়াস কিছু ছিল?'

'হার্টের ব্যামোটা খুব ট্রাবল দিচ্ছিল। আসলে দিনরাত দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকত তো! তাই একটা নার্স রাখতে বলেছিলাম।'

'দুশ্চিন্তার কারণটা কী?'

'জানি না জানেন কিনা, প্রমিতকে নিয়ে ওর বরাবরই একটা সমস্যা ছিল। বরেন অত শান্তশিষ্ট হলে কী হবে, প্রমিত পেয়েছে ওর দাদুর ধাত। একেবারে রইসি জমিদারি মেজাজ। দু-এক জায়গায় চাকরি করতে ঢুকেছিল, বেশিদিন করতে পারেনি। বরেনই ওকে একটা অ্যাকাউনটেন্সি ফার্ম খুলতে বলে। সেটা যে খুব ভালো চলত তা নয়। তবে মজুমদারদের টাকার অভাব নেই। তাই ঠাটবাট বজায় রাখতে অসুবিধা হতো না। তবে ছেলের মেজাজ, ব্যবহার এই নিয়ে অনেকবারই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে বরেনকে। রিসেন্ট শোনা যাচ্ছিল প্রমিতের ব্যবসায় ভাঁটা পড়েছে। বেশ কিছু পুরোন ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে গেছে। সে নিয়ে বরেন প্রায়ই দুঃখপ্রকাশ করত।'

'এছাড়া আর কিছু?'

'নাহ্, তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'বরেনবাবু মারা যাওয়ার আগের দিন আপনার কাছে এসেছিলেন। যদি আপত্তি না থাকে, কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আপনাদের মধ্যে বলতে পারবেন?'

'সাধারণ খুঁটিনাটি। ওরকম আলোচনা আমাদের প্রায়ই হতো। তবে সেদিন নার্স মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিল বরেন। বলল, খুব ভালো মেয়ে। যেমন নম্র ব্যবহার তেমন কাজে খুব চটপটে।'

'নার্সটিকে তো আপনিই দিয়েছিলেন শুনলাম।'

'ওই আর কি। সুরেশ আমাকে বলেছিল ওর কোন দেশোয়ালি আত্মীয়ের একটি মেয়ে আছে, নার্সিং শিখেছে। তাকে যেন একটা কাজ দিই। আমাদের ডাক্তারদের কাছে তো অনেক কোয়্যারি আসে, তাই। আমিই ওকে রেফার করেছিলাম।'

'ও, তাই বলুন। আচ্ছা, বরেনবাবু কি বিদেশ থেকে শুধু আপনাকেই চিঠি লিখতেন?'

'আমাকে লিখত বলতে পারি। আর কাকে লিখত বলতে পারব না।'

* * *

অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পাল প্রবীণ মানুষ। প্রফেসর মুখার্জির সঙ্গে আলাপ আছে। তিনি ফোন ধরেই বললেন, 'আপনার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম স্যার।

চাকলাদার সাহেবের টেলিফোনিক আদেশ এসে গেছে যে আপনাকে যেন সর্বতোভাবে সাহায্য করি। বলুন স্যার, অধমের জন্য কী হুকুম।'

হেসে ফেললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'আমাকে কেন যে বারবার স্যার বলে লজ্জা দেন বুঝি না। আমাকে কয়েকটা ইনফর্মেশন দিতে পারবেন প্লিজ?'

'প্লিজ বলুন।'

'বরেন মজুমদারের দেহে যে বিষটা পাওয়া গেছে সেটা এক্স্যাক্টলি কী বিষ? কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?'

'রাইসিনের একটা ডেরিভেটিভ। কিছু বিশেষ ধরনের ওষুধ বানাবার ক্যাটালিস্ট হিসেবে লাগে। তীব্র বিষ। বটুলিনাম ছাড়া এমন তীব্র আর অব্যর্থ বিষ আর নেই।'

'কতটা প্রাণঘাতী?'

'একজন আশি কেজি ওজনের পূর্ণবয়স্ক মানুষকে মারার জন্য সাতশো থেকে ন'শো ন্যানোগ্রাম মোর দ্যান এনাফ, তাও যদি ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। আর সরাসরি রক্তে মিশলে, মানে ইঞ্জেকশন দিয়ে পুশ করলে পঞ্চাশ-ষাট ন্যানোগ্রামই যথেষ্ট।'

'ভিসেরাতে কতটা পাওয়া গেছে।'

'ছ'শো মতো।'

'তার মানে সরাসরি রক্তে মেশেনি, খাবার দাবারের সঙ্গেই গেছে। তাই তো?

'এক্স্যাক্টলি।'

'বিষপ্রয়োগের পর কতক্ষণ লাগে মরতে?'

'চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম।'

'আর আপনার রিপোর্ট কী বলছে? কখন মারা যান বরেন মজুমদার?'

'রাত আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে।'

'অর্থাৎ বিষ শরীরে প্রবেশ করেছে রাত ন'টা দশটা নাগাদ, রাইট?'

'একদম রাইট স্যার।'

'থ্যাঙ্কিউ, থ্যাংক্স আ লট।'

* * *

বাগবাজার পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল মনুজেন্দ্রর। প্রফেসর মুখার্জি তাঁর ড্রয়িংরুমের সোফায় আধশোয়া হয়ে একটা মোটকা বই পড়ছিলেন, পরনে টি-শার্ট আর বারমুডা। মনুজেন্দ্রকে দেখে সহাস্যে আপ্যায়ন করলেন, 'এসো ব্রাদার, এসো। তোমারই পথ চেয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ।'

মনুজেন্দ্র সামান্য হেসে সোফায় বসল। আজ তার অফ ডিউটি। পরনে একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের লিনেনের হাফ শার্ট আর ইলেকট্রিক ব্লু কালারের জিন্স। চোখে গগলস। সুপুরুষ কাঠামোয় ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে।

মনুজেন্দ্র সোফায় বসতে অন্দরমহলের দিকে একটা হাঁক পাড়লেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ওগো শুনছ, মনু এসেছে। এক কাপ কাল কফি দিয়ে যাও, আর আমার জন্য একটা বিয়ার।' তারপর মনুজেন্দ্রর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'তারপর খবর কী মনু? নার্স ম্যাডামের সঙ্গে মোলাকাত হল?'

মনুজেন্দ্র বেজার মুখে বলল, 'সে হয়েছে স্যার। তবে তার জন্য যে হুজ্জোত পোয়াতে হয়েছে সে আর কহতব্য নয়। মহিলা কিছুতেই কথা বলবেন না পুলিশের সঙ্গে। শুধু বলছেন, 'ম্যায়নে কুছ নেহি কিয়া, মুঝে ছোড় দিজিয়ে।'

'অ্যাঁ? ভদ্রমহিলা অবাঙালি নাকি?'

'হ্যাঁ, মারাঠি। নাম চারুমতী সাওয়ান্ত।'

'হুঁ, তারপর?'

'তারপর অনেক কষ্টে বোঝালাম যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। এখন উনি যদি তদন্তে সহায়তা না করেন, বা না বলে মুম্বাই টুম্বাই পালিয়ে যান তাহলেই বরং বেশি বিপদে পড়বেন।'

'তা কী খবর পেলে?'

'কিছুই না। আগের রিপোর্টে যা ছিল তাই। ভদ্রমহিলার বাড়ি মুম্বাইতে। বাবা নেই, মা আছেন। নার্সিং-এর কাজ শিখেছেন কষ্ট করে। সুরেশ আগরওয়ালের কোন এক তুতো ভাই নাকি ওঁর মাকে বহিন ডাকেন। তিনিই মেয়েটির কাজকর্মের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে এখানে জুটিয়ে দেন।'

হুম।' ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'সেদিনের ব্যাপারে কী বললেন?'

'আগে যা বলেছিলেন তাইই রিপিট করলেন। কোথাও কোনও মিসম্যাচ নেই।'

'ম্যাডামের বয়েস কীরকম?'

'বেশি না। সাতাশ-আঠাশ হবে।'

'নার্সিং কোথা থেকে পড়েছে বলল?'

'কে ই এম কলেজ, পারেল।'

'গুড। এবার কাজের কথায় এসো। মারা যাওয়ার দিনের কথা কী বলল মিস চারুমতী?'

ততক্ষণে কফি এসে গেছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে মনুজেন্দ্র বলল, 'যেদিন বরেন্দ্রনাথ মারা যান তার তিন চার দিন আগে থেকে কোনও কারণে একটু উত্তেজিত ছিলেন। কাজের লোক, ড্রাইভার এঁদের তুচ্ছ কারণে বকাবকি করেন, যেটা তাঁর স্বভাবের বাইরে।

মারা যাওয়ার আগের দিন সকালে ছেলের সঙ্গে তাঁর বেশ কথা কাটাকাটি হয়। চারুমতী ওষুধ দিতে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। ফিরে আসার সময় ঘরের ভেতর থেকে কিছু উত্তেজিত কথা ভেসে আসে তাঁর কানে। মেয়েলি কৌতূহলে কান পেতে শোনেন বরেন মজুমদার তাঁর ছেলেকে ধমকাচ্ছেন, আজ অবধি তোমার ব্যবসায় কম টাকা ঢালিনি প্রমিত। আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তুমি তোমার জীবন

নিয়ে সুখী থাকো, আমি আমার জগত নিয়ে।

'প্রমিতেন্দ্র তার জবাবে কী বললেন?'

'সেটা আর চারুমতী শুনতে পাননি।'

'হুম। আর মারা যাওয়ার দিন?'

'মারা যাওয়ার দিন সকাল থেকে বরেনবাবুর শরীর বেশ ভালোই ছিল। ওয়াটার পোচ, সেঁকা পাঁউরুটি, এক গ্লাস দুধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেন। লাঞ্চে ছিল একবাটি ভাত, দুচামচ ডাল, মাছভাজা আর পেঁপে সেদ্ধ।'

'আগে এগোও মনু। এসব খাবারের লিস্টি শুনলেও বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।'

'বিকেলের টিফিনে আপেল সেদ্ধ আর পাকা পেঁপের কথাটা বলতে ভুলে গেছি কি?'

'ইয়াল্লা!'

'আচ্ছা, তাহলে থাক।'

ইতিমধ্যে প্রফেসর মুখার্জির স্ত্রী চিকেন পকোড়া নিয়ে এসেছিলেন। মনুজেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে প্লেট নিয়েই মুখে পুরল দুটো। মিসেস মুখার্জি হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

'বরেন মজুমদারের বাড়ির লোকজনের ব্যাপারে খোঁজ খবর কিছু পেলে?'

'প্রমিত মজুমদারের ব্যবসার অবস্থা ভালো না। অন্য ব্যবসা খুলবেন বলে লোন নিতে চাইছেন। কিন্তু গ্যারান্টার খুঁজে পাচ্ছেন না। সুরেশ আগরওয়ালের অনেকগুলো ব্যবসা আছে। সত্যিকারের বড় বিজনেসম্যান, টাইকুন বললেই চলে। কলকাতার রইসি লোকেদের সার্কেলে আর্টের কালেক্টর হিসেবে সুনাম আছে। বংশীর ইচ্ছে ছিল ছেলের জন্য একটা মুদির দোকান করে দেবে। সেইজন্য বরেন মজুমদারের কাছে টাকা ধার চেয়েছিল। মজুমদার সাহেব না করে দেন। মিনতির বর পাড়ার উঠতি ডন। তবে মিনতি পরিশ্রমী মেয়ে। খেটে খায়। শিউলিদির সত্যিই তিনকুলে কেউ নেই। তবে একটা চমকাবার মতো খবর আছে।'

'কী? শিউলির ছেলেই মিনতির বর, তাই তো?'

মনুজেন্দ্র খানিক হাঁ হয়ে থেকে ঝুপ করে নিচু হয়ে একটা প্রণাম ঠুকল। প্রফেসর মুখার্জি নিরাসক্ত সুরে বললেন, 'থাক, থাক, আবার এসব কেন? তুমি শিউলি আর মিনতির কথা মন দিয়ে ফল করলেই বুঝতে পারতে। যাই হোক, আর?'

'আর কী স্যার। যা প্রগ্রেস সবই তো পেশ করলাম।'

'বরেন মজুমদারের ল'ইয়ারের সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'হ্যাঁ। মজুমদার সাহেব উইল করে গেছেন। বাড়ি গাড়ি সবই ছেলে পাবে। দশ লাখ করে শিউলিদি আর বংশী মালাকার পাবে। মিনতি মণ্ডল পাবে লাখ দুয়েক। লাইব্রেরির সব বই কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে দান করতে বলে গেছেন। সংগ্রহের সমস্ত ছবি পাবেন বন্ধু সুরেশ আগরওয়াল, ওঁর সেল্ফ পোর্ট্রেট আর ওঁর বাপ ঠাকুরদার তৈলচিত্রদুটি বাদ দিয়ে।'

'অর্থাৎ খুন করার কারণ অনেকেরই আছে, এক সুরেশ আগরওয়াল ছাড়া। প্রমিতবাবু বাবাকে খুন করতে পারেন, বাপ মরে গেলে ব্যবসার টাকা পাবেন বলে। শিউলি, বংশী মালাকারেরও যথেষ্ট মোটিভ আছে। কিন্তু যে বিষ প্রয়োগে খুন করা হয়েছে, সে অবধি তাদের হাত পৌঁছবে না। একই যুক্তিতে প্রমিতবাবুকেও হিসেবের বাইরে রাখা যায়। এদিকে ফরেনসিক রিপোর্টে কিছু নেই। কোথাও কোনও হাতের ছাপ নেই। কোথাও কোনও ক্লু নেই। কেন খুন জানা যাচ্ছে না। কীভাবে খুন বলা যাচ্ছে না। যখন মজুমদার সাহেবের শরীরে বিষ ঢোকে তখন তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন। ইটস আ ক্লাসিক কেস অফ ক্লোজড ডোর মার্ডার। অতএব এত কিছু করে আমরা শেষমেশ সেই আমড়াতলার মোড়ে।' চোখ বুজলেন প্রফেসর মুখার্জি।

কিছুক্ষণ পর মনুজেন্দ্র প্রশ্ন করল, 'কী ভাবছেন স্যার?'

চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'অনেকগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি মনু, নইলে কিছুতেই এগোতে পারছি না। বরেন মজুমদারকে বাদ্যযন্ত্রের ছবি পাঠিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল কে? বরেন মজুমদারের ধাঁধার উত্তর কী? মারা যাওয়ার দিন বরেন মজুমদার ডাক্তার সরকারের কাছে হঠাৎ চারুমতীর ব্যাপারে খোঁজখবর করছিলেন কেন? বিলেত থেকে ফেরার পর এত ভয়ে ভয়ে কেন থাকতেন বরেন মজুমদার?'

দুজনেই চুপচাপ রইলেন। তারপর সোফার হাতলে একটা ঘুঁষি মারলেন প্রফেসর মুখার্জি। 'ড্যাম ইট। কাম অন মনু, ব্যাপারটা আমরা একটু অন্য দিক থেকে দেখি চল।...

বরেন মজুমদারের কাছে একটা দামি জিনিস ছিল। সেটা তিনি নিজেই লিখে জানিয়ে গেছেন তাঁর বাল্যবন্ধুকে। সেটা তিনি লন্ডন থেকে নিয়ে আসেন। এনে নিজেদের লকারে রেখে দেন। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে সেটা লকার থেকে তুলে এনে কোথাও লুকিয়ে রাখেন। ধরা যাক যে বা যারা খুন করেছে, তারাই ছবি পাঠিয়ে মজুমদারবাবুকে ভয় দেখাচ্ছিল।'

'কিন্তু স্যার, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ওরা জানল কী করে জিনিসটা বরেনবাবুর কাছে আছে?'

'তিনটে সম্ভাবনা থাকতে পারে মনু। এক, জিনিসটা ওনারই, কোনওকালে বরেনবাবু নিজেই ওদের জানিয়েছিলেন, তখন হয়তো তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল ভদ্রলোকের। দুই, ওনারই জিনিস, ওরা অন্য কোনও সূত্র থেকে জানতে পেরেছে। তৃতীয়টা হচ্ছে, জিনিসটা আদতে ওদেরই, বরেন মিত্তির কোনও সুযোগে সেটি বগলস্থ করেন।'

কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে প্রফেসর মুখার্জির দিকে চেয়ে রইল মনুজেন্দ্র। তারপর একটা লম্বা হুম করে বলল, 'হতেই পারে স্যার। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায়।'

'বল।'

'জিনিসটা বরেন মজুমদার বিলেত থেকে নিয়ে আসেন প্রায় তিরিশ বছর আগে। এতদিন পরে এই নিয়ে এত তত্ত্বতালাশ হাঙ্গামা হওয়ার কারণটা কী?'

'সেটা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল ভাইটি, আরেকটু তথ্য হাতে না পেলে।'

'কিন্তু একটা কথা বলুন স্যার, অমন একটা দামি জিনিস, যেটা কি না মজুমদার সাহেবের কথায় অমূল্য জিনিস, সেটা হাতে পেয়েও তিনি বেচে দিলেন না কেন?'

'এই তো! এইবার ঠিক লাইনে ভাবছ তুমি। এর কারণ তিনটে হতে পারে। এক, প্রাইড অফ পজেশন। ভুলে যেও না বরেন মজুমদার জমিদার বংশের ছেলে। জিনিসটা তাঁর অহংবোধকে এতটাই তৃপ্ত করতো যে তিনি বেচার কথা ভাবতেই পারেননি। দুই, জিনিসটা এমনই যে খোলা বাজারে তার কোনও আর্থিক মূল্য নেই। কিন্তু বরেন মজুমদার বা খুনিদের কাছে তার যথেষ্ট মূল্য আছে। যেমন ধরো তোমার এল আই সি'র সার্টিফিকেট। ওটা চুরি করে কেউ লাভবান হতে পারবে না, কারণ ওটা বাজারে বেচা যাবে না। কিন্তু ওটা তোমার কাছে যথেষ্ট মূল্যবান।'

'বুঝেছি। যেমন ধরা যাক মজুমদার পরিবারের কারও কোনও পুরোনো উইল বা অন্য কিছু।'

'কারেক্ট। আর তৃতীয় কারণটা হচ্ছে, জিনিসটা খোলা বাজারে বেচার মতো নয়। আর যে বাজারে ও জিনিস বেচা যায়, বরেন মজুমদারের কাছে তার অ্যাক্সেস ছিল না।'

'তার মানে স্যার, ওরা কী করে জানল জিনিসটা বরেন মিত্তিরের কাছে আছে তার তিনটে কারণ, আর বরেন মজুমদার কেন জিনিসটা বেচেননি তার তিনটে কারণ, একটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স।'

'গুড, এই তো বেশ লজিক্যালি ভাবছ। এবার এই থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্সের ন'টা খোপ। মানে ন'টা সম্ভাবনা, রাইট?'

একটা কাগজ পেন নিয়ে লিখতে বসে গেল মনুজেন্দ্র। ওয়ান, টু করে লিখতে থাকল।

১. খুনিদের বরেন মজুমদার নিজেই বলেছিলেন। প্রাইড অফ পজেশন বজায় রাখতে তিনি বিক্রি করেননি, তাদের দিতে চাননি।

২. খুনিরা কোনওভাবে জানতে পেরেছে ওঁর কাছে একটি অমূল্য জিনিস আছে। প্রাইড অফ পজেশন বজায় রাখতে তিনি বিক্রি করেননি, তাদের ফেরত দিতে চাননি।

৩. বস্তুটি খুনিদেরই। বরেনবাবু সেটি গাপ করেন। তারপর প্রাইড অফ পজেশন বজায় রাখতে তিনি বিক্রি করেননি, তাদের দিতে চাননি।

৪. খুনিদের বরেনবাবু নিজেই বলেছিলেন। খোলাবাজারে আর্থিক মূল্য নেই বলে তিনি কোনওদিন বিক্রি করার কথা ভাবেননি।

৫. খুনিরা কোনওভাবে জানতে পেরেছে ওঁর কাছে একটি অমূল্য জিনিস আছে। তারপর বাকিটা ওই খোলা বাজারে আর্থিক মূল্য নেই বলে...।

৬. বস্তুটি খুনিদেরই। কোনওভাবে বরেন মজুমদার সেটি গাপ করেন।

খোলাবাজারে আর্থিক মূল্য নেই বলে তিনি কোনওদিন বিক্রি করার কথা ভাবেননি।

৭. খুনিদের বরেন মজুমদার নিজেই বলেছিলেন। চোরা বাজারে অ্যাক্সেস ছিল না বলে বেচতে পারেননি।

৮. খুনিরা কোনও ভাবে জানতে পেরেছে ওঁর কাছে একটি অমূল্য জিনিস আছে। চোর বাজারে অ্যাক্সেস ছিল না বলে বেচতে পারেননি।

৯. বস্তুটি খুনিদেরই। কোনওভাবে বরেন মজুমদার সেটি গাপ করেন। চোর বাজারে অ্যাক্সেস ছিল না বলে বেচতে পারেননি।

লেখা শেষ হলে প্রফেসর মুখার্জি কাগজটা তুলে নিলেন। তারপর পুরোটা দেখে বললেন, 'চার, পাঁচ, সাত আর আট, এই চারটে পয়েন্ট ইললজিক্যাল অ্যান্ড ইনকোহেরেন্ট। স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যায়।'

'কেন?'

'জিনিসটা যদি ওঁরই হয়, আর তার যদি খোলা বাজারে দাম না থাকে, তাহলে চোরেরা সেটা নিয়ে করবে কী? ব্ল্যাকমেইলিং? সেক্ষেত্রে উনি নিজে থেকে চোরেদের সে হদিশ দিতেনই না। ফলে চার নম্বর পয়েন্ট ইনভ্যালিড। পাঁচ নম্বর পয়েন্টও একই কারণে বাতিল। এখনও অবধি যেটুকু তথ্য জানা গেছে তাতে ব্ল্যাকমেইলিং এর কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

সাত আর আটও তাই। চোরা বাজার ছাড়া বেচা যায় না, এমন জিনিসের মালিক চট করে তার হদিস কাউকে জানায় না। যেমন ধরো, আমার কাছে একটা চোরাই করা হাতির দাঁত আছে। বা নানাসাহেবের নওলাখা হার। এসব জিনিস চোরা বাজার ছাড়া বেচা অসম্ভব। এসব রেখেছি জানলেই তুমি আমার হাতে একজোড়া মকরমুখী স্টিলের বালা পরিয়ে সাদরে ভবানী ভবনে নিয়ে যাবে। ফলে সাত নম্বর সম্ভাবনা ক্যান্সেল। আট নম্বরের অবশ্য একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। ধরা যাক চোরা বাজারে বেচার মতো অবৈধ জিনিস আমার ঘরে আছে, আর চোরেরা কোনওভাবে সেটা জানতে পেরে আমাকে চাপ দিচ্ছে তাদের হ্যান্ডওভার করার জন্য, এটা সম্ভব। ঠিক আছে। তোমার রিকোয়েস্টে না হয় আট নাম্বারটাকে একেবারে বাতিল করলাম না।'

'আমার রিকোয়েস্টে মানে?' হাঁ হয়ে গেল মনুজেন্দ্র। কিন্তু সেদিকে কান দিলেন না প্রফেসর মুখার্জি। আপনমনে বলতে থাকলেন, 'তার মানে পড়ে থাকে এক, দুই, তিন, ছয় আর নয়। একে একে বিচার করে দেখা যাক।

বরেন মজুমদার যদি জিনিসটা বেচে টাকা আদায় করার ফন্দি এঁটেই বস্তুটি গেঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বাজার দর বুঝেই গ্যাঁড়াবেন। সেক্ষেত্রে যদি উনি জানতেনই যে এটা উনি বেচতে পারবেন না, তাহলে চুরি করতেনই না। তাই না? ফলে ছয় আর নয় নম্বর সম্ভাবনাকেও খারিজ করা যায়।

পড়ে থাকে এক দুই আর তিন।

নিজের হেফাজতে থাকা কোনও জিনিস, যার ব্যাপারে বরেনবাবু বলে ফেলেছিলেন সন্দেহজনক কেউ বা কাউকে। বা তারা কোনওভাবে জানতে পেরেছিল

জিনিসটার ব্যাপারে। তারপর থেকেই তারা বরেন মিত্তিরকে চাপ দিতে থাকে জিনিসটা হাতাবার জন্য। পসিবল?'

'খুবই পসিবল স্যার।'

'উঁহু, এখানে একটা অসুবিধা আছে। জিনিসটা লন্ডন থেকে ফিরে আসার সময় নিয়ে আসা হয়েছিল। অর্থাৎ বস্তুটির মালিকানা বরেন মজুমদারের ওপর অর্শায় ওদেশে। তা বাপু ওখানে গিয়ে তিনি এমন কী মহার্ঘ জিনিসের মালিক হয়ে বসলেন যার খবর তাঁর পরিবারের কেউ জানে না?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ এই যুক্তিতে এবার আট নম্বর সম্ভাবনাটাকেও নাকচ করা যায়।'

'তার মানে একমাত্র তিন নাম্বার সম্ভাবনাটাই সত্যি, তাই তো? বরেন মজুমদার লন্ডনে এমন একটি মহার্ঘ জিনিস কেউ বা কারো কাছ থেকে হাপিস করেন, যেটা তিনি কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাননি। সে প্রাইড অফ পজেশন হোক বা যাই হোক। রাইট?'

'রাইট। এবার একটা হুক পাওয়া গেল যা আমাদের থিওরিতে খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। শুধু তিনখানা ধাঁধা সলভ করা বাকি।

এক, জিনিসটা আসলে কী।

দুই, ওটার পেছনে কারা এতদিন পর হাত ধুয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।

তিন, জিনিসটা কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছেন বরেন মজুমদার।

মনুজেন্দ্র বিমর্ষ মুখে বলল, 'এই তিনটেই তো মোক্ষম। আর খুনের তরিকাটা? বন্ধ দরজার ওপাশে কে বিষ খাইয়ে গেল বরেন মজুমদারকে?'

'ধীরে বন্ধু ধীরে। এক এক করে আসো। আমরা বোধহয় এতদিনে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছি।

বরেন মজুমদার একটি দুফুট বাই তিনফুট সাইজের দুর্মূল্য বস্তু নিয়ে ফিরেছিলেন। বস্তুটি পজেস করার প্রাইড সাঙ্ঘাতিক। এবং এমন একটি বস্তু যা খোলা বাজারে বিক্রি করা যায় না। আর যে বাজারে বিক্রি করা যায় সেখানে বরেনবাবু অ্যাক্সেস ছিল না।

অতএব এটি একটি চোরাই শিল্পকর্ম। হয়তো ভিন্টেজ, ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। যেমন একটু আগে বললাম, নানাসাহেবের নওলাখা হার, বা ধরো চৈতন্যদেবের হাতে লেখা পুঁথি, বা ডেড সি স্ক্রোলের মতো কিছু। এসব জিনিস খোলা বাজারে বেচার কথা ভাবাই যায় না।

অতএব পড়ে থাকে একটিই জিনিস, যার ওপর বরেন মজুমদারের অসীম মমতা থাকা খুব স্বাভাবিক। সেটি তাঁর কাছে শুধু দুর্মূল্য নয়, অমূল্য। এবং সে জাতীয় বস্তু ওই দু-ফুট বাই তিনফুটেরই হয়। সেটি হচ্ছে ছবি। এমন একটি ছবি যার শিল্পগত এবং ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। লন্ডনে প্রবাসকালে সেইটিই তাঁর হস্তগত হয়। এবং সেইটি নিয়ে তিনি দেশে পালিয়ে আসেন। সেই থেকে তিনি খুব সতর্ক এবং সাবধান হয়ে থাকতেন। কাউকে খুলে বলতেও পারেননি জিনিসটি কী। শেষে

যখন তাঁর প্রাণ সংশয় হয়, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি মারা গেলে অমন অমূল্য জিনিস লোকচক্ষুর অগোচরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি একটা ছড়া বানালেন। সেটা কাছের লোকজনদের মুখস্ত করতে বলেন। যাতে কোনওদিন কোনও রামচন্দ্র এসে সেই বন্দিনী সীতাকে অশোকবন থেকে উদ্ধার করেন।'

'এ আর এমন কী খোলসা করলেন স্যার। আর্ট হিস্টরিয়ান দু-ফুট বাই তিন ফুটের একখানা দুর্মূল্য জিনিস কোথাও লুকিয়ে রাখলে সেটা যে একটা পেইন্টিং ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, এটা বুঝতে তো আর গোয়েন্দা দরকার হয় না স্যার। ইটস এলিমেন্টারি।'

'ইটস নট দ্যাট এলিমেন্টারি মাই ডিয়ার মনুজেন্দ্র বর্মণ। কোনও যুক্তিসঙ্গত অনুমান ছাড়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তুমিই বলতে, আপনার যুক্তিটা পাড়ার কুঁদুলে মাসিমাদের মতো শোনাচ্ছে স্যার। সবই বায়বীয়, ফুল গ্যাস। রাইট?'

মনুজেন্দ্রর চুপ।

'ফলে সি আই ডির এডিজি সাহেবের বিশেষ অনুরোধে নিযুক্ত গোয়েন্দামশাই, 'এইটা একটা দামি ছবি বলে মনে হচ্ছে' শুধু এই বলে কর্তব্য সমাধা করতে পারেন না। তাঁকে এটাও বলে দিতে হয় যে সেটা কোন ছবি।'

'কোন ছবি স্যার? মানে এমন কোনও ছবি আছে যার জন্যে লোকে দু-দুখানা খুন করতে পারে?'

'আছে মনু, আছে। বিশ্ববিখ্যাত মোনালিসা একবার চুরি গেছিল জান?'

'অ্যাঁ! সে কী?'

'হ্যাঁ, উনিশশো এগারো সালে। করেন ভিনসেনজো পেরুগিয়া নামে জনৈক মহাত্মা। উদ্ধার হয় দুবছর বাদে, উনিশশো তেরো সালে। সে এক রোমহর্ষক কাহিনী। শুধু তাই নয়, বারে বারে বিভিন্ন আর্টিস্টদের ছবি চুরি হয়েছে, তার মধ্যে ভ্যান গঘ, ক্লদ মোনে, দা ভিঞ্চি, গোইয়া, রেমব্রান্ট—কে নেই? এই তো বছর ছয়েক আগে উত্তর ইতালির কাস্তেলেভেচ্চিও মিউজিয়াম থেকে কয়েকটা টিনটোরেটো আর পিটার পল রুবেন্সের ছবি চুরি গেল।'

'টিনটোরেটো মানে ফেলুদার গল্পের টিনটোরেটো?'

'আজ্ঞে মনু। এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। উনিশশো নিরানব্বই সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের ঘটনাটাই ধরো না। অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের ছাদ কেটে প্রায় জনৈক তস্করসম্রাট প্রায় হলিউডি স্টাইলে চুরি করে নিয়ে যায় সেজানের বিখ্যাত ল্যান্ডস্কেপ। চোরাবাজারের হিসেবে দাম প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড। মানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আঠাশ কোটি নব্বই লাখ টাকা।'

মনুজেন্দ্রর মুখটা হাঁ।

'এতেই অবাক হলে চলবে সোনা? কাস্তেলেভেচ্চিও মিউজিয়াম থেকে চুরি হওয়া ছবিগুলোর মূল্য জানো? প্রায় পনেরো মিলিয়ন ইউরো। মানে প্রায় একশো বাইশ কোটি টাকা। মানে একজন মধ্যবিত্ত ভারতীয় চাকুরিজীবীর অ্যানুয়াল ইনকাম ৬ লাখ অ্যারাউন্ড ধরলে বিশ-এ নভেম্বর, ২০১৫-তে তিনজন মুখোশধারী লুম্পেন

এসে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশজন মধ্যবিত্ত ভারতীয়র গোটাজীবনের আয় লুট করে পালিয়ে গেছিল। তবে অন্যান্য আর্ট থেফটের কাছে এই ঘটনা বাচ্চা। পৃথিবীর ইতিহাসে পেইন্টিং চুরির যে কত রোমহর্ষক ঘটনা আর তাদের ঘিরে টাকার ছড়াছড়ি রয়েছে তার হিসেব নেই।'

'এসব চুরির কিনারা হয় না স্যার?'

'হয়, তবে খুব অল্প। আর্ট লস্ট রেজিস্টারের ডেটাবেস অনুসারে গোটা বিশ্বে এখনো পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ পেইন্টিং চুরি হয়েছে। কেসদের মধ্যে সলভড হয়েছে জাস্ট ১৮%।'

'কিন্তু স্যার, একটা কথা বলুন, ছবি চুরি করে চোরের লাভটা কী? কাজটা যতই রিওয়ার্ডিং হোক, আপনি তো কোনো দোকানে গিয়ে বলতে পারবেন না, দাদা মোনালিসাটা বেচব ভাবছি, বেশি বার্গেন করবেন না—ওই ষাট কোটি ধরুন, কাল আর টি জি এস করে দিয়েন!'

'রাইট মনু। বেশিরভাগ বড় বড় আর্ট থেফট বিক্রির জন্য হয় না। কারণ ওই জিনিস তুমি চোরাবাজারে কিনলেও কাউকে ডেকে দেখাতে পারবে না। মানে একজন বিলিওনেয়ার আর্ট এন্থুসিয়াস্ট নিজের রেপুটেশনের কথা না ভেবে লোকজনকে ডেকে চুরি যাওয়া ছবি নিজের পার্সোনাল গ্যালারিতে ঝুলিয়ে রেখে সগর্বে বলছে, এইটা গত বছর ল্যুভর থেকে চুরি গেসল, গত মাসে হাওয়াই বেড়াতে গিয়ে কিন্‌লুম। এটা তো হয় না।'

'তাহলে? এই সব ছবি চুরি হয় কেন?'

'এইসব প্রাইসলেস পেইন্টিং আসলে মাফিয়ারাজ্যে গোল্ড লোনের মতো কাজ করে, লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। ধরো কোনও একটি বিশ্ববিখ্যাত পেইন্টিং চুরি গেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে শুরু করে এফ বি আই আদি দুনিয়ার বাঘা বাঘা পুলিশ এজেন্সি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এমন সময় সরকারের আর কী করার থাকে রিওয়ার্ড ঘোষণা ছাড়া? ছবিগুলো একদিক থেকে অমূল্যই বটে, কারণ বিক্রির অযোগ্য। তবুও গভর্নমেন্টের ব্লাড প্রেশারের সঙ্গে পেইন্টিংগুলোর মার্কেট ভ্যালুও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকে। এইবার মাফিয়ারা দরাদরি শুরু করে সরকারের সঙ্গে। অমুক কেস থেকে আমাকে রেহাই দাও, তাহলে ওই ছবিটা ফেরত দেব। আমাকে সেফ হেভেনে পালিয়ে যাওয়ার সেফ প্যাসেজ দাও, তাহলে তমুক ছবিটা ফেরত পাবে। অর্থাৎ নিখুঁত প্ল্যানে চুরি করা পিকাসোর কিউবিজমকে কোনো বড়লোক বাড়ির দেওয়ালে পাওয়ার চেয়ে কোনো ইতালিয়ান কিংপিনের সিক্রেট ডার্করুমে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকতে পাওয়ার চান্স অনেক বেশি।'

'আপনার কী ধারণা, দৈবগতিকে তেমন কোনও একটা পেইন্টিং এসে পড়েছিল বরেন মজুমদারের হাতে?'

'বিষয়টা আর ধারণার স্তরে নেই মনু। কাল সারারাত আমি ইন্টারনেটে তন্ন তন্ন করে এই নিয়ে রিসার্চ করেছি। আজ সকালে কলকাতার দুজন বিখ্যাত আর্ট কালেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি। সেইসব তথ্য নিয়ে, আর এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু সূত্র মিলিয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুত দুর্মূল্য

ছবি বরেন মজুমদারের হাতে এসে পড়ে। সেটি কোন ছবি আমি সেটাও জানি, বলা ভালো নিরানব্বই শতাংশ নিশ্চয়তার সঙ্গে আন্দাজ করতে পারি।'

'কোন ছবি স্যার?'

বইটা মুড়ে খানিক চোখ বুজে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর ধীর লয়ে বলতে লাগলেন।

'উনিশশো নব্বই সাল। আমেরিকার বোস্টনের ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে রাতেরবেলা শিথিল হয়ে আসা গার্ডদের শিফটকে কাজে লাগিয়ে নকল পুলিশের বেশধারী দুজন ছিনতাইকারী তিনটে রেমব্র্যান্ট, পাঁচটা দেগা, একটা মোনে মিলিয়ে মোট ১৩টা পেইন্টিং চুরি করেছিল। যার মোট প্রাইস ৫০০ মিলিয়ন ডলার, মানে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা।'

মনুজেন্দ্র মুখটা ভেবলে চেয়ে আছে। নিশ্চুপ।

'তবে সেই চুরি যাওয়া ছবিগুলোর মধ্যে একটি অন্য পেইন্টিংও ছিল। বলা হয় আজ অবধি যত পেইন্টিং চুরি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে দামি এইটি। ছবির নাম 'দ্য কনসার্ট।' শিল্পীর নাম ভারমিয়ার।

জোহানেস ভারমিয়ার হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ডাচ শিল্পী। যাকে বলে ওয়ান অফ দ্য ওল্ড মাস্টার্স। ভদ্রলোক মারা যান ষোলশো পঁচাত্তর সালে। বিখ্যাত হলে কী হবে, আশ্চর্যের বিষয় হল আজ অবধি ভদ্রলোকের আঁকা চৌত্রিশটির বেশি অরিজিনাল পাওয়া যায়নি। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি বোধহয় গার্ল উইথ আ পার্ল ইয়ারিং। চিত্রকলা সম্পর্কে সামান্য উৎসাহ আছে এমন যে কেউ এই ছবি দেখা মাত্র চিনবে।

এই চৌত্রিশটি ছবিই অমূল্য। তবে তাদের মধ্যেও অমূল্যতম হচ্ছে দ্য কনসার্ট। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন ব্যক্তি পিয়ানো বাজাচ্ছেন। দর্শক শুধু তাঁর পিঠ আর কাঁধ অবধি নেমে আসা চুল দেখতে পাচ্ছে। বাদকের দুই পাশে দুই মহিলা। বাঁদিকের মহিলা বসে, ডানদিকের মহিলা দাঁড়িয়ে। পিয়ানোর ডালার দুইপাশে দেওয়ালে দুটি ছবি ঝুলছে। এই হচ্ছে দ্য কনসার্ট। উনিশশো নব্বই সালের আঠেরোই মার্চ ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে যে ক'টি ছবি চুরি যায়, তার মধ্যে সবথেকে দামি ছবি এইটিই। দাম ধরো দেড়শো মিলিয়ন ডলার, মানে বারোশ কোটি টাকা।'

'মা-মা-মানে আপনি বলতে চাইছেন যে একটা বারোশো কোটি টাকা দামের ছবি ওই বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন বরেন মজুমদার? আর তাই জন্য এই খুন?'

'বলতে চাইছি না মনু, বলছি। তুমি সূত্রগুলো এক এক করে জোড়ো। প্রথমত, বরেন মজুমদার যে ছড়াটা লিখে গেছেন তার শেষের দিকটা মনে করো। তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে মস্ত খনি গানের, মীড়ের টানে ভারী সে-গান যেন করিম খানের। এখানে গানের খনি বলতে কনসার্ট, আর মীড়ের টান বলতে ভারমিয়ারের কথা বলা হচ্ছে—মেনে নিতে কি খুব অসুবিধা হচ্ছে মনু? দ্বিতীয়ত, খুন হওয়ার আগে তাঁর কাছে তিনটে বাদ্যযন্ত্রের ছবি পাঠান হয়। তিনটে বাদ্যযন্ত্রই কনসার্টে বাজানো হয়। সেই ছবিগুলো দেখে এত উতলা হয়ে পড়লেন কেন মজুমদারবাবু?

আর তৃতীয় যুক্তি, এটাই মোক্ষম। দ্য কনসার্ট চুরি হয় উনিশশো নব্বই সালের মার্চ মাসে। ওই বছরেরই ডিসেম্বরে বরেন মজুমদার তাঁর বাল্যবন্ধুকে লিখছেন যে, তাঁর কোনও এক ঘরপালানো গ্রামতুতো ভাইপোর কাছ থেকে তিনি একটা জিনিস পেয়েছেন। তার বিবরণ তিনি চিঠিতে দেননি। কিন্তু লিখেছেন যে, তবে বলতে পারি এর থেকে দুর্মূল্য কিছু আমি জীবনে ছুঁয়ে দেখিনি। এখন এটাকে কীভাবে কোথায় রাখব সেটাই চিন্তার। মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই দেশে ফিরতে হবে।'

সব কটা সূত্র যদি জোড়া যায়, তাহলে বলতেই হবে যে প্রফেসর বরেন মজুমদারের হাতে তাঁর ওই গ্রামতুতো ভাইপোর সুবাদে ভারমিয়ারের আঁকা 'দ্য কনসার্ট' নামের বহুমূল্য বা বলা ভালো অমূল্য ছবিটি এসে পড়েছিল। কীভাবে এসে পড়েছি, এতদিন পর সে জানার আর উপায় নেই। শুধু বলতে পারি এতদিন পর কোনওভাবে কেউ বা কারা তার খোঁজ পেয়েছে, এবং সেটি উদ্ধার করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মনুজেন্দ্র লাফ দিয়ে উঠল, 'তার মানে আমাদের সন্দেহের সার্কেল তো ছোট হয়ে এল স্যার।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ভুল করছ মনু। আদালত এভিডেন্স ছাড়া কিচ্ছু বিশ্বাস করবে না। এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হল সবই থিওরি। অপরাধীকে হাতে নাতে ধরতে হলে ঠোস সাবুদ চাই হে বাপু। সে প্রমাণ তুমি পাবে কোথা থেকে? আর মোডাস অপারেন্ডিটাই বা প্রমাণ করবে কী করে?'

মনু হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

চোখ বুঁজে বসে রইলেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন, 'হতাশ হোয়ো না মনু। এতটা যখন সলভ করতে পেরেছি, বাকিটাও পারব। জাস্ট একটু ভাবতে দাও। তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। পাখি তো উড়ে যাবেই, অমন অমূল্য ছবিটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কালকের দিনটা আমাকে একটু গুছিয়ে নিতে দাও।'

* * *

পরের দিনটা প্রফেসর মুখার্জির গেল ব্যস্ততার মধ্যে। সকালে উঠেই কয়েকটা ফোন করলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ল্যাপটপে বসে ইন্টারনেটে কীসব সার্চ করলেন। শেষ হতে হতে বেলা বারোটা। আজ চারটে থেকে ক্লাস আছে। এই ক'দিন তদন্তের চক্করে ছুটি নিয়েছেন, আজ ক্লাস না নিলে চলবে না। সামনেই ফাইনাল ইয়ারের ছেলেদের লাস্ট সেমিস্টারের এক্সাম। সিলেবাস শেষ করতেই হবে।

* * *

বিকেল চারটে নাগাদ মুখার্জিসাহেবকে দেখা গেল হাইকোর্ট চত্বরে। আজ সোমবার। কাল কোট পরা উকিল আর আইনের প্যাঁচে হয়রান সাধারণ মানুষের চক্করে এলাকা একেবারে ছয়লাপ। মানুষ গলতে পারে এমন জায়গা নেই। ফুটপাত

জেরক্সশপ, আইনি বইয়ের দোকান, টাইপরাইটারওয়ালা, আর হকারদের ভিড়ে একেবারে নরক গুলজার। তার মধ্যে প্রফেসর মুখার্জি একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছিলেন। শ্যেন দৃষ্টি ছিল কোর্টে ঢোকার রাস্তাটার ওপর।

একটু পরেই এক ছোটখাটো চেহারার টাকমাথা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। প্রফেসর মুখার্জি সিগারেটটা ফেলে দ্রুত অনুসরণ করলেন ভদ্রলোককে। টাকমাথা তখন দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মস্ত বড় বিল্ডিংটার দিকে। প্রফেসর মুখার্জি মাঝে মাঝেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলছিলেন ভদ্রলোককে। অবশেষে রাস্তা পেরোতে গিয়ে ধরতে পারলেন। পিঠে হাতের ছোঁয়া পেয়ে টাকমাথা প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, 'আরে মুখার্জি স্যার যে! কী খবর? হঠাৎ এই পাড়ায়?'

'আর বলবেন না। একটা প্রপার্টি রিলেটেড কাজে এদিকে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখি আপনি সামনে সামনে হেঁটে চলেছেন।'

'মুখার্জি স্যার, আপনি শখের গোয়েন্দা হতে পারেন, আমি কিন্তু সরকারী অটোপ্সি সার্জেন। একটু আধটু গোয়েন্দাগিরি আমাকেও করতে হয়। এবার ঝেড়ে কাশুন তো মশাই। কেসটা কী, যে আমাকে হাইকোর্ট অবধি ধাওয়া করতে হল?'

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেললেন প্রফেসর মুখার্জি। তারপর বললেন 'আসলে বরেন মজুমদারের কেসটা নিয়ে বাজেভাবে ফেঁসে গেছি সাহেব। কিছুতেই কোনও আলোর দিশা পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথা বলে যদি কিছু ক্লু পাই।'

'সেদিন যা জিগ্যেস করলেন তো বলে দিলাম। এর বেশি কী জানাতে পারি বলুন।'

'সেদিন আপনি বললেন যে বিষটা মজুমদারবাবুর শরীরে পাওয়া গেছে তার পরিমাণ দেখে বোঝা যায় যে বিষটা খাবারের সঙ্গে বডিতে গেছে না ইনজেকশনের সঙ্গে, রাইট?'

'রাইট। একটা বিষ কতটা প্রাণঘাতী, তার একটা ইউনিট আছে, এলডি ফিফটি। এর সংজ্ঞা, মাপার পদ্ধতি এসব আর বললাম না। এলডি৫০ বোঝান হয় কতটা ওজনের বিষ কতটা ওজনের টেস্ট সাবজেক্টের শরীরে প্রবেশ করেছে সেই দিয়ে। অর্থাৎ মিলিগ্রাম বা গ্রাম পার কিলো হিসেবে। সেরকম তাগড়া বিষ হলে, যেমন বটুলিয়াম, ন্যানোগ্রামেও মাপা হয়। কোনও বিষের টক্সিসিটি ডিপেন্ড করে কীভাবে বিষটা প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ওপর। আবার ইন্ট্রাভেনাস দিলে একই বিষের মারণক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।'

'এখানে বরেন মজুমদারের শরীরে যে বিষটা পাওয়া গেছে তার অ্যামাউন্ট বললেন ছশো ন্যানোগ্রাম?'

'রাইট। অর্থাৎ শরীরে প্রবেশ করার পরেও অতটা ভিসেরাতে পাওয়া যায়। মানে কম করে হাজার ন্যানোগ্রাম তো ওনাকে দেওয়াই হয়েছিল।'

'এবং সেটা কাজ শেষ করেছে সাত আট ঘণ্টা বাদে। রাইট?'

'রাইট। বরেন মজুমদারের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে রাত আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। অর্থাৎ বিষটা ওঁর শরীরে ঢোকে রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে।'

'সেখানেই তো বড় অসঙ্গতি রয়ে গেছে স্যার। ওইদিন বরেন মজুমদার রাত সাড়ে আটটা-ন'টার মধ্যে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন। এই তথ্যে সন্দেহ করার মতো কোনও কারণ নেই। বরেন মজুমদার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতেন। তিনি শুয়ে পড়ার পর ওই ঘরে কেউ গেছে তার কোনও প্রমাণ নেই। ওই ঘরে বাইরে থেকে কেউ ঢুকেছে, তারও কোনও প্রমাণ নেই। খাবার দাবারে বা থালা বাসনে বিষের কোনও ট্রেস নেই। একেবারে পারফেক্ট ক্লোজ ডোর মার্ডার কেস। কী করে সলভ করব বুঝতে পারছি না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রবীণ অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পাল, 'সে ব্যাপারে আমার কোনও আইডিয়া নেই স্যার। বিষটা ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছিল, এইটুকুই বলতে পারি।'

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন প্রফেসর মুখার্জি। পাশেই একটা পান দোকান ছিল। বললেন, 'একটা গোল্ড ফ্লেক লাইট দিন তো।'

পালমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী! আপনি সিগারেট খান বলে তো জানতাম না।'

'আরে মশাই এমন ফাঁসান ফেঁসেছি যে, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে চলছে না। আপনি খাবেন নাকি একটা?'

'না স্যার। আমার নেশা অন্য।' এই বলে পকেট থেকে একটা খইনির ডিবে বার করলেন বটকৃষ্ণ পাল। তার একদিকের মাথা খুলে খানিকটা খইনি বার করলেন। অন্যদিকের মাথা খুলে অতি সামান্য চুন। তারপর দুটো মিশিয়ে ডান হাতের তালুতে বাঁহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলতে লাগলেন। প্রায় আধ মিনিট ডলার পর খইনির মণ্ডটা ডানহাত থেকে বাঁহাতে নিয়ে, ডানহাতে লেগে থাকা খইনির গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে, তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে খইনির মণ্ডটা নীচের ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে গুঁজে সলজ্জভাবে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আসলে জন্মেছিলাম বিহারে, ভাগলপুরে। কলকাতায় কলেজে পড়তে আসার আগে ওখানেই ছিলাম। তাই কিছু কিছু অভ্যেস ছাড়তে পারিনি আর কি! বউ তো আমাকে খোট্টা বলে ডাকে মশাই। এমন কী বন্ধুবান্ধবরাও যা তা বলে। সেসব আর আপনার সামনে মুখে আনা যাবে না...'

এত কথা শুনছিলেন না প্রফেসর মুখার্জি। তিনি শুধু এক দৃষ্টিতে বটকৃষ্ণ পালের নড়তে থাকা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখে মনে হল, যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ছে, সেদিকে খেয়াল নেই।

পালমশাই একবার বললেন, 'কী হল? ও মশাই... সমাধিস্থ হলেন নাকি?'

হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি। কিছু না বলে সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর দৌড়তে লাগলেন কার পার্কিং-এর দিকে।

বটকৃষ্ণ পাল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'পাগলা প্রফেসর মাইরি।'

* * *

শেষ ফোনটা রেখে হাসিমুখে মনুজেন্দ্রর দিকে তাকালেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ফাঁদ পাতা শেষ হে মনু। এবার শুধু ম্যাজিক দেখে যাও।'

এতক্ষণ ধরে প্রফেসর মুখার্জির কার্যকলাপ দেখছিল মনুজেন্দ্র। তিনি সন্ধে থেকে এই কেসের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে ফোন করে একটি কথাই বলেছেন, 'কাল সকাল দশটায় মজুমদার ভিলায় আসুন, রহস্য উন্মোচন হবে।'

প্রত্যেকে দুটো প্রশ্ন জিগ্যেস করেছেন। এক, কে সেই খুনি। দুই, কী করে ধরা পড়ল সে।

প্রফেসর মুখার্জির বাঁধা গতে উত্তর, কে খুনি সে কাল এলেই জানতে পারবেন। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, কে খুনি শুধু তাই নয়, এমনকি সে কী ভাবে খুন করেছে এবং কেন তাও জানা গেছে। কালকে তার সুস্পষ্ট কিনারা হয়ে যাবে। চাই কি নিজের চোখে অপরাধীকে হাতকড়া পরানো হচ্ছে সেও দেখতে পারেন।

কী করে ধরা পড়ল খুনি?

তারও উত্তর দিয়েছেন মুখার্জিসাহেব। বলেছেন অপরাধী একটি মস্ত ভুল করেছে, মার্ডার ওয়েপনটি নিজের কাছে রেখে। শুধু এই একটা কারণ, মাত্র এই একটা কারণেই তাকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেছেন প্রফেসর মুখার্জি। মার্ডার ওয়েপনটাও কাল সবার সামনে বার করে দেখাবেন প্রফেসর মুখার্জি।

ফোনগুলো করে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল প্রফেসর মুখার্জিকে। কোর্ট থেকে ফিরে এসে সোজা ঢুকেছিলেন স্নান করতে। তারপর বিকেল থেকে শ্রীমদ্ভগবতগীতায় এতই বুঁদ হয়েছিলেন যে মনুজেন্দ্রকে দেখেও প্রথমে সাড়াশব্দ করেননি। শেষে গিন্নি এসে দুটো কড়া কথা বলাতে মুখার্জিসাহেবের ধ্যানভঙ্গ হয়েছে।

'হঠাৎ শ্রীমদভগবদগীতা?'

'অনেক পরিশ্রমের পর ফল পেলে গীতা টিতা পড়তে হয় হে। এখানে একটা ভারি দামি কথা লেখা আছে, বুঝলে। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন। মানে কর্মে তোমার অধিকার ফলে নয়।'

'মানে কেস সলভ করাতে আমার অধিকার, প্রমোশনে নয়। বুঝেছি। তা কী জ্ঞানটা লাভ করলেন স্যার?'

'হুঁ-হুঁ বাওয়া, জ্ঞানের কী শেষ আছে! গোয়েন্দা হতে গেলে গীতাঞ্জলি টু অ্যাঞ্জেলিনা জোলি সব জানতে হয় বাপু। এই যেমন ধরো তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরিবার, কটি ছেলেমেয়ে এসব ব্যাপারে কিছু জানতে।'

'নাহ্। কেন বলুন তো স্যার?'

'ওই জন্য বলি মনু, একটু ধর্মকর্মে মন দাও। শ্রীমদভগবদগীতাটা পড়া থাকলে এই কেস তুমি অনেক আগেই সলভ করে ফেলতে পারতে।'

'উঃ! আবার হেঁয়ালি? একটু কাজের কথা বলবেন স্যার?'

কাজের কথা অনেকটাই বলেছিলেন প্রফেসর মুখার্জি, কিছু রেখেঢেকে। শুনতে শুনতে চিবুক শক্ত হয়ে উঠেছিল মনুজেন্দ্রর।

তারপরেই ফোন করা শুরু করলেন প্রফেসর মুখার্জি। প্রথমেই প্রমিতেন্দ্রকে। কারণ তাঁর বাড়িতেই আসর বসবে। তাঁর অনুমতিটাই আগে দরকার। তারপর একে একে মনোজ চাকলাদার থেকে শুরু করে সব্বাইকে। এমনকি মিনতি অবধি।

'আর কাল যদি চিড়িয়া না আসে?'

'আসবে হে আসবে।' দুলে দুলে বলেন মুখার্জিসাহেব, 'যে মুহূর্তে আমি তাকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছি সেই মুহূর্তে সে জানে যে আমি জানি। তার এখন পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাকে আসতেই হবে। না এলে সে নির্ভুলভাবে নিজেকে চিহ্নিত করে ফেলবে।'

'তাহলে....'

'চিড়িয়ার বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা আছে তো?'

'তা আছে। পালাতে চাইলেও পারবে না।'

'বেশ। তাহলে যেমন বললাম তেমনই করতে বোল তোমার টিমকে। আপাতত গাত্রোত্থান করো হে। রাতের খাবারটা। খেয়ে নিয়ে মাছ ধরতে যাই।'

'মাছ ধরতে?'

'ওই হল। যাই হোক গে, বলছি কি পার্ক স্ট্রিটের টুং ফং এর চাইনিজ তোমার ভালো লাগে না মনু?'

* * *

এডিজি মনোজ চাকলাদার পৌঁছে গিয়েছিলেন পৌনে ন'টাতেই, তাঁর মামাবাবুকে বগলদাবা করে। ডাক্তার হরগোবিন্দ সরকার গাঁইগুঁই করছিলেন। তাঁকে এডিজি সাহেব ফোনে দুটো কড়া ধমক দিতেই তিনি সুড়সুড় করে এসে হাজির হয়েছেন। সুরেশ আগরওয়াল একদিকে চুপ করে বসে আছেন। মজুমদার ভিলার সমস্ত কর্মচারীরা উপস্থিত। নার্স চারুমতীও এক কোণে একটা টুলে বসে আছেন। দরজার কাছে মনুজেন্দ্র দাঁড়িয়ে।

ঘড়িতে ঠিক সাড়ে দশটা বাজতেই উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর মুখার্জি। তাঁকে ভারমুক্ত দেখাচ্ছে। উপস্থিত বাকিদের মুখ থেকে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে সে কী প্রবল টেনশনে আছেন তাঁরা।

'যে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রেই তিনটে বিষয় জড়িয়ে থাকে। এক, কীভাবে অপরাধটা সংঘটিত হল। দুই, কে বা কারা করল। তিন, কেন করল। সচরাচর তিনটের মধ্যে একটা বা দুটো প্রথম থেকেই জানা থাকে। যেমন কেন করা হল, অর্থাৎ মোটিভ। অথবা কীভাবে করা হল, মোডাস অপারেন্ডি। এই দুটো জানা থাকলে অপরাধীকে বা অপরাধীদের চিহ্নিত করা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

বরেন মজুমদারের খুনের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছিল

আমরা মোটিভ আর মোডাস অপারেন্ডি, দুটোর কোনওটা নিয়েই কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অমন অজাতশত্রু লোকের যে কোনও শত্রু থাকতে পারে সেটাই ভাবতে পারছিল না কেউ। বিষয়টা আরও ঘুলিয়ে দিচ্ছিল খুনের ধরন। অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পাল জানান যে বরেনবাবুকে যে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়, সেটি ইঞ্জেকশন দিয়ে নয়, ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছিল। খুন হওয়ার দিন উনি সবার সঙ্গে খাবার খান। সেই খাবারে বা থালাবাসনে বিষের ট্রেস পাওয়া যায়নি স্বাভাবিকভাবেই। নইলে বিষের প্রভাব বাকিদের ওপরেও পড়ত। পালমশাই আরও জানান যে মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে মোটামুটি বলা যায় যে বিষটা বরেনবাবুর শরীরে প্রবেশ করেছিল রাত ন'টা থেকে দশটার পরে। কিন্তু তখন উনি ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে কেউ ঘরে প্রবেশ করেনি। আ পারফেক্ট ক্লোজড ডোর মার্ডার!

ফলে আমরা বিষয়টা অন্যদিক থেকে ভাবতে বাধ্য হলাম। কেন খুন হলেন বরেন মজুমদার?

আমরা জানতে পারলাম যে বরেন মজুমদার খুব সাবধানী জীবন যাপন করতেন। নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর একটা অবসেশন ছিল। সেটা অস্বাভাবিক নয়, অনেকেরই থাকে। কিন্তু তাঁর ছোটবেলার বন্ধু কাম ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাক্তার সরকার জানালেন যে খুব একটা ডাকাবুকো না হলেও বিলেত থেকে ফেরার পরেই তিনি ভিতু হয়ে পড়েন। তার পর থেকেই সিকিউরিটি নিয়ে তাঁর অবসেশন শুরু।

কেন? বিলেতে এমন কী হয়েছিল যার জন্য দেশে ফিরেও এত সতর্ক থাকতেন বরেন মজুমদার?

ডাক্তার সরকার আমাদের এও জানান যে বিলেতে থাকাকালীন প্রফেসর বরেন মজুমদার তাঁর বাল্যবন্ধুকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সেরকমই এক চিঠিতে তিনি জানান যে, তাঁর জনৈক গ্রামতুতো ভাইপো, নাম কুঞ্জবিহারী সামন্ত, তাঁর কাছে একটি বহুমূল্য জিনিস গচ্ছিত রেখে যায়। শুধু তাই নয়, প্রফেসর মজুমদার লিখেছেন যে জিনিসটার নিরাপত্তা নিয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত। সেই জন্যই তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হবে। কী ডাক্তার সরকার, ঠিক বলছি তো?'

ডাক্তার সরকার মাথা নাড়িয়ে জানালেন, প্রফেসর মুখার্জি যা বলেছেন সবই ঠিক।

তদন্তের মাঝামাঝি আমাকে একদিন লাঞ্চে ডাকেন শ্রীসুরেশ আগরওয়াল। ইনি একজন শিল্পপতি এবং আর্ট কনৌসিয়র। বরেনবাবুর কলেজবেলার বন্ধুও বটে। কথাসূত্রে তিনি আমাদের একটি আশ্চর্য ছড়া শোনান, বরেন মজুমদারের লেখা ছড়া। ছড়াটা এরকম,

আলমারিময় ছড়িয়ে আছে বিখ্যাত সব কেতাব/ দশের বেশি দুই পেয়েছে সেখুপীরের খেতাব। তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে মস্ত খনি গানের, মীড়ের টানে ভারী সে-গান যেন করিম খানের!

কবিতাটা নাকি উনি ওঁর কাছের লোকজনদের সবাইকে মুখস্ত করিয়ে

রেখেছিলেন। একরকম জোর করেই। কারণ?

প্রমিতবাবুর কথামতো বরেনবাবু বিলেত থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিতে যেতেন। এরকমই কোনও একটা ট্যুরে একবার তিনি একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। তারপরেই নাকি এই ছড়াটা লেখেন এবং কাছের লোকেদের মুখস্ত করিয়ে রাখেন। ওঁরাও এটা বরেনবাবুর একটা খেয়াল বলে এ নিয়ে আর বেশি নাড়াঘাঁটা করেননি।

শুধু একজন করেছিলেন। তিনি ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এর পিছনে একটা রহস্য আছে। হয়তো ডাক্তার সরকার ছাড়াও আরও দু একজন কাছের বন্ধুকে চিঠি লিখতেন বরেন মজুমদার। অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে বরেনবাবু এনাকেও চিঠি লিখে কুঞ্জবাবুর এনে দেওয়া সেই বহুমূল্য বস্তুটির কথা জানান।'

নড়েচড়ে বসলেন সুরেশ আগরওয়াল। গম্ভীরগলায় বললেন, 'আই অবজেক্ট অ্যাট ইওর চয়েস অফ ওয়ার্ডস প্রফেসর মুখার্জি। দ্যাটস আ ভেরি ডেরোগেটরি রিমার্ক। বাট, ইয়েস, এরকম একটা কথা আমাকে বহুদিন আগে বরেন জানিয়েছিল বটে। আজ আপনি বললেন বলে মনে পড়ল।'

'মনে আপনার চিরকালই ছিল আগরওয়াল সাহেব। ইন ফ্যাক্ট আমার ধারণা, চিঠিটা আপনি যত্ন করে নিজের কাছে রেখেছেন। ডাক্তার সরকারের মতো আপনিও ওঁকে দেশে ফিরে আসার আগে অনেকবার খোঁচান জিনিসটা কী জানতে চেয়ে। কিন্তু তিনি জানাননি। শুধু তাই, নয়, বরেন মজুমদারের লেখা ছড়ার সঙ্গে যে ওই দামি জিনিসটার যোগ আছে আপনি সেটাও অনুমান করেছিলেন। শুধু জিনিসটা যে কী সেটা অনুমান করতে পারেননি।'

'আপনার কী বক্তব্য, সেই জন্যই আমি বরেনকে বিষ খাইয়ে মেরেছি? তাও অশরীরীর মতো ওর ঘরে ঢুকে? রিডিকুলাস!'

'আহা, চটেন কেন? কী করে বরেন মজুমদার খুন হলেন, সেটা ধীরে প্রকাশ্য। আগে কেন খুন হলেন সেটা খোলসা করি।

এইসব সূত্র ধরে, আমরা নিঃসন্দেহ হই যে বরেন মজুমদারের কাছে বিলেতে থাকাকালীন একটি বহুমূল্য, বস্তুত অমূল্য চিত্রকলা এসে পৌঁছয়। চিত্রকলাটির নাম দ্য কনসার্ট, জোহানেস ভারমিয়ার নামে এক ডাচ চিত্রশিল্পীর আঁকা। উনিশশো নব্বই সালে বোস্টনের ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার মিউজিয়ামে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। চোরেরা মোট তেরোটি অমূল্য ছবি চুরি করে নিয়ে যায়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এইটি। ধরা হয়, আজ অবধি চুরি যাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান ছবি হচ্ছে দ্য কনসার্ট। বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করেন খুঁজে পাওয়া গেলে এর দাম দাঁড়াবে প্রায় বারোশো কোটি টাকা।'

মনুজেন্দ্র যেহেতু জানত তাই অতটা চমকাল না। বাকিদের চক্ষু কপালে উঠল! এডিজি চাকলাদার রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন, 'কী বলছেন মামাবাবু?'

'একদম ঠিক বলছি এডিজি সাহেব। এবং আমি জানি, ছবিটা কোথায় রাখা

আছে। এই বাড়িতেই আছে, সবার চোখের সামনে।'

ঘরের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। সেদিকে মন দিলেন না প্রফেসর মুখার্জি। বলতে থাকলেন,

'বহুমূল্য জিনিসটা যে একটা পেইন্টিং হতে পারে আন্দাজ করেছিলেন সুরেশ আগরওয়াল। যেভাবে আমি যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, ঠিক সেভাবেই তিনিও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শুধু তিনি জানতেন না কোন ছবি। ওই যে বললাম, গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে মোট তেরোটা ছবি চুরি গেছিল। তার মধ্যে কোনটা বরেন মজুমদারের ভাগ্যে এসেছিল সেটা আন্দাজ করতে পারেননি তিনি। পারলেন যেদিন দৈবগতিকে এমন একজন মানুষের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল, যাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুরেশ আগরওয়াল বুঝে গেলেন কোন সাত রাজার ধন এক মানিক বুকে করে এতদিন আগলে রেখেছেন মজুমদারমশাই।

খুন হওয়ার কয়েক দিন আগে পর পর তিন দিন তিনটে ছবি পান বরেনবাবু। প্রথমটায় একটা পিয়ানো। দ্বিতীয়টায় একটা ভায়োলিন, তৃতীয়টায় একটা স্যাক্সোফোন। তিনটেই কনসার্টে প্রয়োজন হয়। বরেনবাবু বুঝে গেলেন যে কেউ বা কারা তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখা ছবিটির খোঁজ পেয়ে গেছে। তিনি উতলা হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে, যিনি নিজেই এই ছবিগুলো তাঁকে পাঠিয়েছেন। কী সুরেশবাবু, ঠিক বলছি তো?'

সুরেশ আগরওয়াল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'এডিজি সাহেব স্বয়ং উপস্থিত আছেন বলে উঠে যেতে পারছি না। নইলে এসব ফালতু বকোয়াস শোনার সময় আমার সত্যিই নেই। এনিওয়ে, আপনার গাঁজাখুরি গপ্পটা শেষ করুন। আমার অন্য কাজ আছে।'

'আহা তাড়া কীসের। পুরো গল্পটা বলি আগে।

আমাকে সবার আগে ভাবাচ্ছিল খুনের পদ্ধতিটা। বিষটা যখন বরেনবাবুর শরীরে ঢোকে তখন উনি একা, বন্ধ দরজার ওপাশে। তাঁর ডিনার করা হয়ে গেছে। ডিনারের বাসনে বা খাবারে বিষের ট্রেস নেই। তাহলে খুনি তাঁকে বিষটা খাওয়াল কখন?

তারপর সেদিন হাইকোর্টের সামনে অটোপ্সি সার্জেন বটকৃষ্ণ পালের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার সময় কথাটা বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেল। বিষয়টা এতই সোজা! কেন যে আমার মাথায় ঢোকেনি বুঝতে পারছিলাম না।

পালমশাই বার বার বলছিলেন যে বিষটা ইন্ট্রাভেনাস পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়নি, ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে। আর আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বিষটা উনি খাওয়ারের সঙ্গে শরীরে নিয়েছেন। অথচ খাওয়া ছাড়াও বিষ ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা যায়, যেমন খইনির সঙ্গে, বা দোক্তার সঙ্গে।

অথচ বরেন মজুমদার এসব নেশার ধারেকাছেও যেতেন না। তাহলে?

মনে পড়ে গেল, প্রথম যখন প্রমিতবাবু তাঁর বাবার দিন কীভাবে কাটত বলছিলেন, তখন বলেছিলেন যে বরেনবাবু রাতে ডিনার করে দাঁত মেজে ওষুধ

খেয়ে ঘুমোতে যেতেন। অথচ ওষুধের অ্যাম্পুলে বিষ পাওয়া যায়নি। তাহলে বাকি থাকে একটাই উপায়, টুথপেস্ট।

সেদিন যখন বরেন মজুমদারের শোওয়ার ঘর আর আশপাশ ঘুরে দেখছিলাম, তখন এমন একটা অসঙ্গতি আমার অবচেতনে ধরা পড়েছিল যেটা তখন বুঝতে পারছিলাম না। বটকৃষ্ণ পালকে খইনি খেতে দেখে বুঝলাম সেটা কী। বরেন মজুমদারের বাথরুমে ওয়াশ বেসিনে সব ছিল, স্রেফ টুথপেস্ট ছিল না। মানে, পরদিন যখন গোলমাল চলছে, খুনি টুক করে টুথপেস্টের টিউবটা নিয়ে সটকে পড়ে। যাতে বাই চান্স পুলিশ এটা ফরেনসিকে দিলেও বিষের উৎস ধরা না পড়ে।

কিন্তু এখানেই খুনি তার একমাত্র ভুলটা করে। সে বিষাক্ত টুথপেস্টের টিউবটা তুলে নিয়ে গেলেও, তার বদলে সেম ব্র্যান্ডের অন্য টিউব রেখে যায়নি। গেলে তাকে ধরা অসম্ভব হতো।

এখন কে হতে পারে সেই খুনি, যে ভয়ঙ্কর বিষ মেশানো টুথপেস্টের টিউব রেখে দিয়েছিল বরেন মজুমদারের বেসিনে? একজনই, যাঁকে অন্ধভাবে স্নেহ করতে শুরু করেছিলেন বরেন মজুমদার! এমনকী সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মানুষটি যাঁর হাত দিয়ে নিজের ওষুধ টুথপেস্ট শেভিং জেল এসবও আনাতে শুরু করেছিলেন। এবং যিনি অবাঙালি হয়েও এতক্ষণ ধরে তন্ময় হয়ে আমাদের কথা শুনছেন। একবারও উশখুশ করেননি।'

চারুমতী সচকিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আপ কেয়া বোল রহে হ্যায় মুঝে কুছ সমঝমে নেহি আ রহা হ্যায়।'

'হাঃ, হাঃ! আপনি সব বুঝছেন মিস চারুমতী সাওয়ান্ত, ডটার অফ লেট কুঞ্জবিহারী সামন্ত। অ্যান্ড মার্ডারার অফ বরেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

ঘরের মধ্যে একটা বোম ফাটলেও বোধহয় লোকে এত চমকাত না। চারুমতী স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসর মুখার্জির দিকে।

'বাংলাটা আপনি চমৎকার বোঝেন মিস সামন্ত। হাজার হোক, বাপ যখন বাঙালি। হয়তো ভালো বলতে পারেন না। আপনার মা বোধহয় মারাঠি, তাই না? সাওয়ান্তটা কি মায়ের উপাধি নাকি বাবার উপাধিটাই একটু বদলে মারাঠি করে নিয়েছেন?'

চারুমতী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ইশারায় তাঁকে চুপ করতে বললেন প্রফেসর মুখার্জি। 'ঘরের বাইরেই লেডি পুলিশ অপেক্ষা করছে মিস সামন্ত। ভারতের আইন অনুযায়ী আপনি উকিলের সাহায্য পাবেন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সমস্ত সুযোগ পাবেন। আপাতত যা বলছি শুনে যান।

বহুমূল্য ছবিটা কী করে কুঞ্জবিহারীবাবুর কাছে আসে সে হয়তো কোনওদিনই জানা যাবে না, এক যদি না তিনি নিজের মেয়েকে বলে যান। তবে এটা নিশ্চয়ই জানিয়ে যান একটি বহুমূল্য পেইন্টিং তিনি তাঁর জনৈক গ্রামতুতো দাদার হাতে দিয়েছিলেন, যার মূল্য টাকায় ইয়ত্তা করা যায় না।

আমার ধারণা পেইন্টিংটা বরেনবাবুর হাতে দিয়ে কুঞ্জবিহারী বিলেত থেকে

হাওয়া হয়ে যান। বেনামে বা অন্য কোনও উপায়ে ফিরে আসেন ভারতে। তবে কলকাতায় আর ফেরেননি। সমুদ্র যার একবার ভালো লাগে ডাঙা তাকে আর টানে না। তিনি ঘাঁটি গাড়েন মুম্বইতে। বিয়ে করেন এক মারাঠি মহিলাকে, যিনি পেশায় ছিলেন কে ই এম কলেজের নার্স। কী মিস সামন্ত, ঠিক বলছি তো?'

আচমকা ভাঙা বাংলায় চেঁচিয়ে ওঠেন চারুমতী, 'হ্যাঁ, বেশ করেছি বিষ দিয়ে মেরেছি বুড্ঢাটাকে। আমার বাবার হকের সামান ওটা। ওটা এখানে পড়ে থাকবে আর আমরা মুম্বইয়ের চওলে পড়ে থাকব? কভি নেহি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর মুখার্জি, 'ওটা চোরাই মাল মিস সামন্ত। আপনার বাপের হকের সামান মোটেও না। সে যাই হোক। আমরা এও খোঁজ নিয়ে জেনেছি, যে বছরে আপনার পাশ করার কথা সেই বছর বা তার আগে পিছে তিন বছরের মধ্যে কে ই এম কলেজের নার্সিং স্ট্রিমে চারুমতী সাওয়ান্ত বলে কোনও স্টুডেন্ট নেই। বরং ওখানে মেডিসিন বিভাগে গবেষণা করতেন এমন একজন ফিজিওলজির স্টুডেন্ট-এর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে, যার নামের সঙ্গে আপনার নাম মিলে যায়। বিষটা কি ওখান থেকেই হাতসাফাই করেছিলেন মিস সামন্ত?'

চারুমতী দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। প্রফেসর মুখার্জি বলতে থাকলেন, 'আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ভদ্রমহিলা মুম্বাই থেকে চাকরি করতে কলকাতায় এসেছেন শুনে। সচরাচর আমরা উল্টোটাই শুনে থাকি। তখন থেকেই মাথায় একটা সন্দেহের কাঁটা টিকটিক করতে থাকে। বাকিটা তো শুনলেনই। তবে মিস সামন্তকে একটা প্রশ্ন, বরেন মজুমদারের পরিবার আর বন্ধুবান্ধবের খোঁজ পেলেন কীসে? ইন্টারনেট ঘেঁটে নিশ্চয়ই? আর সুরেশ আগরওয়ালের সঙ্গে আপনিই যোগাযোগ করেছিলেন তাই তো?'

মুখ ঢাকা অবস্থাতেই মাথা নাড়লেন চারুমতী।

'সুরেশবাবুও দেখলেন একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। তিনি কমন ফ্রেন্ড ডাক্তার হরগোবিন্দ সরকারকে ধরে আপনাকে নার্স হিসেবে ঢুকিয়ে দিলেন মজুমদার বাড়িতে। আপনার মা নার্স ছিলেন, তাই বেসিক নার্সিং আপনার জানাই ছিল। ভেক ধরতে অসুবিধা হয়নি। প্ল্যান ছিল আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পেইন্টিংটার হদিশ পেয়ে সেটাকে উদ্ধার করা। কী ম্যাডাম ঠিক বলছি তো?'

এডিজি সাহেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু তাহলে খুনটা করার দরকার হল কেন মামাবাবু?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর মুখার্জি। 'বরেন মজুমদারের বোধহয় কোনও কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। মারা যাওয়ার দিন তিনি ডাক্তার সরকারের কাছে যান চারুমতীর ব্যাপারে খোঁজ খবর করার জন্য। দৈবগতিকে কথাটা ডাক্তার সরকার বলে ফেলেছিলেন সুরেশ আগরওয়ালকে। কী তাই তো ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আসলে সুরেশের মাধ্যমেই মেয়েটাকে পেয়েছিলাম তো। তাই ভাবলাম ওকে জানাই। ও খুশি হবে।'

'খবরটা শুনেই সুরেশবাবু বোঝেন যে চারুমতীকে নিয়ে বরেনবাবুর মনে

সন্দেহ জেগেছে। তিনি দৌড়ে আসেন মজুমদার ভিলায়। মজুমদার সাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। বরেনবাবু ভয় দেখান যে তিনি সব ফাঁস করে দেবেন। আগরওয়ালসাহেব চলে যান বটে, তার আগে বিষ ভরা টুথপেস্টের টিউবটা চারুমতীকে দিয়ে যান। বাকিটা তো আপনারা এখন জানেনই।'

সুরেশ আগরওয়াল গম্ভীরমুখে বললেন, 'ওয়েল, নাইস স্টোরি মিস্টার মুখার্জি। স্বীকার করি সেদিন আপনাকে ডেকে লাঞ্চ করানোটা ওয়াস আ ওয়েস্টেজ। ওয়েস্টেজ অফ মাই ভ্যালুয়েবল টাইম অ্যান্ড মানি। আমার সলিসিটর নাহয় এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলে নেবেন। মানহানির কত নম্বর ধারায় কত কম্পেনসেশন আদায় করা যায় সেটা আমার ঠিক মনে নেই। এনিওয়ে, ধন্যবাদ এডিজি সাহেব। আপনার দৌলতে একটা চমৎকার ক্রাইম থ্রিলার শোনা গেল। এবার আমাকে যেতে অনুমতি দিন।'

এডিজি সাহেব কিছু বলার আগেই দরজার কাছ থেকে মনুজেন্দ্রর গম্ভীরস্বর ভেসে এল, 'যেতে আপনি নিশ্চয়ই পারেন মিস্টার আগরওয়াল। তার আগে বলুন তো, কাল রাত দেড়টায় আপনি এই প্যাকেটটা কেন আপনার বাড়ির পাশের ভ্যাটে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন? আপনার হাতের ছাপ কিন্তু আছে এতে।'

মনুজেন্দ্রর হাতে একটা জিপার লাগানো প্লাস্টিকের প্যাকেট। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা টুথপেস্টের টিউব।

সুরেশ আগরওয়ালের মাথাটা শিকড় ছোঁয়ানো সাপের মাথার মতো নুইয়ে এল।

* * *

সুরেশ আর চারুমতীকে নিয়ে পুলিশ বেরিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এডিজি সাহেব বললেন, 'আপনার লাস্ট ম্যাজিকটা কিন্তু এখনও বাকি আছে মামাবাবু। অমন দামি পেইন্টিংটা আছে কোথায় জানাবেন না?'

'সেটা তো দেখাবই এডিজি সাহেব। তবে তার আগে প্রমিতবাবুর একটা অনুমতি চাই।'

প্রমিতেন্দ্র ঘটনার ঘনঘটায় স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিলেন। তিনি তড়িঘড়ি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না। কোন অনুমতি?'

'বরেনবাবুর শোওয়ার ঘরে একবার যাব।'

সবাই মার্চ করে এলেন বরেন মজুমদারের শোওয়ার ঘরে। 'উইল করেছিলেন বরেন মজুমদার। তাতে টাকাপয়সার সঙ্গে তাঁর সংগৃহীত বই আর ছবিরও বিলিব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর সমস্ত ছবি দিয়ে গেছেন বাল্যবন্ধু এবং আর্ট কনৌসিয়র সুরেশ আগরওয়ালকে। শুধু এই তিনটে ছবি ছাড়া,' প্রফেসর মুখার্জি তিনটে পোর্ট্রেটের দিকে আঙুল তুললেন। 'কেন? এক হতে পারে যে তাঁর বা তাঁর বাপ ঠাকুরদার ছবি নিয়ে সুরেশ আগরওয়াল বা তাঁর উত্তরপুরুষদের কোনও মাথাব্যথা থাকবে না।

তাতে বরেনবাবুর পূর্বপুরুষদের অসম্মান হবে। দুই, তিনি চাননি এই তিনটে ছবি, বা স্পেসিফিক্যালি বলা ভালো এর মধ্যে কোনও একটি ছবি এই বাড়ির বাইরে যাক।'

'কোন ছবি মামাবাবু?'

'বরেন মজুমদারের ধাঁধাটা মনে আছে এডিজি সাহেব? অন্তত প্রথম দুটো লাইন?'

'সার্টেনলি মামাবাবু। আলমারিময় ছড়িয়ে আছে বিখ্যাত সব কেতাব/ দশের বেশি দুই পেয়েছে সেখুপীরের খেতাব। কারেক্ট?'

'কারেক্ট স্যার।' খুশিয়াল হয়ে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি, 'এবার ছবিটা দেখুন!'

বরেন মজুমদারের সেল্ফ পোর্ট্রেটের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন তিনি।

যৌবনের বরেন্দ্রনাথ। টানা চোখ, সুন্দর চিবুক আর একঢাল চুল। পরনে একটা চেককাটা হাফহাতা শার্ট। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। হাতে একটা বই, টুয়েল্ফথ নাইট।

'বইটার নাম পড়তে পারছ মনু?'

'পারছি স্যার।'

'কার লেখা জানো?'

'উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।'

'অর্থাৎ আমাদের সেখুপীর, বুঝলে হে। আর দশের বেশি দুই বলতে যে বারো, অর্থাৎ টুয়েল্ফথ নাইটের কথা বলা হয়েছে সেটা মেনে নিতে আপনার অসুবিধা আছে এডিজি সাহেব?'

বলতেই বংশী একটা ফোল্ডিং ল্যাডার এনে হাজির। ছবিটা সেই-ই নামিয়ে আনল দেওয়াল থেকে।

'প্রমিতবাবু, আপনি বলেছিলেন আপনার বাবা খুব ভালো ফ্রেমিং করতে পারেন। রাইট?'

'ইয়েস প্রফেসর মুখার্জি।'

'এটাও নিশ্চয়ই তিনিই ফ্রেম করেছিলেন। একটা স্ক্রু ড্রাইভার গোছের জিনিস পাওয়া যাবে?'

পরের পাঁচ মিনিট ধরে অতি যত্নে ছবিটা ফ্রেম থেকে আলাদা করলেন প্রফেসর মুখার্জি। হাত কাঁপছিল তাঁর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ছবির পেছনের পিচবোর্ডটা খুলে এল। তার নীচে একটা সেলফেন পেপারে মোড়া প্যাকেট। প্যাকেটের নীচে বরেন মজুমদারের ছবি। তার নীচে কাচ।

সেলফেনের প্যাকেটটা অতি যত্নে বার করে আনলেন প্রফেসর মুখার্জি, যেন ইনকিউবেটর থেকে সদ্যোজাত শিশুকে তুলে আনছেন। ধীরে ধীরে সেলফেন খুলে দু-ফুট বাই তিন ফুট সাইজের একটি ছবি বার করে আনলেন। খানিকক্ষণ তার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি যত্নে সেটি মনোজ চাকলাদারের হাতে দিয়ে বললেন, 'এর দৌলতে সি আই ডি-র যা সুনাম হবে সে তো আন্দাজ

করতে পারছেন এডিজি সাহেব। ফিরিয়ে দিলে ইউ এস এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও অনেক উন্নত হবে। শুধু একটাই অনুরোধ, কৃতিত্বটা যেন আমার স্নেহের মনুজেন্দ্রই পায়।'

* * *

গাড়ি চালাচ্ছিল মনুজেন্দ্র। পাশের সীটে বসে গুণগুণ করে একটা সুর ভাঁজছিলেন প্রফেসর মুখার্জি। এক্সাইডের মোড় ক্রস করে মনুজেন্দ্র জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা স্যার, কাল আপনি কেন বললেন যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়লে আমি অনেক আগেই এই রহস্য সলভ করে ফেলতাম।'

'কুঞ্জবিহারী কার নাম জানো তো হে?'

'শ্রীকৃষ্ণের বলেই জানতাম।'

'কারেক্ট। শ্রীকৃষ্ণের একটি মেয়ে ছিল জানতে?'

'নাহ্।' .

'রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণর একটি মেয়ে ছিল। তার নাম চারুমতী। কুঞ্জবাবু একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না। হলে মেয়ের নাম চারুমতী রাখতেন না। সে যাই হোক। এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'আপনাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসতে। আবার কোথায়?'

'আরে রামোঃ। সবে বেলা দেড়টা। এখন কেউ বাড়ি যায়? গাড়িটা পার্ক স্ট্রীটের দিকে ঘোরাও হে। চলো কাবাব কেমন খেতে, তোমার মনে আছে মনু, অ্যাঁ?'



সম্পূর্ণ ক্যাটালগ পেতে
QR Code স্ক্যান করুন



জন্ম হাওড়া শহরের প্রাচীন জনপদ শিবপুরে। বেড়ে ওঠা মফস্‌সলি অলিগলিতে। বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন, মা স্কুল শিক্ষিকা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক, ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর চাকরিসূত্রে হায়দ্রাবাদ, মুম্বই ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে জীবন কাটিয়ে আপাতত কলকাতায় থিতু। লেখালেখির শুরু ২০১৫ সাল নাগাদ।

নেশা—কাজের ফাঁকে লেখার রসদের খোঁজে বেরিয়ে পড়া আর বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডা।

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত বই মহাদেবী, পটমঞ্জরী, খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ, পেতবত্থু।

প্রচ্ছদ দিবাকর চন্দ